# অদ্রীশ বর্ধন

# সমুদ্র শয়তান

সোভিয়েত সিনেমা কাহিনী অবলম্বনে

# সমুদ্র-শয়তান

অদ্রীশ বর্ধন

ফ্যানট্যাসটিক প্রকাশনা
৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন
কলিকাতা-১৪

উৎসর্গ

সত্যজিৎ রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

যিনি বাল্যাবধি সায়ান্স-ফিকশ্যন অনুরাগী
এবং যাঁর অনুপ্রেরণায় এই বাংলা অনুবাদের প্রকাশ

*ফ্যানট্যাসটিক প্রকাশনার কয়েকটি বই ঃ*

মিলক গ্রহে মানুষ

সবুজ মানুষ

অতিমানুষ

অলৌকিক দুনিয়া

অসম্ভবের দুনিয়া

বনমানুষের হাড় (যন্ত্রস্থ)

হীরামনের হাহাকার (যন্ত্রস্থ)

# সমুদ্র শয়তান

# ভূমিকা

'সমুদ্র শয়তান' (দি অ্যামফিবিয়ান) অনুবাদের পেছনে একটা ছোট্ট ইতিহা আছে। কাহিনীর মত ইতিহাসও সমান কৌতূহলোদ্দীপক।

১৯৬৩ সালে বিশ্বের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সায়ান্স-ফিকশ্যন চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ত্রিয়েস্তেতে, অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করে 'দি অ্যামফিবিয়ান ম্যান'।

১৯৬৬ সালের জানুয়ারীতে বিশ্বের সর্বপ্রথম সায়ান্স-ফিকশ্যন সিনে ক্লাব সংগঠিত হয় কলকাতায় সত্যজিৎ রায়ের সভাপতিত্বে এবং লেখকের ওপর পড়ে সম্পাদকের দায়িত্ব।

'দি অ্যামফিবিয়ান ম্যান' সত্যজিৎবাবুই নির্বাচন করলেন এবং ১০ই এপ্রিল কলকাতার ম্যাজেস্টিক টকীজে তা সহস্রাধিক সদস্যের সামনে প্রদর্শিত হল।

ছবিটির কাহিনী, সংগীত, অভিনয় ও ফোটোগ্রাফী মনে দাগ রেখে গেল। সদস্যরা অভিভূত হলেন ছবি দেখে। সংক্ষেপে, তুমুল অলোড়নের সৃষ্টি হল চলচ্চিত্র সংস্থা মহলে।

আলেকজাণ্ডার বিলায়েভ রচিত 'দি অ্যামফিবিয়ান'-এর সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য মিল ছিল না ফিল্মটির। তাই মে ১৯৬৬ সংখ্যা থেকে ভারতের একমাত্র সায়ান্স-ফিকশ্যন মাসিক পত্রিকা 'আশ্চর্য!'-তে সুবৃহৎ কাহিনীটি অনুবা করতে শুরু করি।

'আশ্চর্য!'-র চারটি সংখ্যায় এই বিরাট উপন্যাস প্রকাশিত হয় এবং সাড়া পড়ে যায় পাঠক মহলে।

পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় নামকরণ নিয়ে একটু সমস্যা দেখা দিল। শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্র ইংরেজী নামের বদলে বাংলা নাম দিতে উপদেশ দিলেন। 'সমুদ্র শয়তান' নামটি শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল শ্রদ্ধেয় প্রণব রায়ের কাছ থেকে।

মুদ্রার মূল্যমান হ্রাসের পর বইয়ের দামের ঊর্ধ্বগতি আর রোধ করা যাচ্ছে না। কিন্তু আমরা চাই মূল্যবান এই উপন্যাসটা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ুক —তাই আয়তনের অনুপাতে দাম অস্বাভাবিক কম রাখা হল। অল্প মূল্যে সুমুদ্রিত ও সুন্দরভাবে বাঁধাই সায়ান্সফিকশ্যন গ্রন্থ বাংলার ঘরে ঘরে পেঁৗছে দেওয়ার এই পরিকল্পনা জয়যুক্ত হোক এই কামনা করি।

অদ্রীশ বর্ধন

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রায়িত উপন্যাস □ লেখক যেমন লিখেছিলেন

# দি অ্যামফিবিয়ান

## ( উভচর প্রাণী )

'দি অ্যামফিবিয়ান' আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে সেই যুগে, যে যুগে নিতল সমুদ্রের নীরব জগৎ তখনও ছিল পুরোপুরি রহস্য। আজ যেমন অ্যাকুয়ালাঙ আর স্নর্কেলের দৌলতে সমুদ্রের গভীর অঞ্চলেও চলছে অভিযান, রত্নগর্ভা সাগরের বহু প্রহেলিকাই ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়ে চলেছে মানুষের সামনে — তখন কিন্তু সে রকম ছিল না। তখন যা সাধারণ মানুষের কল্পনাতেও আসত না, আলেকজান্ডার বিলায়েভের উর্বর কল্পনায় তা এসেছিল এবং যে দূরদৃষ্টি দিয়ে ১৯২৮ সালে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন, মানুষ একদিন সমুদ্রের গভীরেও সাম্রাজ্য বিস্তার করবে — আজ তা সত্য হতে চলেছে।

রাও ডি লা প্লাটাতে সী-ডেভিলের আবির্ভাব ঘটেছে। ভৌতিক চীৎকার শোনা যাচ্ছে সমুদ্রের বুকে, কে যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে জেলেদের জাল, ডলফিনদের পিঠে বসা অবস্থায় সেই অদ্ভুত আকৃতির সামুদ্রিক দানবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কারুর মনেই আর কোনো সন্দেহ নেই। স্পানিয়ার্ড জুরিটার লোভ শেষ পর্যন্ত কুসংস্কারকে দাবিয়ে দিলে। শুরু হল তার অভিযান। সমুদ্র-শয়তানকে পাকড়াও করতেই হবে তারপর তাকে মুক্তো-ডুবুরীর কাজে লাগানো হবে। কিন্তু ব্যর্থ হল তার প্রচেষ্টা।

বিউনোআয়র্াসের কাছেই নির্জন একফালি জমিতে থাকেন ডক্টর স্যালভেটর। বেজায় উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা তাঁর আবাস স্থান ইস্পাতের পাতমোড়া ফটক খুলে ঢুকতে পায় শুধু তাঁর রেড ইন্ডিয়ান রুগীরা। রেড ইন্ডিয়ানরা তাঁকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে। কিন্তু জুরিটা জানতে পারল, জলের সমুদ্র-শয়তান আর ডাঙার মানুষ-দেবতার মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে। দুই স্যাঙাৎ নিয়ে আরম্ভ হল তার উদ্যোগ পর্ব রহস্যের অবগুণ্ঠন তুলে ধরতেই হবে।

শ্বাসরোধী ঘটনার মধ্যে দিয়ে গল্প ছুটে চলেছে তুরঙ্গগতিতে — সমুদ্রতল থেকে স্প্যানিয়ার্ডের স্কুনার 'জেলী ফিশ' — আবার সমুদ্র-তল। গল্প ডাঙাতেও নেমে এসেছে। রৌদ্রবিধৌত বিউনোআয়ার্স আর গ্রামাঞ্চলেও রোমাঞ্চকর ঘটনার মধ্যে দিয়ে পাঠককে নিয়ে গেছেন লেখক। ধীরে ধীরে সমুদ্র-শয়তান ইকথিয়ান-ডারের আশ্চর্য রহস্য উন্মোচিত হয়ে এসেছে রুদ্ধশ্বাস পাঠকের সামনে। এ গল্প নিছক গল্প নয় — গল্পের মধ্যে যে কত মূল্যবান তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

'দি অ্যামফিবিয়ানে'-র লেখক-পরিচিতি

## আলেকজাণ্ডার বিলায়েভ

আলেকজান্ডার বিলায়েভ শুধু
সর্বপ্রথম সায়ান্স-ফিকশ্যন
লেখকই নন, সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকও
বটে। ১৮৮৪ সালে তাঁর জন্ম,
ছেলেবেলা থেকেই নতুন নতুন
আইডিয়া গজগজ করত তাঁর মগজে।
আকাশে ওড়া ছিল তাদের
অন্যতম। সত্যি সত্যিই ছাদ
থেকে উড়তেন বিলায়েভ—শেষকালে
একদিন আছাড় খেয়ে ভাঙল তাঁর
শিরদাঁড়া। শিরদাঁড়া জোড়া
লাগল বটে, কিন্তু ৩২ বছর বয়সে
হল হাড়ের টিউবারকিউলোসিস্।
প্রায় ছ-বছর বিছানায় কাটাতে
হল তাঁকে। পরেও মধ্যে মধ্যে তাঁকে
শয্যা আশ্রয় করে থাকতে হয়েছে।
স্কুল থেকে বেরিয়ে বিলায়েভ আইন
আর সঙ্গীত অধ্যয়ন শেষ করলেন।
কলেজের মাইনে জোটাতে গিয়ে তাঁকে
অর্কেস্ট্রা পারটিতে বাজনা বাজাতে হয়েছে,
ষ্টেজের সেট সাজাতে হয়েছে আর পত্র-
পত্রিকায় লিখতে হয়েছে। শেষে ১৯২৫
সালে আইনের ব্যবসা ছেড়ে পুরোপুরিভাবে
লেখাকেই জীবিকা করে নিলেন।

বিলায়েভের প্রথম উপন্যাস ১৯২৬ সালে
'প্রফেসর ডোয়েল্স্ হেড' জনপ্রিয় একটা পত্রিকায়
ধারাবাহিকভাবে বেরুতে বেরুতে দারুণ জনপ্রিয়
হয়ে ওঠে,তারপর থেকে পঞ্চাশেরও বেশী উপন্যাস
লিখেছেন উনি, ১৯৪২ সালে লেনিনগ্রাদের
কাছে মৃত্যু হয় তাঁর। ওঁর সেরা বইয়ের নাম
হল 'দি অ্যামফিবিয়ান,' 'এ জাম্প ইনটু নাথিংনেস'
আর 'দি আইল্যান্ড অফ ডেডশিপ্স্।'

# প্রথম খণ্ড

## সমুদ্র-শয়তান

গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। আর্জেণ্টাইনের গ্রীষ্ম। সমুদ্রের ওপর নেমে এল রাতের ঘোমটা। গাঢ় বেগুনি রঙের আকাশে চমক দিয়ে উঠল তারার মেলা। নোঙর ফেলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ছোট্ট একটা মাস্তুলওলা জাহাজ, এক কথায় যাকে বলা যায় স্কুনার। জাহাজের নাম 'জেলী-ফিশ'।

শান্ত সমুদ্র, শান্ত 'জেলী-ফিশ'। জাহাজের গায়ে তরঙ্গ-ভঙ্গের আওয়াজ নেই। জাহাজের ডেকে মানুষেরও সাড়া নেই। যেন জাহাজ আর সাগের একই সাথে সুপ্তিমগ্ন।

অর্ধনগ্ন মুক্তো-ডুবরীরা হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে ডেকের ওপর। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করেছো তারা। কড়া রোদের নিচে হাড়ভাঙা খাটুনির পর যে যেখানে পেরেছে, গা এলিয়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেউ কাতরাচ্ছে, কেউ এপাশ-ওপাশ করছে। কেউ বা দুঃস্বপ্ন দেখে গুঙিয়ে উঠছে। হয়তো ঘুমের মধ্যেও হাঙরের আতংক তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে বেচারীদের। মুক্তো-ডুবুরীদের পরম শত্রু হল এই হিংস্র হাঙরেরা।

সারাদিন হাওয়ার লেশমাত্র ছিল না। তার ওপর কাঠফাটা রোদ্দুর। ফলে এমনই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে সবাই যে নৌকাগুলোকে দিনের শেষে ডেকের ওপর টেনে তোলার মত শক্তিবিন্দুও অবশিষ্ট ছিল না কারুর শরীরে। তাই নোঙরের শেকলে বাঁধা নৌকাগুলো ভাসছে জলে।

স্কুনারের গোটা ডেকটা বোঝাই শামুক প্রবালে। হেথায় হোথায় তাগাড় করেছে মুক্তোবোঝাই শামুকগুলো। কোথাও কোথাও ডুবুরীদের দড়িদড়া। মাস্তুলের গায়ে দাঁড় করানো একটা মস্ত জলভর্তি পিপে। লোহার মগটা বাঁধা রয়েছে শেকলে। পিপের চারিধারের ডেক জলে কাদায় মাখামাখি।

মাঝে মাঝে এক-আধজন ডুবুরী টলতে-টলতে উঠে আসছে। ঘুমন্ত চোখেই এক মগ জল তুলে ঢক ঢক করে গিলে আবার গড়িয়ে পড়ছে ডেকের ওপর যেখানে খুশী। দেখে মনে হবে যেন জল নয়, মদ গেলা হচ্ছে।

কিন্তু ডুবুরীদের তেণ্টা চব্বিশ ঘণ্টাতেও মেটে না। কেন না, সক্কালবেলা খালি পেটে জলে নামতে হয় তাদের। খেলেই সর্বনাশ। ভরাপেটে ডুব দিলে জলের চাপ দারুণ বিপজ্জনক। কাজেই সারাদিন উপোস করে খাটতে হয় বেচারীদের। রাত না হওয়া পর্যন্ত চলে এমনি খাটুনী। গড়া-গড়া শয়ান

হওয়ার আগে অবশ্য খেয়ে নিয়েছে সবাই। তাও নুন মাখানো মাংস।

রাতের পাহারাদার বালতাসার স্বয়ং। স্কুনারের মালিক পেড্রো জুরিটার ডান হাত সে।

বয়সকালে পাকা মুক্তো-ডুবুরী হিসেবে বালতাসারের বিলক্ষণ নামডাক ছিল। দেড় মিনিট তো বটেই, মধ্যে মধ্যে দুমিনিট পর্যন্ত জলের তলায় থাকতে পারত সে। সাধারণ ডুবুরীরা হাঁপিয়ে ওঠে মিনিট খানেকের মধ্যেই।

ছোকরা ডুবুরীদের কাছে গল্প করতে বালতাসার—'এত দম কি করে পেয়েছিলাম জানো? আমাদের সময়ে ট্রেনিং দেওয়া কাকে বলে, তা ওস্তাদরা জানতো — আজকালকার মত নয়।

'মাত্র বছর দশেক বয়েসেই ডুব দেওয়ার বিদ্যায় হাতে খড়ি হয়েছিল আমার। বাবা যে ওস্তাদের হাতে আমাকে সঁপে দিলেন, নাম তার জোসি। আমার সবশুদ্ধ বারোজন ছেলে ডুব দেওয়া শিখতে লাগলাম। জলের মধ্যে নুড়ি ফেলে দিত জোসি। তারপর আমাদের কাউকে বলত তুলে নিয়ে আসতে। বেছে বেছে গভীর জলে নুড়ি ছুঁড়তো জোসি। একবার পারলে আরও গভীর জলে। যে না পারতো; সপাং সপাং করে চাবুক কষিয়ে আবার তাকে জলে ফেলে দিত জোসি। চাবুকের মার বিফলে যেত না। তারপর অনেকক্ষণ ধরে জলে ডুবে থাকার কৌশল শেখাতে শুরু করল জোসি। পাকা কোনো ডুবুরী জলের নিচে গিয়ে নোঙরের শিকলির সঙ্গে বেতের বাক্স বা জলের টুকরো বেশ শক্ত করে বেঁধে দিয়ে আসত। তারপর আমরা যেতাম সেই গিঁট খুলে জিনিসগুলো ওপরে আনার জন্যে। সব কটা গিঁট না খোলা পর্যন্ত ওপরে উঠতে দেওয়া হত না। উঠলেই আবার চাবুক।

'কি মার যে খেয়েছি, তার হিসেব নেই। কিন্তু মার খেতে খেতেই শিখেছি। অনেকে ধকল সহ্য করতে পারেনি — পেরেছি আমি। সে তল্লাটে আমার মত দম আর কারোরই ছিল না। টাকাও কম রোজগার করিনি।'

তারপর এক সময় যৌবন গেল বালতাসারের জীবন থেকে। হাঙরের কামড়ে বাঁ পা সাংঘাতিক জখম হল। নোঙর শেকলের দাগও কায়েমী হয়ে রইল শরীরে একপাশে। শেষ পর্যন্ত মুক্তো ডুবুরীর কঠিন কাজ ছাড়তে হল,তাকে। বিউনোআয়ার্সে ছোট একটা দোকান ফেঁদে বসল সে। মুক্তো, প্রবাল, শামুকের খোলা, আর সমুদ্রের অদ্ভুত অদ্ভুত দুষ্প্রাপ্য জিনিস হল তার পণ্য। কিন্তু জলের মানুষের ডাঙার জীবন ভাল লাগবে কেন? মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠলে তাই ছুটে আসতো মুক্তো ডুবুরীদের সঙ্গে জলে ঝাঁপাঝাঁপি করতে।

ডুবুরীরা তাকে পেলে বর্তে যেত। কেন না, রায়ো ডি লা প্লাটা আর সেখানকার মুক্তোক্ষেত সম্বন্ধে সে যা জানত, তা আর কেউই জানত না। সবাই ভালবাসত তাকে। সেও সবাইকে কি করে খুশী করতে হয় জানত। ছোকরা ডুবুরীদের শেখাতো জলের নিচে কি করে অনেকক্ষণ দম রাখতে হয়, হাঙরের

সঙ্গে লড়াই করতে হয়। মেজাজ ভাল থাকলে, অতি চমৎকার দু-একটা মুক্তোও কি ভাবে মালিকের চোখের আড়াল করে ফেলতে হয়। সে বিদ্যে শিখিয়ে দিত।

আর মালিকদের শেখাতো, কি করো মুক্তো বাছতে হয়, আর মুক্তোর সঠিক দাম নির্ণয় করতে হয়।

উল্টোনো একটা পিপের ওপর বসেছিল বালতাসার। আঙুলের ফাঁকে ইয়া মোটা একটা চুরুট। মাস্তুলে বাঁধা লণ্ঠনের আলো পড়েছে মুখের ওপর। লম্বাটে মুখ। তীক্ষ্ণ নাক, বড় বড় সুন্দর চোখ। এ মুখ অ্যারোকানিয়ান জাতের বৈশিষ্ট্য। ঢুলছিল বালতাসার। চোখ ঘুমিয়ে থাকলেও কান ঘুমিয়ে ছিল না। ছোটখাটো আওয়াজেও ঘুমের মধ্যে হুঁশিয়ার করে তুলছিল তাকে। ডুবুরীদের দীর্ঘনিঃশ্বাস আর নড়াচড়ার শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। পচা শুক্তির বিশ্রী গন্ধে বাতাস ম ম করছে। এ গন্ধে অন্যের বমি এলে বালতাসারের নাকে তা খোশবাইয়ের সামিল।

শুক্তি থেকে মুক্তো উদ্ধার হয়ে যাওয়ার পর খোলাগুলো নষ্ট করার পাত্র ছিল না জুরিটা। শুক্তির পাহাড় বেচে দিত স্থানীয় একটা বোতামের কারখানায়।

বালতাসার এবার ঘুমিয়ে পড়েছে। চুরুট খসে পড়েছে আঙুলের ফাঁক থেকে। থুৎনি নেমে এসেছে বুকের ওপর।

আচমকা সমুদ্রের কালো বুক থেকে ভেসে এল একটা শব্দ। মুহূর্তে ঘুম ছুটে গেল বালতাসারের। শব্দটা আরো কাছে এগিয়ে এল। চোখ খুলল বালতাসার। শঙ্খধ্বনির মত আওয়াজটা আবার শোনা গেল। তারপরেই সোল্লাসে হৈ হৈ করে উঠল একটা মনুষ্য কণ্ঠ। কণ্ঠে তারুণ্যের উল্লাস। ক্ষণেক বিরতির পরেই আরও উচ্চগ্রামে শোনা গেল সেই আনন্দধ্বনি, শঙ্খধ্বনির সঙ্গে জাহাজের সাইরেনের শব্দের কোনো রকম মিল নেই। তরুণ কণ্ঠের চীৎকার শুনেও মনে হয় না নিমজ্জমান কেউ প্রাণের ভয়ে চেঁচাচ্ছে, সমুদ্রের পোকা বালতাসার সারা জীবনে অনেক রকম শব্দ শুনেছে, কিন্তু কোনো শব্দের সঙ্গেই সাদৃশ্য নেই নিশীথরাতের রহস্যজনক এই শব্দের।

মৃদু মৃদু হাওয়া বইছে। চোখে আর ঘুম এল না। রেলিংয়ের ধারে গিয়ে দাঁড়াল বালতাসার, তীক্ষ্ণ চোখে তাকালে নিঃসীম অন্ধকারের বুকে। না, নেই। না শব্দ, না কিছু, পায়ের ঠেলা দিয়ে ঘুমন্ত একজন রেডইণ্ডিয়ানকে জাগিয়ে দিল বালতাসার।

বলল ফিসফিস করে – 'একটা চিৎকার শুনলাম। বোধহয় সে।

'কোথায়, কিছুই তো শুনছি না?' হাঁটু গেড়ে বসে কান খাড়া করে বলল রেডইণ্ডিয়ান গুরোনা।

পরক্ষণেই আচম্বিতে আবার রাতের নৈঃশব্দ্য খান খান করে দিয়ে বেজে উঠল সেই শাঁখের শব্দ – শোনা গেল আবার সেই অপার্থিব কণ্ঠ।

যেন চাবুকের ঘা খেয়ে কুঁচকে এতটুকু হয়ে গেল গুরোনা।

কথা বলতে গিয়ে ঠোকাঠুকি লেগে গেল দাঁতে দাঁতে – তারই মধ্যে বললে 'সে-ই বটে।'

বাকী ডুবুরীদের ঘুম ছুটে গেছিল। ধড়মড় করে সবাই উঠে পড়ে লণ্ঠনের ছোট্ট আলোকবৃত্তের মধ্যে জড়াজড়ি করে পড়ে রইল – যেন আলোর ঐ রশ্মি-টুকুই অন্ধকারের বিভীষিকাকে সরিয়ে রেখে দেবে দূরে।

অনেক দূর থেকে আবার ভেসে এল শাঁখ আর অদৃশ্য তরুণের উচ্চ উল্লাস। তারপরেই সব নিস্তব্ধ।

'সমুদ্র-শয়তান! সমুদ্র-শয়তান'! ফিসফিসানি শুরু হয়ে গেল ডুবুরী-দের মধ্যে।

'এ-তল্লাট ছেড়ে এখুনি আমাদের লম্বা দেওয়া দরকার।'

'হাঙরও ওর কাছে ছেলেমানুষ।'

'চল, মালিককে বলা যাক।'

খালি পায়ের আওয়াজ শোনা গেল ডেকের ওপর। হাই তুলতে তুলতে লোমশ বুক চুলকোতে চুলকোতে এসে দাঁড়াল পেড্রো জুরিটা। পরনে ক্যানভাসের ট্রাউজার্স ছাড়া আর কিছু নেই। চওড়া চামড়ার বেল্ট থেকে ঝুলছে রিভলভারের হোলস্টার। ডুবুরীদের কাছে এসে দাঁড়াতেই লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল ভারী মুখটা। ঘুমের আবেশে তা কুৎসিত। ঘন চুলের থোকায় কপাল ঢাকা পড়েছে। কুচকুচে কালো ভুরু, ছুঁচোলো গোঁফ। আর ধূসর ছাগলদাড়ি।

'কি ব্যাপার?'

কণ্ঠের ব্যক্তিত্ব মুহূর্তের মধ্যে সচকিত করে তুলল ডুবুরীদের। একই সঙ্গে কথা বলে উঠল সকলে।

হাত তুলে থামিয়ে দিলে বালতাসার।

বললে – 'সমুদ্র শয়তানের ডাক শুনেছি আমরা।'

'স্বপ্ন দেখেছো,' ঘুমঘুম চোখে জবাব দিলে পেড্রো।

'স্বপ্ন নয়। আমরা সবাই শুনেছি শিঙের আওয়াজ,' চীৎকার করে বললে ডুবুরীরা।

আবার হাত নেড়ে থামিয়ে দিলে বালতাসার।

বললে – 'আমি নিজের কানে শুনেছি শিঙের আওয়াজ। সমুদ্র-শয়তান ছাড়া ও রকম শব্দ আর কেউ করতে পারে না। এখুনি এ জায়গা ছেড়ে সরে যাওয়া দরকার – দেরী করলেই বিপদ।'

'যত্তোসব গুলিখোরের গপ্পো,' বললে পেড্রো জুরিটা। জাহাজ ভর্তি শুক্তি নিয়ে এ জায়গা থেকে সরে পড়ার কোনো ইচ্ছেই নেই জুরিটার। এখনো সব শুক্তি পচেনি, মুক্তোও উদ্ধার হয়নি। কিন্তু ডুবুরীদের রকম সকম দেখে মনে হল, জুরিটা নোঙর না তুললে দল বেঁধে সবাই স্কুনার ছেড়ে পালাবে বিউনো-আয়ার্সে।

'গোল্লায় যাক তোমার সমুদ্র-শয়তান,' অনেকক্ষণ পরে বলল পরে পেড্রো। 'কাল ভোরে নোঙর তুলব—এখন ঘুমোও।' বলে নিচে নেমে গেল গজগজ করতে করতে।

ঘুম আর এলো না। লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে একটা চুরুট ধরিয়ে নিলে জুরিটা। কেবিনের মধ্যে পায়চারী করতে করতে ভাবতে লাগল রহস্যময় এই জীবটার কথা। বেশ কিছুদিন ধরে এ অঞ্চলের মোহানায় আতংক সঞ্চার করেছে সমুদ্র-শয়তান, জেলে আর গ্রামবাসীরা তার নাম শুনলে ভয়ে নীল হয়ে যায়।

সমুদ্র-শয়তানের সম্বন্ধে কথা বলতেও ভয় পায় তারা। বার বার পিছন ফিরে তাকায়। যেন কথার ফাঁকেই ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে পারে সামুদ্রিক রাক্ষস। অদেখা প্রাণীটা নাকি মানুষের যেমন ক্ষতি করেছে, তেমনি উপকারও করেছে।

বুড়ো রেডইণ্ডিয়ানরা বলে—হাজার বছরে একবার সমুদ্র থেকে উঠে আসে সমুদ্র-শয়তান পৃথিবীর ওপর সুবিচার ফিরিয়ে আনার জন্যে।

ক্যাথেলিক পুরুৎরা বলে নাকি পবিত্র ক্যাথোলিক চার্চ অবজ্ঞা করার দরুনই সমুদ্র-শয়তানের রূপ ধরে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন স্বয়ং ঈশ্বর!

গুজব ক্রমশই ছড়িয়ে পড়তে থাকে। হপ্তার পর হপ্তা ধরে বিউনোআয়ার্সের খবরের কাগজগুলোর শিরোনামা দখল করে রইল রইল সমুদ্র-শয়তানের কীর্তি-কাহিনী। কার জাল ছিঁড়েছে, কার জেলে ডিঙি ভেসে গেছে, কার স্কুনার হারিয়েছে – সবই নাকি সমুদ্র-শয়তানের নষ্টামি। সেই সঙ্গে এ খবরও এল যে জেলেদের নৌকায় রহস্যজনকভাবে পাওয়া গেছে বিস্তর মাছ, ডুবন্ত মানুষকে অদৃশ্য হাত তুলে নিয়ে রেখে গেছে ডাঙায়।

এ রকম একজন বললে, শেষ মুহূর্তে কে যেন পেছন থেকে তাকে ধরে ফেলে তীরের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ডাঙায় তাকে ফেলেই সমুদ্রফেণার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায় পরমুহূর্তে – উদ্ধারকারীর ছায়াটুকুও দেখার সৌভাগ্য হয়নি তার।

কেউই সমুদ্র শয়তানকে দেখেনি। অথচ দিব্বি গেলে অনেকেই বলেছে, প্রাণীটার নাকি মাথায় শিং আছে, ছাগলদাড়ি আছে, পা দুটো তার সিংহের মতন, আর ল্যাজটা মাছের মত। কেউ কেউ বলছে, আসলে সমুদ্র-শয়তানকে দেখতে নাকি অতিকায় ব্যাঙের মত, পা গুলো শুধু মানুষের পা।

প্রথম প্রথম কর্তৃপক্ষ এসব গুজব নিয়ে মাথা ঘামায়নি। গরম গরম খবর না দিলে কাগজ চলে না – তাই এসব গালগল্প খবরের কাগজওয়ালাদের কীর্তি ভেবেই আমল দেয়নি। কিন্তু গুজব থেকে এমন আতংক সৃষ্টি হল যে আর কোনো জেলেই জলে যেতে চায় না। শেষকালে মাছের অনটন দেখা দিল বিউনোআয়ার্সে। টনক নড়ল কর্তৃপক্ষের। পুলিশ লণ্ড থেকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হল, গুজব ছড়িয়ে আতংক সৃষ্টি করলেই গ্রেপ্তার করা হবে।

দিন পনেরো রায়ো ডি লা প্লাটার ওপর চলল পুলিশী তাণ্ডব। লাভ

কিছুই হল না, কেবল যা কয়েকজন রেড ইণ্ডিয়ান কারারুদ্ধ হল গুজব ছড়ানোর জন্যে।

পুলিশ চীফ ইস্তাহার প্রকাশ করে জনসাধারণকে জানালেন, সমুদ্র-শয়তান আসলে মিথ্যা গুজব। শয়তান-টয়তান কিস্সু নেই। বাজে কথা বলে যারা মিছিমিছি লোককে ভয় পাওয়াচ্ছে, তাদের যেন জেলে পুরে দেওয়া হয়। আর জেলেরা যেন নির্ভয়ে মাছ-ধরা শুরু করে।

ইস্তাহারে কাজ হল; কিন্তু তাও সাময়িক। আবার শোনা যেতে লাগল সমুদ্র-শয়তানের নব-নব বিটলেপনা।

গভীর রাতে নৌকোর ওপরে ছেলেমানুষী চিৎকারে নাকি ঘুম ভেঙে গেছে কয়েকজন জেলের অথচ মাঝদরিয়ায় অত রাতে ছেলেমানুষের পক্ষে জল থেকে নৌকোয় উঠে জেলেদের ভয় পাওয়ানো মোটেই সম্ভবপর নয়। এমন অসম্ভব কাণ্ড শুধু ম্যাজিকেই সম্ভব। কয়েকজন জেলে দেখালে, তাদের জাল কেটে দু'টুকরো করে দিয়ে গেছে সমুদ্র-শয়তান।

সমুদ্র-শয়তানের পুনরাবির্ভাবে উল্লসিত হয়ে উঠল খবরের কাগজ-ওয়ালারা। আবার শুরু হল বড় বড় হেডলাইন। এবার তারা দাবী জানালে, এই অলৌকিক কাণ্ডকারখানার রহস্য বিজ্ঞান সমাধান করুক।

বিজ্ঞানীরা বললে, শুধু সমুদ্রের এ অঞ্চল কেন, গভীর সমুদ্রেও এ ধরনের বুদ্ধিমান সামুদ্রিক জীবের অস্তিত্ব বিজ্ঞান স্বীকার করে না। আসলে পুলিশ চীফ যা বলেছেন, তাই ঠিক। কোনো ফাজিল লোকের বিটলেমো ছাড়া এ আর কিছুই হতে পারে না।

কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক অবশ্য অন্য কথাও বলল। যেমন, বিশ্ববিখ্যাত ন্যাচারা-লিস্ট কনর‍্যাড হেসনার সমুদ্র-শয়তান, সমুদ্র-কন্যা, সমুদ্র-ঋষি আর সমুদ্র-পুরুতের বিবরণ দেওয়ার পর অভিমত প্রকাশ করলেন, 'বিধাতা লীলাময়। তাঁর সৃষ্টির শেষ নেই। কাজেই আমরা বিজ্ঞানীরা যেন সেটা খেয়াল রাখি।'

অবশেষে সমুদ্রের বুকে পাড়ি দিল বৈজ্ঞানিকরা আধুনিক সরঞ্জামে সুসজ্জিত হয়ে।

অভিযানের সদস্যারা 'শয়তানে'র হদিশ পেলেন না বটে, তবে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির খামখেয়াল সম্পর্কে অনেক খবরা-খবর জোগার করলেন (বয়স্ক বৈজ্ঞানিকরাই নাকি 'প্রাণী'র পরিবর্তে 'ব্যক্তি' শব্দটি ব্যবহার করার সুপারিশ করেছিলেন)।

খবরের কাগজে অভিযানের নিম্নোক্ত রিপোর্টটি প্রকাশ পেল ঃ

'১। উপকূলের অনেক জায়গায় অবিকল মানুষের পায়ের ছাপের চিহ্ন আমরা পেয়েছি। সে ছাপ জল থেকে উঠে এসে আবার জলেই নেমে গেছে। তবে সেরকম পদচিহ্ন নৌকোর জেলেরাও রেখে যেতে পারে।

'২। মাছ-ধরা জালগুলো পরীক্ষা করে দেখেছি, ধারালো কোনো অস্ত্রে তা

ফালা ফালা হয়ে গেছে। তবে সে রকম ধার জলে-ডোবা ঝোপ-ঝাড়ে বা জলমগ্ন লোহালক্করেও থাকতে পারে।

'৩। খবর এসেছিল, ঝড়ো সমুদ্রের ঢেউ একটা ডলফিনকে তীরে এনে ফেলেছিল। কিন্তু কে যেন তাকে অতদূর থেকে আবার টেনে নামিয়ে নিয়ে গেছে জলের মধ্যে — রেখে গেছে বেঁকান নখযুক্ত থাবাওলা পদচিহ্ন।

'খবরটা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। একাজ নিশ্চয় কোনো সহৃদয় জেলের। সবাই জানেন, ডলফিনদের জেলেরা কতখানি স্নেহের চোখে দেখে। কেন না, বহুক্ষেত্রে এই ডলফিনরাই মাছের ঝাঁক তাড়িয়ে নিয়ে আসে উপকূলের দিকে যাতে জেলেরা চট করে ধরতে পারে। বেঁকানো নখযুক্ত থাবাওলা পদচিহ্নর ব্যাপারটা সাক্ষীর কল্পনাপ্রসূত বলেই মনে হয়।

'৪। তামাসা করার জন্য নৌকোয় করে মাঝ দরিয়ায় অল্পবয়েসী কোন ছেলেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। নৌকোর ঘুমন্ত মাঝিদের সে-ই চমকে দিয়েছে।'

বৈজ্ঞানিকদের আরও কিছু বলার ছিল। সমুদ্র-শয়তানের শয়তানি কোনো রসিক ব্যক্তির রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয় — সাগরের কোনো জীবের পক্ষে এহেন ইয়ার্কি সম্ভব নয়।

বৈজ্ঞানিকদের বিবৃতি পড়ে অনেকেই খুঁত খুঁত করতে লাগল। ডেঁপোমোই হোক, আর ফাজলামিই হোক, এতদিন ধরে এক নাগাড়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখা কারো পক্ষে কি সম্ভব? সবচেয়ে বড় কথা, অল্প সময়ের ব্যবধানে সমুদ্রের এমন দূরে দূরে জায়গায় সমুদ্র-শয়তানের কারচুপি ধরা গেছে যে দারুণ বেগবান না হলে তা মোটেই সম্ভব নয়। হয় অসম্ভব গতিবেগে জল কেটে ছুটতে পারে সে, আর না হয় সমুদ্র-শয়তান একা নয় — দলবল নিয়ে উত্যক্ত করে তুলেছে জেলেদের। এই ঘটনার পর বৈজ্ঞানিকদের রিপোর্ট বিশ্বাস করতে কারোরই মন চাইল না। ঠাট্টা নয়, সত্যি সত্যিই আছে সমুদ্র-শয়তান।

পায়চারী করতে করতে এই সব কথাই ভাবছিল জুরিটা।

ভোর হয়েছে। পোর্টহোলের ফাঁক দিয়ে সোনালী আলো ঢুকেছে কেবিনে। লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিয়ে মুখ ধুতে লাগল পেড্রো।

ঈষৎ উষ্ণ জল মাথায় ঢালতে না ঢালতেই চেঁচামেচির শব্দ ভেসে এল ডেক থেকে। ঐ অবস্থাতেই সিঁড়ির দিকে দৌড়ালো পেড্রো।

রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়েছে ডুবুরীরা। সমুদ্রের বুকে আঙুল দেখিয়ে একসাথে সবাই মিলে চেঁচাচ্ছে। চোখ নামাল পেড্রো। চমকে উঠল।

কাল রাতে নোঙরের শেকলে বাঁধা ছিল নৌকোগুলো। কিন্তু আজ একটাও নেই। রাতের হাওয়ায় মাঝদরিয়ায় ভেসে গেছিল তারা, এখন ভোরের হাওয়ায় দুলতে দুলতে ভেসে চলেছে তীরের দিকে। দাঁড়গুলো নৌকোয় নেই — ভাসছে জলের ওপর — সমস্ত উপসাগর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে নৌকার দাঁড়।

একী তামাশা!

কড়া গলায় হুকুম দিলে পেড্রো, ডুবুরীরা এখুনি জেলে নেমে নৌকাগুলো জড়ো করুক। কিন্তু কেউই নড়ল না। আবার বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠল জুরিটা।

একজন মুখের ওপর জবাব দিয়ে দিলে _ 'নিজেই নেমে গিয়ে শয়তানের সঙ্গে পাঞ্জা কষে আসুন না।'

সঙ্গে সঙ্গে জুরিটার হাত গিয়ে পড়ল হোলস্টারের ওপর। সভয়ে মাস্তুলের দিকে পিছিয়ে গেল বেপরোয়া ডুবুরী – দুই চোখে তার জলন্ত দৃষ্টি। হাঙ্গামা বাধলো বলে। কিন্তু সামাল দিলে বালতাসার।

এগিয়ে এসে বললে – 'ভয় পাওয়া অ্যারোকানিয়ানদের কোষ্ঠিতে লেখেনি। হাঙরেরও লোভ নেই আমার বুড়ো হাড়ের ওপর, সমুদ্র-শয়তানেরও থাকতে পারে না।' বলেই, দুহাত শূন্যে তুলে জলে ঝাঁপ দিলে বালতাসার। ভেসে উঠেই মাছের মত জল কেটে এগিয়ে গেল একটা নৌকার দিকে। ডুবুরীরা বিস্ফারিত চোখে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দেখতে লাগল বুড়ো হাড়ের কীর্তি। বয়স হলেও চমৎকার সাঁতরায় বালতাসার। ভাসমান একটা দাঁড় টেনে নিয়ে নৌকোয় উঠে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল সোল্লাসে – 'এ যে দেখছি ছুরী দিয়ে কাটা দড়ি – পরিষ্কার কাটা। ক্ষুরের মত ধারালো ছুরী।'

বালতাসারের গায়ে আঁচড় লাগল না দেখে অন্যান্য ডুবুরীরা ঝপাঝপ লাফিয়ে পড়ল জলে।

## ডলফিনের পিঠে

সূর্য সবে উঠলেও রোদের তাতে পিঠ জ্বলে যায়। আকাশে মেঘের চিহ্ন নেই, সমুদ্রেও ঢেউ নেই। বিউনোআয়ার্স থেকে মাইল বারো দক্ষিণে এসে নোঙর ফেলেছে 'জেলী-ফিশ'। জায়গাটা পছন্দ হয়েছে বালতাসারের। উপকূলের কাছেই দু'দুটো পাহাড়ের সারি, সিধে জল থেকে উঠে গেছে ওপরে। মাঝখানের ছোট উপসাগরে নোঙর ফেলেছে 'জেলী-ফিশ'।

ছড়িয়ে পড়েছে নৌকোগুলো। এক-একটা নৌকোয় দুজন ডুবুরী। একজন ডুব দিচ্ছে – অপরজন দড়ি ধরে নৌকো সামাল দিচ্ছে।

উষ্ণ জল। কাঁচের মত স্বচ্ছ। এত স্বচ্ছ যে সমুদ্রতলের নুড়িগুলোও ওপর থেকে গোনা যায়। অপূর্ব সুন্দর বাগানের মত জলতলে বেড়ে উঠেছে প্রবাল-ঝোপ। রুপোর মত চকচকে দেহ নিয়ে ছোট ছোট মাছগুলো লুকোচুরি খেলছে প্রবালের অলিতে-গলিতে।

প্রবালের একটা বড় টুকরোয় ডুব দেওয়ার দড়ি বেঁধে দুই পায়ের মাঝে চেপে ধরল একজন ডুবুরী, তারপর ডুব দিল সমুদ্রতল লক্ষ্য করে। বালির ওপর হাঁটু গেড়ে বসে দ্রুত হাতে শুক্তি তুলে রাখতে লাগল কোমরের বেল্টের সঙ্গে বাঁধা থলিটায়। দড়ি ধরে গলুইয়ের কাছে বসে তার সঙ্গী গুরোনা। জলের ওপর

ঝুঁকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ডুবুরী বন্ধুর দিকে।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল ডুবুরী। দড়ি ধরে এমন হেঁচকা টান দিলে যে হুমড়ি খেয়ে জলে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল গুরোনা। দুলে উঠল নৌকো। তাড়াতাড়ি বন্ধুকে নৌকোয় টেনে তুলল গুরোনা। বন্ধুর দুই চোখ শামুকের মত ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। মুখ ছাইয়ের মত পাংশু।

'হাঙর নাকি ?'

জবাব দেওয়ার মত অবস্থা তখন নয় ডুবুরী বন্ধুর।

কিন্তু এত ভয় পাওয়ার আছে কি ? হেঁট হয়ে দেখতে লাগল গুরোনা।

মাথার ওপর দিকে এক দঙ্গল ছোট পাখী প্রাণভয়ে উড়ে গেল পাহাড়ের ঝোপ-ঝাড় লক্ষ্য করে—বাজ পাখী দেখা দিয়েছে আকাশের কোণে।

তারপরেই রক্তমেঘটা চোখে পড়ল গুরোনার। জলের নিচে একটা ডুবো পাহাড়। পাহাড়ের পেছন থেকে টকটকে লাল রঙের যেন একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে এল ধীরে ধীরে। আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগল জলতলের মেঘ—গাঢ় রক্তবর্ণের জায়গায় ফুটে উঠতে লাগল ফিকে গোলাপী আভা।

পরক্ষণেই এক কৃষ্ণবস্তুর আধখানা বেরিয়ে এল পাহাড়ের ও-পিঠ থেকে। আবার পিছু হটে গেল – মিলিয়ে গেল চোখের আড়ালে।

কিন্তু দেখতে ভুল হয়নি গুরোনার। কালো বস্তুটা হাঙর। আর রক্ত মেঘটা সমুদ্রতলে ফিনকি দিয়ে ছড়িয়ে পড়া রক্ত।

কিছু একটা ঘটছে ওখানে। রক্তপাত তো অকারণে ঘটতে পারে না। বন্ধুর দিকে ফিরে তাকাল গুরোনা। কিন্তু কথা বলার মত অবস্থা নেই তার। মুখব্যাদান করে খাবি খাওয়ার মত ফুসফুস ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে তো নিচ্ছেই। ঠিকরে বেরিয়ে পড়া দুই চোখ আকাশের দিকে নিবদ্ধ – সে চোখের তারায় তারায় সে কী নিঃসীম আতংক।

এ লোককে জেলী-ফিশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই।

ডেকের ওপর ওঠার পর ভীড় করে এল ডুবুরীরা।

একজন ছোকরা রেডইণ্ডিয়ান বললে – 'ওহে কথা বলো। এমন ভাব করছ যেন মুখ খুললেই প্রাণপ্রাখী ফুরুৎ করে উড়ে যাবে।'

মাথা নাড়ল আতংকিত ডুবুরী। একটু একটু করে সম্বিৎ ফিরে আসছে তার।

অনেকক্ষণ পরে বললে ভাঙা-ভাঙা তোৎলা সুরে – 'সমুদ্র-শয়তানকে আজ আমি দেখেছি।'

'সমুদ্র-শয়তান ?'

'কি রকম দেখতে তাকে ?' এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল সব ডুবুরী।

'চোখ তুলতেই চোখে পড়ল একটা হাঙর তেড়ে আসছে আমার দিকে। মস্ত কালো চেহারা—বিশাল খোলা চোয়ালে ঝকঝকে দাঁত। ভাবলাম বুঝি হয়ে গেল

আমার। তারপরেই দেখলাম তাকে।'—

'শয়তানকে ?'

'কি রকম দেখতে তাকে ? মাথা আছে ?'

'মাথা ? তা আছে বটে। চোখ দুটো পেল্লায় চাকতির মত বড় বড়।'

'চোখ যদি থাকে। তাহলে মাথাও আছে। মাথা ছাড়া চোখ হয় না,' বললে ছোকরা রেডইণ্ডিয়ান। 'পা আছে ?'

'সামনের পা জোড়া দেখছি – ব্যাঙের পায়ের মত সবুজ সবুজ লম্বা আঙুল নখওয়ালা থাবায় ঢাকা। মাছের মত সারা গায়ে আঁশ – আগুনের মত যেন জ্বলছিল ঝকঝকে আঁশগুলো। হাঙরটার দিকে সাঁ করে এগিয়ে গেল সে। সামনের পা দিয়ে এক ঘা মারতেই – ফ্যাঁস ! রক্তের ফোয়ারা ছড়িয়ে পড়ল –'

'পেছনের পা-দুটো কি রকম দেখতে বলো তো ?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলে একজন।

'পেছনের পা ?' একটু ভাববার চেষ্টা করলে শিহরিত ডুবুরী। তারপর বললে – 'পেছনে কোন পা-ই নেই। শুধু একটা ল্যাজ। ল্যাজের শেষে দু'দুটো সাপ।'

'কে বেশি ভয়ংকর ? হাঙর, না, সমুদ্র-শয়তান ? কাকে দেখে এত ভয় পেলে ?'

'রাক্ষসটাকে দেখে,' বিনা দ্বিধায় জবাব এল তক্ষুনি। 'আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে ঠিকই, তবুও ওকে দেখেই আমার হাত-পা অসাড় হয়ে এসেছিল।'

'সাগরের শয়তান,' বললে একজন রেডইণ্ডিয়ান।

'না, সাগরের দেওতা। যে দেওতা গরীবকে রক্ষা করে।' শুধরে দিয়ে বললে একজন বুড়ো রেডইণ্ডিয়ান।

ততক্ষণে খবর ছড়িয়ে গেছে দূরতম নৌকোতেও। গপ্পো শোনার আগ্রহ নিয়ে দলে দলে ডুবুরীরা ফিরে আসছে স্কুনারে।

আর, একই গল্প বার বার বলতে হচ্ছে তাকে। যতই বলছে, ততই মনে পড়ছে আরো খুঁটিনাটি। এখন জানা গেল, সাগর দত্যির নিঃশ্বাসে আগুন বেরোয়, কান নড়ে। তার দাঁত মুলোর মত, পাখনা মস্ত বড়, আর ল্যাজ জাহাজের হালের মত।

সাদা ট্রাউজার্স পরে চটিতে পা গলিয়ে ডেকের ওপর পায়চারী করতে করতে সব শুনে যাচ্ছিল পেড্রো জুরিটা।

আড়ষ্ট জিভ যতই সড়গড় হয়ে উঠতে থাকে, ততই নতুন নতুন তথ্য পরিবেশন করতে থাকে মৃত্যু মুখ থেকে ফিরে আসা ডুবুরী। আর ততই জুরিটার মনে এই ধারণাই দৃঢ়মূল হয়ে যেতে থাকে যে, ব্যাপারটা আর কিছুই নয়— জলের মধ্যে অসহায় ডুবুরীরা হাঙর দেখে অনেক রকম ভয় পায়। আর সেই

ভয় পাওয়ার ফলেই কল্পনায় অনেক দৃশ্য দেখে। সাগর-দানবের বর্ণনাও সেই নিদারুণ হাঙর-আতংক থেকে সৃষ্টি।

কিন্তু তাই যদি হবে, হাঙরটার পেট চিরে দু-ফাঁক করে দিল কে? সেটা তো আর আপনা থেকেই হতে পারে না। শুধু শুধু অত রক্তও সাগরের জল রাঙিয়ে তুলতে পারে না। মরতে মরতে বেঁচে এসে ব্যাটা বানিয়ে বানিয়ে গালগল্প মারছে ঠিকই, কিন্তু চোখের অন্তরালে এমন একটা কিছু ঘটেছে, যা সাধারণ ব্যাপার নয়।

ঠিক এই সময়ে ছুরিটার ভাবনার সুতো ছিঁড়ে গেল।

সাগরের বুক থেকে ভেসে এল শিঙে ফোঁকার শব্দ। আওয়াজটা এল ডুবো পাহাড়ের দিক থেকে।

নিমেষে যেন বজ্রাহত হয়ে গেল সবাই। পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত অসাড় হয়ে গেল জিভ। ছাইয়ের মত রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুখ। আতংক বিস্ফারিত চোখে একযোগে সবাই তাকিয়ে রইল ডুবো পাহাড়ের দিকে।

পাহাড়ের কাছে এক দঙ্গল ডলফিন মাছ জলে লাফালাফি করে খেলা করছিল। শংখধ্বনির রেশ বাতাসে মিলোতে না মিলোতেই সাড়া দিয়ে উঠল একটা ডলফিন। যেন শাঁখের ডাকেই সাড়া দিলে নাক দিয়ে জোরালো ঘোঁৎ শব্দ করে। পরক্ষণেই দল ছেড়ে তীরবেগে ছুটল পাহাড়ের দিকে। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে হয়ে গেল পাহাড়ের অন্তরালে।

কেটে গেল কয়েকটি উৎকণ্ঠিত মুহূর্ত। তারপরেই দেখা গেল তাকে।

পাহাড়ের গা ঘুরে আবার বেরিয়ে এল ডলফিনটা। পিঠে বসে একটা অত্যাশ্চর্য প্রাণী।

সাগর দানব — এইমাত্র যার বর্ণনা শুনল সকলে। দানবের দেহ আর মাথা মানুষের মতই। চোখ দুটো পেল্লায় ভাঁটার মত বড় বড়। সূর্যের আলোয় মোটরের হেডলাইটের মত ঝকঝক করে আলোক বিচ্ছুরণ করছে বিশাল সেই চোখ; গায়ের চামড়া নীলচে-রুপোলী; সামনের পা দুটো গাঢ় সবুজ রঙের। লম্বা লম্বা আঙুলগুলো পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া। পেছনের পা দুটো জলে ডুবে থাকায় তা মানুষের মত কি জানোয়ারের মত — বোঝা গেল না।

সামনের একটা পা দিয়ে একটা মস্ত পাকানো শাঁখ ধরে ছিল সাগর-দানব। সকলের চোখের সামনেই শাঁখে আর একবার সজোরে ফুঁ দিয়ে হেসে উঠল সে··· ···অবিকল মানুষের মতই স্ফূর্তি-উজ্জ্বল হাসি এবং আচম্বিতে চেঁচিয়ে উঠল পরিষ্কার স্প্যানিস ভাষায়—'আরো জোরে, লীডিং!' চেঁচিয়েই ব্যাঙের মত হাত দিয়ে ডলফিনের পিঠ চাপড়ে দিল সে···সেই সঙ্গে পেছনের পা দিয়ে খোঁচা মারতেই ওস্তাদ দৌড়বাজ ঘোড়ার মতই লাফিয়ে সামনে এগিয়ে গেল ডলফিনটা।

সবিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল ডুবুরীরা।

ঘুরে তাকালে আজব প্রাণী। পরমুহূর্তেই পিঠের ওপর দিয়ে পিছলে গিয়ে

ওপাশের জলে ডুব দিলে সে···জল থেকে সবুজ একটা হাত উঠে এসে পিঠ চাপড়াতেই অনুগত সঙ্গীর মতই সওয়ারের পেছন পেছন ডুব দিলে ডলফিন।

চকিতে অর্ধচন্দ্রাকৃতি পথে জলের তলা দিয়ে ঘুরে গেল সমুদ্রের দুই বিচিত্র বিস্ময়—তারপরেই অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়ের অন্তরালে।

পুরো ঘটনাটা ঘটতে এক মিনিটও গেল না। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে রইল সবাই।

তারপরেই দারুণ হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। আচম্বিতে যেন উন্মাদ হয়ে গেল ডুবুরীরা। কেউ ক্ষিপ্তের মত ছুটোছুটি করতে লাগল ডেকময় – আবার কেউ নতজানু হয়ে বসে পড়ে ভগবানকে ডাকতে লাগল এই দারুণ বিপদে প্রাণভিক্ষা দেওয়ার জন্যে। একজন ছোকরা মেক্সিকান ভয়ে তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে সড়সড় করে মাস্তুল বেয়ে উঠে গেল একদম ডগায়। নিগ্রোরা চোঁ-চাঁ দৌড় দিলে জাহাজের খোলে।

এরপর আবার কাজ শুরু করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অনেক কষ্টে আতংকবিহ্বল ডুবুরীদের খানিকটা বাগে আনল বালতাসার আর পেড্রো। তারপর নোঙর তুলে উত্তরদিকে রওনা হল 'জেলী-ফিশ'।

## জুরিটার কপাল খারাপ

কুণ্ডিতললাটে ডেক থেকে নিজের কেবিনে ফিরে এল পেড্রো জুরিটা। পাগল হতে আর বাকী কী! ঈষদুষ্ণ খানিকটা জল মাথায় ঢালতে ঢালতে ভাবলে পেড্রো।

শেষকালে সমুদ্র-শয়তান কিনা খাঁটি স্প্যানিশ বলতে আরম্ভ করেছে! কিন্তু ব্যাপারটা কি? একি সত্যিই শয়তানের শয়তানি? না, মরীচিকা দর্শন? চোখের ভুল দু'একজনের হতে পারে, কিন্তু ডেকশুদ্ধ মাঝিমাল্লার তো আর হতে পারে না। একই স্বপ্ন কি দু'জনে দেখে? দেখে না। তবে?

অসম্ভব এই দৃশ্য যখন এতগুলো লোক দেখেছে একই সাথে, তখন সমুদ্র-শয়তান সত্যিই আছে। অবিশ্বাস্য মনে হলেও সত্যিই আছে সাগর-দানব।

আরও খানিকটা জল হড়-হড় করে মাথায় ঢালল জুরিটা। তারপর পোর্ট-হোল দিয়ে মাথা গলিয়ে হাওয়া লাগাতে লাগল মাথায়। সমুদ্রের দানবই হও আর যাই হও, স্প্যানিশ বলো চমৎকার। বুদ্ধি-শুদ্ধিও বিলক্ষণ আছে বলেই মনে হল। এরকম দানোর সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলে সুখ আছে। আহারে, এমন দানবকে দিয়ে যদি মুক্তো তোলানো যেত! আরে, তাও তো বটে! জাহাজ ভর্তি ডুবুরী যা না করতে পারবে, এরকম একটা সমুদ্র-শয়তান তা করে দেবে। সাগর সেঁচে সেরা মুক্তো এনে দেবে পেড্রো জুরিটার হাতে। টাকা! তারপর শুধু টাকা! বিশ্বের সেরা ধনী হয়ে বসবে পেড্রো জুরিটা।

চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল জুরিটার। কুবের ঐশ্বর্যের রঙীন স্বপ্নে বিভোর

হয়ে গেল তার দু'চোখ। এই প্রথম নয়। এর আগের এমনি কতবার স্বপ্ন দেখেছে পেড্রো। দেখেছে রত্নাকর সমুদ্র-লুণ্ঠনের অসম্ভব স্বপ্ন। নতুন নতুন মুক্তাক্ষেত খুঁজে বার করার কত চেষ্টাই না সে করেছে। এমন জায়গায় যেতে চেয়েছে — যেখানকার হদিশ আর কোনো ডুবুরী পায়নি। পারস্য উপসাগর, সিংহলের পশ্চিম উপকূল, লোহিত সমুদ্র আর অষ্ট্রেলিয়ার উপকূল অনেক দূরের পথ। তাছাড়া ঝাঁকে ঝাঁকে ডুবুরী সেখানে কিছু কি আর রেখেছে! এমন কি আমেরিকার সেরা মুক্তো যেখানে পাওয়া যায়, সেই মেক্সিকো উপসাগর, ক্যালিফোর্ণিয়া উপসাগর আর ভেনজুয়েলার উপকূলও তার নাগালের বাইরে। পুরোন স্কুনার নিয়ে অত পথ পাড়ি দিতে সাহসে কুলোয় না। শুধু স্কুনার কেন, এ অভিযানে চাই আরও ডুবুরী, আরো টাকা। কিন্তু জুরিটার টাকা নেই। তাইতো এ তল্লাট ছেড়ে নড়বার নাম করে না জুরিটা।

কিন্তু এখন সব সমস্যার অবসান ঘটবে। এখন আর দূরে যাওয়ারও কোনো দরকার নেই। মুক্তোর পাহাড় জমিয়ে ফেলতে পারবে জুরিটা — যদি সমুদ্র-শয়তানকে কোনোভাবে বাগে আনা যায়।

শুধু আর্জেণ্টাইন কেন, আমেরিকাতেও তার মত ধনী আর কেউ থাকবে না। টাকার স্রোতের সঙ্গে আসবে ক্ষমতা। নাম ছড়িয়ে পড়বে সারা পৃথিবীতে······কিন্তু এখান থেকেই খুব হিসেব করে চলতে হবে। প্রথমেই ডুবুরীদের মুখ বন্ধ করা দরকার।

ডেকে উঠে গিয়ে স্কুনারের মাঝিমাল্লা ডুবুরীকে — সবাইকে ডাকিয়ে আনল জুরিটা।

বলল — 'গুজব ছড়ানোর কি শাস্তি তা তোমরা জানো। যারা যারা গুজব রটিয়েছে, তারাই পচছে জেলে। তাই তোমাদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। ডাঙায় গিয়ে কাউকে কোনো কথা বললেই মরবে। কেউ বিশ্বাস করবে না — উল্টে পুলিশ হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দেবে হাজতে। কাজেই সাবধান! যা দেখলে তা ভুলে যাও।'

বলে, বালতাসারকে নিয়ে নিচে নেমে এল জুরিটা।

নীরবে সমস্ত পরিকল্পনাটা শুনল বালতাসার।

সব শোনার পর বললে — 'খাসা প্ল্যান। একশো ডুবুরীর কাজ ও একাই করে দেবে। কিন্তু তার আগে তো ওকে ধরা চাই।'

'খুব শক্ত জাল ফেললেই হল।'

'হাঙরের পেট যেভাবে ফাঁসিয়েছে, ঐভাবেই জাল কেটে পালাবে।'

'তারের জাল করতে পারি।'

'কিন্তু জাল ফেলবে কে? আমার কোনো ডুবুরী পারবে না। লাখ টাকা দিলেও ওকাজ কারুর দ্বারা হবে না। সমুদ্র-শয়তানের নাম শুনলে ভয়ে হলদে হয়ে যায় যারা, তারা জাল ফেলে ধরবে তাকে?'

'কিন্তু বালতাসার, তুমি ?'

'শয়তান-ফয়তান আমি কোনোদিন ধরিনি। ধরাটাও খুব সহজ হবে মনে করি না।'

'তা না হতে পারে, কিন্তু তুমি কি ভয় পেয়েছো, বালতাসার ? সমুদ্র-শয়তান সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা শুনি ?'

'শূন্যে ওড়া জাগুয়ার আর গাছে ওঠা হাঙর সম্বন্ধে আমার যা ধারণা, সমুদ্র-শয়তান সম্বন্ধেও তাই। যে জানোয়ারের মতি-গতি কিছুই জানা নেই, সে তো ভয়ংকর বটেই। তাহলেও ভয় আমি পাইনি।'

'তোমার সাহসের পুরস্কার আমি দেব,' – বালতাসারের কাঁধে হাত রেখে বললে জুরিটা। 'এ ব্যাপার যত কম লোকে জানে, ততই মঙ্গল। গোটা ছয়েক অ্যারোক্যানিয়ান বেছে নিও। ওদের সাহস আছে। যদি রাজী না হয় তো ডাঙায় গিয়ে জনা ছয়েক জোগাড় করে নিও। সমুদ্র-শয়তান কাছাকাছিই কোথাও আছে। প্রথমেই তার ডেরাটা খুঁজে বার করতে হবে আমাদের। তারপর জাল-ফেলার প্রশ্ন।'

সময় নষ্ট করার পাত্র নয় জুরিটা। জাহাজেই একটা বড় পিপের মত তারের জালের থলি ছিল। তার মধ্যে সাধারণ জাল বিছিয়ে দেওয়া হল, যাতে জালে জড়িয়ে যায় সমুদ্র-শয়তান। ডুবুরীদের পাওনা মিটিয়ে বিদেয় দেওয়া হল। জাহাজ থেকে মাত্র দুজন আর বিউনো আয়ার্স থেকে তিনজন – মোট এই পাঁচ-জন অ্যারোক্যানিয়ানকে জোগাড় করল বালতাসার।

উপকূল থেকে বেশ কয়েক মাইল তফাতে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে রইল স্কুনার – যাতে সমুদ্র-শয়তানের সন্দেহের উদ্রেক না হয়। তারপর মাঝে মাঝে মাছ ধরার অছিলায় নৌকা নিয়ে বেরোতে লাগল বালতাসারের সাঙ্গ-পাঙ্গরা। উপকূলের পাথরে লুকিয়ে সমানে জলের ওপর চোখ রেখে পালা করে বসে রইল তারা।

দ্বিতীয় হপ্তাও যায়-যায়, কিন্তু তখনও পাত্তা নেই সমুদ্র-শয়তানের।

স্থানীয় গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলেছিল বালতাসার। আধাদামে নৌকোভর্তি মাছ বেচে দিয়ে খোসগল্প করতে করতে সমুদ্র-শয়তান সম্বন্ধে অনেক খবরই জানলে সে। শাঁখের আওয়াজ নাকি এ অঞ্চলে অনেকেই শুনেছে। বালির ওপর পায়ের ছাপও দেখেছে। গোড়ালীর ছাপ মানুষের মত হলেও আঙুলগুলো অস্বাভাবিক লম্বা। বালির ওপর শুয়ে থাকার ফলে সমুদ্র-দানবের পিঠের ছাপও অনেকে দেখেছে।

কিন্তু কারো কোনো ক্ষতি করেনি সমুদ্র-শয়তান। তাকে নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না। তাছাড়া কেউ কোনোদিন স্বচক্ষেও দেখেনি তাকে।

পুরো দুহপ্তা ধরে উপসারের জল তোলপাড় করে ফেলল বালতাসার আর জুরিটা। দু-হপ্তার প্রতিটি দিন হন্যে হয়ে ঘুরতে লাগল সমুদ্র-শয়তানের

আশায়। কিন্তু সবই বৃথা। এদিকে এক-একদিন যাওয়া মানেই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার অপচয়। শেষকালে জুরিটার নিজের মনেই সংশয় দেখা দিল। সত্যি সত্যিই কি শয়তানকে জাল দিয়ে ধরা যাবে? তাছাড়া শয়তান বলে যার পেছনে দৌড়ান হচ্ছে, সে তো শয়তান নাও হতে পারে। আসলে হয়তো একজন পাকা সাঁতারু নষ্টামি জুড়েছে এ অঞ্চলে। আর ডলফিন? ডলফিন পোষ মানানো কি খুব কঠিন কাজ? মোটেই না। খামোকা টাকাগুলো নষ্ট না করে কাজের কাজ করলেই হত। পাততাড়ি গুটোবো কিনা, সিরিয়াসলি তাই ভাবতে লাগল জুরিটা।

আশানিরাশায় দুলতে দুলতে আরও কয়েকটা দিন থাকার ঠিক করল পেড্রো। ইতিমধ্যে সাঙ্গপাঙ্গদের জানিয়ে দিলে, সমুদ্র-শয়তানকে যে সবার আগে দেখতে পাবে, তাকে মোটা পুরস্কার দেওয়া হবে।

আনন্দের সীমা-পরিসীমা রইল না তৃতীয় সপ্তাহে। আবার উৎপাত শুরু হল সমুদ্র-শয়তানের।

সারাদিন মাছ ধরেছিল বালতাসার। মাছভর্তি নৌকাটা তীরে বেঁধে রেখে গাঁয়ের এক রেডইণ্ডিয়ান বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছিল। তখন সন্ধ্যে হতে আর বিশেষ দেরী নেই।

ফিরে এসে দেখে নৌকা খালি – মাছ উধাও।

এ কাজ যে সমুদ্র-শয়তানেরই কীর্তি – সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না বালতাসারের।

কিছুক্ষণ পরেই আর একজন পাহারাদার রেডইণ্ডিয়ানের কাছে খবর পাওয়া গেল রহস্যময় সেই শাঁখের আওয়াজ ভেসে এসেছে তার কানে। দিনদুয়েক পরেই এল আরও চাঞ্চল্যকর সংবাদ। ভোরের দিকে সমুদ্র-শয়তানকে দেখতে পেয়েছে একজন ছোকরা অ্যারোক্যানিয়ান। ডলফিনের সঙ্গে গভীর সমুদ্র থেকে ফিরে এসেছে সে। এবার আর পিঠে সওয়ার হয়ে নয় – পাশাপাশি সাঁতার কেটে। ডলফিনের ঘাড়ে লাগানো একটা চামড়ার বেল্ট ধরে ছিল সমুদ্র-শয়তান। উপসাগরে ঢুকে কলারটা খুলে নিয়ে ডলফিনের পিঠে চাপড় মারে সে। পরক্ষণেই উপকূলের কাছে গিয়ে ডুব মারে, আর ভেসে উঠতে দেখা যায়নি।

মোটা পুরস্কারের কথাটা আর একবার মনে করিয়ে দিয়ে জুরিটা বললে – 'আজ আর ডেরা ছেড়ে সমুদ্র-শয়তান বেরোবে বলে মনে হয় না। ভালই হল। জলের নিচটা একবার দেখে আসবার সময় পাওয়া গেল। কে যাবে?' কিন্তু ওরকম ঝুঁকির মধ্যে যাওয়ার সাহস কারুরই ছিল না।

শেষকালে বালতাসারই এগিয়ে এল।

বললে – 'আমি যাবো।'

চারদিকে চোখ রাখবার জন্যে জাহাজে একজনকে রেখে খাড়াই ডুবো

পাহাড়টায় এসে উঠল সকলে।

কোমরে দড়ি বাঁধল বালতাসার। দু' হাঁটুর মধ্যে একটা পাথরের ডেলা নিয়ে দাঁতের ফাঁকে ছুরী চেপে ধরে নেমে গেল জলের মধ্যে।

নিদারুণ উৎকণ্ঠায় তীরে বসে সময় গুনতে লাগল সঙ্গীরা। সবারই চোখ জলের মধ্যে—পাহাড়ের ছায়া পড়ে যেখানটা গাঢ় নীল হয়ে গেছে–ঠিক সেখানেই ডুব দিয়েছে বালতাসার। ধীরে ধীরে কাটল এক মিনিট। আরও কিছুক্ষণ। তার পরেই দড়িতে টান পড়ল। টেনে তোলা হল বালতাসারকে।

তীরে ওঠার বেশ কিছুক্ষণ পরে বললে বালতাসার–'গুহার মত সরু একটা পথ রয়েছে নিচে। অন্ধকার। হাঙরের পেটের মত কালো।'

'চমৎকার!' সোল্লাসে বললে জুরিটা। 'যত অন্ধকার হয় ততই মঙ্গল। জালটা শুধু পেতে বসে থাকলেই হল, শয়তান নিজেই এসে বসে থাকবে জালের মধ্যে।'

সন্ধ্যার আঁধার সাগরের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে, জাল নামিয়ে দেওয়া হল তখনি। জলেডোবা গুহার মুখ ঢেকে দেওয়া হল তারের মজবুত জাল দিয়ে –দড়িগুলো শক্ত করে বেঁধে রাখা হল তীরের পাথরে। সবশেষে অনেকগুলো ছোট ছোট ঘণ্টা দড়ির সঙ্গে বেঁধে দিলে বালতাসার–যাতে জালে টান পড়লেই ওপরের ঘণ্টা বেজে ওঠে।

জাহাজে কেউ রইল না। জাল টানার জন্যে সবাইকে দরকার। বালির ওপর সবাই ওৎ পেতে বসে রইল সমুদ্র-শয়তানের আশায়।

রাত এগিয়ে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে চাঁদ উঠে পড়ল আকাশে। রুপোলী পাতা দিয়ে যেন ঢাকা পড়ল বিশাল সমুদ্র। আর, অসীম উৎকণ্ঠায় নিশ্চুপ হয়ে তীরে বসে রইল জুরিটা, বালতাসার আর অন্যান্য জোয়ানরা। জেলেদের আতংক, সমুদ্র-শয়তান যে কোন মুহূর্তে উঠে আসতে পারে সমুদ্রের গর্ভ থেকে।

আরও রাত হয়। ঢুলতে থাকে সকলে।

আচম্বিতে বেজে উঠল ঘণ্টাগুলো। ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল প্রত্যেকে। তীরবেগে দৌড়ে গিয়ে টেনে ধরলো দড়ি। দারুণ টান পড়েছে দড়িতে। গুরুভার কিছু একটা জালের মধ্যে থেকে ছটফট করে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করছে।

অনেক টানাটানির পর জাল উঠে এল ওপরে। চাঁদের নরম আলোয় দেখা গেল অদ্ভুত এক প্রাণীকে। অর্ধমানব—অর্ধপশু। সমস্ত দেহে প্রবল মোচড় দিয়ে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে আশ্চর্য সেই জীব। বিশাল দুই চোখ আর রুপোর মত আঁশ ঝকমক করছে চাঁদের আলোয়। ডান হাতটা তারের জালে আটকে গেছিল। মরিয়া হয়ে হাতটা ছাড়ানোর চেষ্টা করছিল সে। তারপরেই এক ঝটকায় মুক্ত হল হাত চোখের নিমেষে কোমরের চামড়ার বেল্ট

থেকে ছুরিটা টেনে নিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে কোপাতে লাগল তারের জাল।

বিড়বিড় করে বললে বালতাসার—'উঁহু, উঁহু, তার কি ছুরিতে কাটে ?'

কিন্তু পরক্ষণেই চমকে উঠতে হল বালতাসারকে। প্রাণপণে ডুবুরীরা জাল-শুদ্ধ শয়তানকে তীরে টেনে তোলার আগেই মোক্ষম কয়েকটা কোপে ফেঁসে গেল তারের জাল।

'জোরে, আরও জোরে,' চেঁচিয়ে উঠল বালতাসার।

কিন্তু তার আগেই আরও কয়েকটা কোপ দিয়ে ফাঁকটাকে আরও বড় করে ফেলেছে সমুদ্র-শয়তান। ডুবুরীরা তাকে জাল শুদ্ধ চেপে ধরতে গিয়েও মস্ত মাছের মতই সে পিছলে গেল—কাটা জালের মধ্যে দিকে চক্‌চকে দেহ নিয়ে আছড়ে পড়লো রুপোলী জলে···

আর উঠল না!

বোবার মত দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল জোয়ানেরা।

সপ্রশংস চোখে বালতাসার শুধু বললে—'একি মাখন কাটা ছুরী না কিরে – জলের তলায় এমন কামারও আছে।'

এমন ভাবে বড় বড় চোখে জলের দিকে তাকিয়ে রইল পেড্রো জুরিটা যেন সমুদ্র-শয়তানের সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত স্বপ্ন-সম্পদও ডুব দিয়েছে জলতলে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে অপরিসীম ক্রোধে ফেটে পড়ল জুরিটা। দমাস করে বালির ওপর এক লাথি বসিয়ে দিয়ে হুংকার দিলে ব্রজকণ্ঠে – 'এত সহজে ছাড়ছি না তোমায়। আমি আবার আসব। সেরা ডুবুরীদের নিয়ে জালে জালে ছেয়ে দেব এ অঞ্চল – ফাঁদে তোমাকে ফেলবই, তবে ছাড়ব।'

পেড্রো জুরিটার আর যাই থাক না থাক, সাহস আর জেদের অভাব ছিল না। স্প্যানিশ রক্ত টগবগিয়ে উঠল তার ধমনীতে ধমনীতে – দুর্জয় পণ নিয়ে শুরু হল তার দুরন্ত প্রচেষ্টা।···

## ডক্টর স্যালভেটর

জলমধ্যস্থ গুহার সন্ধান যখন পাওয়া গেছে, তখন ফাঁদ পাতা যাক গুহার সামনেই। বেশ খানিকটা জায়গা জাল, কাঁটাতার আর ফাঁদে ঢেকে দিলে জুরিটা। দু'একটা সংকীর্ণ পথ রইল বটে, তাও কাঁটা তারের গোলক ধাঁধায় দুর্গম হয়ে রইল।

কিন্তু এত চেষ্টা করেও মাছ ছাড়া জালে আর কিছুই পড়ল না। টিকি দেখা গেল না সমুদ্র-শয়তানের। তার ডলফিন বন্ধু অবশ্য রোজই মাঝ দরিয়া থেকে উপকূলের কাছাকাছি এসে অপেক্ষা করেছে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করেছে, জল তোলপাড় করে লাফালাফি করেছে – যেন প্রতীক্ষা আর সহ্য হয়নি। তবুও দেখা দেয়নি সমুদ্র-শয়তান। শেষে শেষবারের মত নাসিকাধ্বনি করে ফিরে গেছে খোলা সমুদ্রে।

এই রকম রোজই চলল। তারপর আবহাওয়া আরও খারাপ হয়ে উঠল। পূব হাওয়ার দৌরাত্ম্যে বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল বালুকাবেলায়। জল ঘুলিয়ে গেল। সমুদ্রের সাদা ফেনা ছাড়া আরও কিছুই চোখে পড়ল না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা বালির ওপর বসে রইল জুরিটা। নিদারুণ উদ্বেগে মনের অবস্থা কহতব্য নয়। অথচ বসে বসে চুপচাপ ঢেউ শোনা ছাড়া আর কোনো কাজ ছিল না। গজরাতে গজরাতে বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়ত তীরে—যাবার সময়ে নুড়ি আর শামুক-ঝিনুকের রাশি ছড়িয়ে দিয়ে যেত—কিন্তু বারেকের জন্যেও সমুদ্র-শয়তানের দর্শন পাওয়া গেল না।

ধৈর্যের বাঁধ একদিন ভাঙল। বালতাসারকে ডেকে বললে—'একটা কিছু করা দরকার। এরকম ভাবে জবুথবু হয়ে আর কাঁহাতক বসে থাকা যায়। জলের তলার আস্তানা ছেড়ে ; সমুদ্র-শয়তান যখন লড়বে না, তখন আমরাই যাব তার কাছে।' আর একটা নতুন ধরনের ফাঁদ তৈরী করেছিল বালতাসার। জুরিটার কথায় চোখ তুলল। জুরিটা বললে—'বিউনো আয়ার্সে গিয়ে দুটো ডুবুরীর পোশাক নিয়ে এস। অক্সিজেনের সরঞ্জাম যেন থাকে। সাধারণ পোশাক চলবে না—অক্সিজেনের টিউব কেটে দিতে পারে সমুদ্র-শয়তান। ভাল জিনিস নিও। তারপর চলো দুজনে জলের তলায় বেড়িয়ে আসি। ভাল কথা, ইলেকট্রিক টর্চ নিতে ভুলো না।'

'সমুদ্র-শয়তানের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেওয়ার মতলব নাকি ?' জানতে চাইল বালতাসার।

'হ্যাঁ, তাই।'

আর কিছু না বলে বিউনো আয়ার্সে চলে গেল বালতাসার। ফিরে এল দুটো ডাইভিং সুট, টর্চ আর দুটো অদ্ভুত রকমের বেঁকা ব্রোঞ্জের ছুরী নিয়ে।

জুরিটাকে বললে—'এ ছুরী আর আজকাল কেউ বানায় না। সেকালে এই ছুরী দিয়েই আমার পূর্বপুরুষরা তোমার পূর্বপুরুষদের ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিতে।'

ছুরী-জোড়া পছন্দ হয়ে গেছিল জুরিটার। তাই ইতিহাসপর্ব নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামালো না।

পরের দিন খুব ভোরে অশান্ত সমুদ্রে নেমে পড়ল জুরিটা আর বালতাসার। ডুবুরী-পোশাক থাকায় কোন অসুবিধা হচ্ছিল না বটে, কিন্তু নিজেদেরই পাতা ফাঁদ এড়িয়ে গুহার মুখে পৌঁছাতেই হিমসিম খেয়ে গেল দুজনে।

অন্ধকার গুহামুখ। নিরন্ধ্র সেই অন্ধকার দেখে বুক দুরদুর করে ওঠে। খাপ থেকে ছুরী খুলে নিয়ে আর এক হাতে টর্চের বোতাম টিপতেই অন্ধকার ফালা ফালা হয়ে গেল। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে ক্ষুদে মাছেরা আশপাশ দিয়ে সাঁৎ সাঁৎ করে ছিটকে বেরিয়ে গেল বাইরে। নীলচে রঙের দুটো আলোক-বর্শার মধ্যে মশার ঝাঁকের মতই পালে পালে বেরিয়ে আসতে লাগল ক্ষুদে মাছ।

মাছগুলো সরে না যাওয়া পর্যন্ত এগোনো গেল না। রুপোলী আঁশের

ঝিকিমিকিতে চোখে ধাঁধা লেগে যাওয়ায় পা বাড়ানোও সম্ভব ছিল না।

অচিরেই ফাঁকা হয়ে গেল গুহার অভ্যন্তর। মস্ত গুহা। মাথায় প্রায় বারো ফুট উঁচু, আর চওড়ায় বিশ ফুট। শূন্য গুহা। বড়োসমুদ্র থেকে মাছের দঙ্গল পালিয়ে সাময়িক আশ্রয় নিয়েছিল—আলোর তাড়া খেয়ে তারাও এখন উধাও।

সাবধানে পা ফেলে ফেলে ভেতরে ঢুকল দুজনে। ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে আসতে লাগল রন্ধ্রপথ, তারপরেই আচম্বিতে যেন পাথর হয়ে গেল জুরিটা।

টর্চের জোরালো আলোয় অন্ধকারের মধ্যে জেগে উঠেছে একটা লোহার গরাদ। বিলক্ষণ মজবুত লোহার শিক দিয়ে বন্ধ গুহামুখ।

জুরিটা নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারল না। শক্ত মুঠিতে গরাদ আঁকড়ে ধরে গোটা গ্রীলটাকে টান মেরে পাথরের দেওয়াল থেকে খসিয়ে আনার চেষ্টা করল কয়েকবার। কিন্তু বৃথাই, এক চুলও নড়ল না মোটামোটা লোহার জালতি। ভাল করে দেখতে গিয়ে কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেল। গুহার পাথুরে দেওয়ালের ভেতরে ঢুকিয়ে গেঁথে দেওয়া হয়েছে শিকগুলো। তালাটাও কোথাও না কোথাও গাঁথা আছে।

নতুন প্রহেলিকার সম্মুখীন হল পেড্রো, জুরিটা আর বালতাসার।

যতটা ভাবা গেছিল দেখা যাচ্ছে সমুদ্র-শয়তান তার চাইতেও বেশী ধী-শক্তির অধিকারী। জলতলের গোপন কন্দরে পাহারা নেই বটে, কিন্তু আস্তানাটা যে নিষিদ্ধ এলাকা তা ববাহুতকে ভাল করেই সমঝে দেওয়ার জন্যে বসানো হয়েছে অত্যন্ত মজবুত লোহার গরাদ। কিন্তু এযে অসম্ভব! একেবারেই অসম্ভব! জলের তলায় তো আর গরাদটা বানায়নি সে, বানাতে পারে না। এ থেকেই ধরে নেওয়া যায়, জলের মধ্যে সে আদৌ বাস করে না অথবা ডাঙায় তাকে আসতেই হয় এবং দীর্ঘদিন কাটিয়ে যেতে হয়।

ভাবতে ভাবতে জুরিটার মাথা দপদপ করতে লাগল, ব্রহ্মতালু এমন গরম হয়ে গেল যেন অক্সিজেনের অভাব ঘটেছে।

বালতাসারকে ইঙ্গিতে ডেকে নিয়ে গুহার বাইরে এসে দাঁড়াল জুরিটা। সেখান থেকে জলের ওপরে।

দুজন অ্যারোক্যানিয়ান অধীর আগ্রহে বসে ছিল বালুকাবেলায়। সশরীরে বালতাসার আর জুরিটাকে ফিরে আসতে দেখে যারপর নাই খুশী হল তারা।

হেলমেটটা খোলা হতেই ফুসফুস ভরে শ্বাস নিয়ে বললে জুরিটা—'বালতাসার, কি মনে হয় তোমার?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বালতাসার জবাব দিলে—'কবে সে বেরুবে এই আশায় বসে থাকতে গেলে কয়েক যুগ বসে থাকতে হবে, এক হতে পারে, ডিনামাইট দিয়ে গ্রীলটা উড়িয়ে দেওয়া। তাছাড়া কোনো উপায় নেই। উপোস করেও মরবে না সে। কারণ, মাছের অভাব নেই গুহার মধ্যে।'

'গুহার আর একটা মুখও তো থাকতে পারে। ধরো, সে-মুখ আছে ডাঙার ওপরে।'

কাজেই এবার জল ছেড়ে ডাঙায় শুরু হল তল্লাসি পর্ব।

কিছুদূরে দেখতে পাওয়া গেল মস্ত উঁচু একটা সাদা পাথরের দেওয়াল। নিরেট দেওয়াল। পাঁচিল বরাবর হাঁটতে হাঁটতে দেখা গেল, কমসে কম আশি-বিঘে জমি ঘেরাও করে রেখেছে পুরো দেয়ালটা। শুধু এক জায়গায় একটি মাত্র ফটক ছাড়া আর কোথাও ফাঁক নেই, তাও নিরেট ইস্পাতের পাত দিয়ে মোড়া। এককোণে একটা ছোট্ট চোরা দরজা, ইস্পাতের। গায়ে এতটুকু একটা ফোকর। ফোকরটা ভেতর থেকে বন্ধ।

এ যে দেখছি রীতিমতো কেল্লা, মনে মনেই ভাবে জুরিটা। ব্যাপার তো সুবিধের মনে হচ্ছে না। এ তল্লাটের গেঁইয়াদের এত উঁচু দেওয়াল গাঁথবার পয়সাও নেই, মাথাব্যথাও নেই। আর দেওয়াল বলে দেওয়াল! কোথাও এতটুকু চির নেই, ফাটল নেই যে ভেতরে উঁকি দেওয়া যাবে।

কাছাকাছি লোকবসতিরও চিহ্ন নেই, শুধু কাঁটাগাছ আর এবড়ো খেবড়ো পাথরের ঢিবি—সেই সমুদ্রতীর পর্যন্ত।

উদগ্র হয়ে ওঠে জুরিটার কৌতূহল। পুরো দুটো দিন পাঁচিলের চারধারে পাথুরে ঢিবির আনাকানাচে ঘুরঘুর করল সে······তীক্ষ্ন চোখ রইল ইস্পাতের ফটকের ওপর। কিন্তু কাকস্যপরিবেদনা!

ফটক খুলে কেউ বাইরে এলো না, ভেতরেও গেল না।

একদিন সন্ধ্যায় 'জেলী ফিশে'র ডেকে বালতাসারকে জিজ্ঞেস করলে জুরিটা—'কেল্লায় কে থাকে জানা আছে?'

'স্যালভেটর। রেডইন্ডিয়ান চাষীদের কাছে নাম শুনেছি।'

'কে সে?'

'ভগবান।'

স্প্যানিয়ার্ড জুরিটার ঝোপের মত ভুরুজোড়া কপালে উঠে আসে।

'ইয়ার্কি হচ্ছে নাকি?'

ফিকে হাসি ছুঁয়ে যায় বালতাসারের ঠোঁটের কোণে।

'যা শুনেছি, তাই বললাম। রেডইন্ডিয়ানরা বলে, স্যালভেটর তাদের ভগবান, স্যালভেটর তাদের রক্ষক।'

'রক্ষাটা কি থেকে করে শুনি?

'যমের হাত থেকে। স্যালভেটর নাকি সর্বশক্তিমান। ইচ্ছে করলেই নাকি এমন আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা দেখাতে পারে সে যা দৈবঘটনার সামিল। জীবন আর মৃত্যুকে সে হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছে। সে খোঁড়াকে নতুন পা দিতে পারে, অন্ধকে নতুন চোখ দিতে পারে, এমন কি মড়াকেও নতুন জীবন দিতে পারে।'

'ক্যারাম্বা!' মাতৃভাষায় বিস্ময় প্রকাশ করে জুরিটা। মোটা মোটা গোঁফ-

জোড়ায় জোরালো মোচড় দিয়ে বলে—'জলে সমুদ্র-শয়তান, আর ডাঙায় ভগবান। দুজনে পার্টনার কিনা, তাই ভাবছি।'

'আমার কথা যদি শোনো তো আর দেরী কোরো না। এ তল্লাট ছেড়ে লম্বা দাও। এ সব অলৌকিক ব্যাপার নিয়ে মগজ ঘুলোবার আগেই চলো সরে পড়ি।'

'স্যালভেটর যাদের সারিয়ে তুলেছে, এমন কাউকে দেখেছো তুমি ?'

'দেখেছি। একজনের পা ভেঙ্গে গেছিল, স্যালভেটরের কাছে তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। এখন সে দিব্যি দৌড়োদৌড়ি করে বেড়ায়। আর একজন রেডইণ্ডিয়ান মরে একদম কাঠ হয়ে গেছিল। মাথার খুলি গুঁড়িয়ে গেছিল। স্যালভেটরের কাছ থেকে নতুন জীবন নিয়ে হাসতে হাসতে ফিরে এসেছে। বিয়ে করেছে। ছেলেপুলেও হয়েছে—'

'স্যালভেটর তাহলে রুগী দেখে ?'

'রেডইণ্ডিয়ান রুগী। অনেক দূর থেকে তারা আসে স্যালভেটরের কাছে।'

জুরিটা কিন্তু সন্তুষ্ট হল না। আরও খবর চাই তার। সুতরাং গেল বিউনো আয়ার্সে।

সেখানেও সেই একই স্যালভেটর-প্রশস্তি। স্যালভেটর যাদেরকেই সারিয়ে তুলেছে, তাদের কাছেই সে অলৌকিক ক্ষমতাধর। সব রুগীই রেডইণ্ডিয়ান। ডাক্তাররা বললে, শল্যচিকিৎসায় স্যালভেটরের প্রতিভা জন্মগত। অপারেশন টেবিলে তার দক্ষতা এক কথায় অসাধারণ, অসামান্য প্রতিভাধর বটে, কিন্তু পাগলাটে। এধরনের মানুষ সাধারণত যে রকম হয়—ঠিক তাই। অতলান্তিক মহাসাগরের উভয় তীরেই চিকিৎসকমহলে তার নাম সুবিদিত। আমেরিকায় তার বিশেষ নামডাক আছে অদ্ভুত কল্পনার অথচ আশ্চর্য নির্ভীক অস্ত্রচিকিৎসার জন্যে। হতাশ হয়ে সার্জনরা যে কেস ছেড়ে দিয়েছে, স্যালভেটরের সেখানে ডাক পড়েছে। কখনো না বলেনি সে। মহাযুদ্ধের সময়ে ফরাসী রণক্ষেত্রে ছিল স্যালভেটর। সেখানে যত অপারেশন তাকে করতে হয়েছে, তার অধিকাংশই মগজসংক্রান্ত। হাজার হাজার লোক প্রাণ ফিরে পাওয়ার জন্যে তার কাছে কৃতজ্ঞ। যুদ্ধবিরতির পর দেশে ফিরে আসে স্যালভেটর। প্র্যাকটিস আর অকল্পনীয় অপারেশনের ফলে প্রচুর অর্থ রোজগার করে। তারপরেই সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বিউনো আয়ার্সে খানিকটা জমি কিনে উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘিরে ফেলে সমস্ত জায়গাটা (পাগলামির আর একটা নিদর্শন) এবং বসবাস শুরু করে। যতদূর জানা গেছে, গবেষণা নিয়েই এখন সে ব্যস্ত। রেডইণ্ডিয়ান ছাড়া আর কারো চিকিৎসা করে না। তারাও তাকে মর্তে অবতীর্ণ ভগবানের মতই পুজো করে।

আরও খবর পাওয়া গেল। যুদ্ধের আগে এ অঞ্চলে স্যালভেটরের একটা বাড়ী ছিল। দেয়ালঘেরা ঐ জমিতেই ছিল বাড়ীটা। চারিদিকে ফল আর ফুলের বাগান ছিল এবং সমস্ত বাগান আর বাড়ী ঘেরা ছিল উঁচু পাঁচিল দিয়ে। স্যালভেটর যখন ফ্রান্সে যায়, তখন একদল হিংস্র ব্লাডহাউণ্ডকে নিয়ে একজন

নিগ্রো বাগানবাড়ী পাহারা দিয়েছে।

ইদানীং আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে স্যালভেটর। ইউনিভার্সিটির পুরোনো সহকর্মীরা এলেও দেখা করত না।

সব শুনে জুরিটা ঠিক করলে অসুখের অছিলা নিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে।

আবার এসে দাঁড়ায় সুদৃঢ় ইস্পাত ফটকের সামনে। টোকা মারে ইস্পাতের চাদরে। কিন্তু কেউ সাড়া দেয় না। আবার টোকা মারে, তারপর ধাক্কা, তারপর ঘুসি। তবুও কোনো উত্তর নেই। বেশ কিছুক্ষণ পরে রক্ত গরম হয়ে যায়। একটা পাথর তুলে নিয়ে দমাদম করে মারতে থাকে। সে আওয়াজে মড়াও আঁৎকে ওঠে। কিন্তু·········কিন্তু·········

আচম্বিতে ভেতরে ঘেউ-ঘেউ করে ওঠে কুকুরের দল। চোরাদরজার ছোট্ট ফোকরের ওপর থেকে ইস্পাতের ঢাকনা সরে যায়।

'কি চাই ?' স্প্যানিশ ভাষায় জিজ্ঞেস করে একটা রূঢ় কণ্ঠ।

'আমি অসুস্থ—ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে চাই। এক্ষুনি দরজা খোলো।'

'অসুস্থ মানুষ এভাবে দরজা ঠেঙায় না।' ফোকর দিয়ে উঁকি মারে একটা চোখ। 'ডাক্তার এখন রুগী দেখছেন না।'

'কখ্‌খনো না। রুগী মানুষকে না দেখে উনি থাকতেই পারেন না,' এক-গুঁয়ের মত বলে জুরিটা।

খট করে বন্ধ হয়ে যায় ফোকর। মিলিয়ে যায় পদশব্দ। শুধু বিরামহীন ভাবে খ্যাপা নেকড়ের মত চেঁচিয়ে যেতে থাকে হিংস্র কুকুরগুলো।

রাগে গস্‌গস্‌ করতে করতে স্কুনারে ফিরে আসে পেড্রো জুরিটা।

'জেলী-ফিশে' এসে জুরিটা ভাবে, বিউনো আয়ার্সে গিয়ে স্যালভেটরের বিরুদ্ধে নালিশ জানালে কেমন হয় ? কিন্তু লাভ কি ? নিষ্ফল রাগে ফুলতে থাকে স্পেন-নন্দন পেড্রো। থেকে থেকে হ্যাঁচকা টান মারতে থাকে ইয়া মোটামোটা গোঁফ জোড়ায়।

অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে আসে জুরিটার। স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করে এরপর কি করা উচিত।

ভাবতে ভাবতে আবার সাইকেলের হাণ্ডেলবারের মত গোঁফ জোড়া ফুলে ওঠে! মতলব পাওয়া গেছে।

ডেকে এসে দাঁড়ায় জুরিটা। সবাইকে চমকে দিয়ে নোঙর তুলতে আদেশ দেয়।

বিউনো আয়ার্স অভিমুখে রওনা হয় 'জেলী-ফিশ।'

## অসুস্থ নাতনী

ক্রুদ্ধ সূর্যের দাবদাহে ধরণী তপ্ত। ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে একজন বুড়ো রেড ইণ্ডিয়ান। রোগা হাড় জির জিরে চেহারা। পরনে ছেঁড়া ন্যাকড়ার

মত পোশাক। মেঠো পথের ধুলায় ধূসরিত তার সব অঙ্গ। এঁকে বেঁকে পথ চলেছে তো চলেছেই··· ··গম, ভুট্টা, আর ওট-এর ক্ষেতের মধ্যে বিরাম নেই সেই পথের।

বুড়োর দুহাতে শোয়ানো একটা শিশু। ছেঁড়াখোঁড়া একটা কম্বল দিয়ে কোন রকমে সূর্যের প্রচণ্ড তাপ থেকে শিশুকে আড়াল করবার চেষ্টা করছে বৃদ্ধ। কম্বলের অবস্থা বৃদ্ধের পোশাকের চাইতেও শোচনীয়।

শিশুর চোখ আধ বোঁজা। ঘাড়ের ওপর একটা বিরাট টিউমার। পথ চলতে চলতে যতবার হোঁচট খাচ্ছে বৃদ্ধ, ততবারই গুঙিয়ে উঠছে কোলের শিশু। করুণ কাতর গোঙানি। সেই সঙ্গে থিরথির করে কেঁপে উঠছে চোখের পাতা। দাঁড়িয়ে পড়ছে বৃদ্ধ। আলতো করে ফুঁ দিচ্ছে মুখে ঘাড়ে টিউমারে—যাতে বেদনা খানিকটা প্রশমিত হয়।

আর ফিসফিস করে বলছে—'একবার যদি জ্যান্ত অবস্থায় একে পেঁছে দিতে পারি ওখানে, তাহলেই—' বলে আবার পা বাড়াচ্ছে।

ইস্পাতের ফটকের সামনে এসে বাঁ হাতের ওপর শিশুকে রাখল বুড়ো। তারপর ডান হাত দিয়ে থেমে থেমে চারবার টোকা দিল ফটকে।

খট করে সরে গেল ফোকরের ইস্পাত-ঢাকনি। উঁকি দিল একটা চোখ। পরমুহূর্তেই কড়-কড়-কড়াৎ করে সরে গেল ছিটকিনি, ঘড়-ঘড় করে খুলে গেল ইস্পাতের পাল্লা।

ভয়ে ভয়ে ভেতরে পা দিল বুড়ো। সামনেই দাঁড়িয়ে একজন বৃদ্ধ নিগ্রো। পরনে বকের পালকের মত ধবধবে সাদা কোর্তা। তুষার-ধবল একমাথা চুল।

শিশু কোলে প্রথম বৃদ্ধ বললে—'খুকী মরতে বসেছে।' ঈষৎ মাথা হেলালে দ্বিতীয় বৃদ্ধ। ফটকের ছিটকিনি টেনে দিলে। তারপর ইঙ্গিতে প্রথম বৃদ্ধকে পাছু নিতে বললে।

যেতে যেতে চার পাশে চোখ বুলিয়ে নিলে দূরাগত বৃদ্ধ। জেলখানার উঠোনের মত একটা উঠোন। পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে পাথর দিয়ে বাঁধানো। কোথাও এতটুকু ঘাসের ডগাও দেখা যাচ্ছে না। বাইরের বেজায় উঁচু পাঁচিলটাই সব নয়, ভেতরে আরও একটা পাঁচিল ঘেরা অঞ্চল। তবে তা বাইরের পাঁচিলের মত অত উঁচু নয়।

ভেতরের দেওয়ালের প্রবেশ পথের সামনেই সাদা চুণকাম করা একটা বাড়ী। বড় বড় জানালা। বাড়ীর কাছে পাথরের ওপর বসে একদল রেড ইণ্ডিয়ান। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে—সবাই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে সাদা বাড়ীর দিকে।

কিছু কিছু খোকাখুকু শাঁখ আর শামুক নিয়ে খেলা করছে। কেউ কেউ কোস্তাকুস্তি করছে। কিন্তু একদম গোলমাল নেই। নিগ্রোদের তদারকে শান্তিভবনের শান্তি এতটুকুও ব্যাহত হবার জো নেই।

বাড়ীর ছায়ায় বসে পড়লো বৃদ্ধ রেড-ইণ্ডিয়ান। মৃদু মৃদু ফুঁ দিয়ে

জড়িয়ে দিতে লাগল মরণাপন্ন খুকুর ব্যথা বেদনা। বাচ্ছার নীলচে আড়ষ্ট মুখ দেখে পাশে এসে বসে একজন বুড়ী রেড-ইণ্ডিয়ান।

'মেয়ে নাকি?'

'না। নাতনী।'

'দুঁকের পেঁচোয় পেয়েছে দেখছি। কিছু ভেবো না। পেঁচোও ওঁকে ভয় পায়। বাপ-বাপ করে এখুনি পালাবে পেঁচোর চোদ্দ পুরুষ।'

মাথা হেলিয়ে সায় দিল বৃদ্ধ।

রুগীদের খবরাখবর নিচ্ছিল সাদা কোর্তা পরা নিগ্রো। এবার সে এসে দাঁড়াল বৃদ্ধের সামনে—ডেকে নিয়ে গেল ভেতরে।

মস্ত একটা ঘরে এসে দাঁড়াল বৃদ্ধ। আসবাবহীন ন্যাড়া ঘর। পাথর বাঁধানো মেঝে। ঠিক মাঝখানে একটা পেল্লায় টেবিল। সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা।

ঘষা কাঁচের পাল্লা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন ডক্টর স্যালভেটর। মাথায় বিলক্ষণ লম্বা, চওড়া কাঁধ, রোদে পোড়া তামাটে রঙ। পরনে সাদা কোর্তা। চোখের পাতা কালো, ভুরু কালো। এ ছাড়া মুখমণ্ডলে চুলের আর লেশমাত্র নেই। পরিস্কার কামানো মাথা। মুখের মতই মাথার রোদে পোড়া তামাটে রঙ দেখে বোঝা যায়, দীর্ঘদিন ধরেই মাথা কামিয়ে আসছেন তিনি। বাজপাখীর মত তীক্ষ্ন বক্র নাক, ঠেলে বেরিয়ে আসা দৃঢ় চিবুক, দৃঢ় সংবদ্ধ অধরোষ্ঠ, সব মিলিয়ে মুখচ্ছবি নিষ্ঠুর—অনেকটা লুঠেরা বোম্বেটেদের মত। বাদামী চোখের স্থির অচঞ্চল নিরুত্তাপ দৃষ্টির সামনে অকারণেই শিউরে ওঠে বুড়ো রেড-ইণ্ডিয়ান।

ঈষৎ মাথা হেলিয়ে অভিবাদন জানিয়ে কোলের বাচ্ছাকে ডাক্তারের দিকে বাড়িয়ে দিলে বুড়ো। চটপটে কিন্তু সতর্ক হাতে শিশুকে নিজের হাতে তুলে নিলেন ডক্টর। শতছিন্ন কম্বলটা আলগোছে খুলে নিয়ে কোণে রাখা পাত্রে তালগোল পাকিয়ে ফেলে দিলেন। বৃদ্ধ সেদিকে এগোতেই বললেন কঠিন কণ্ঠে —'ওখানেই থাক ওটা।'

বলে, মড়ার মত আড়ষ্ট শিশুকে আলতো করে শুইয়ে দিলেন টেবিলে। ঝুঁকে পড়লেন নীলচে মুখের ওপর। বৃদ্ধের মনে হল, যেন আক্রমণ হানার পূর্ব-মুহূর্তে শিকারকে দেখে নিচ্ছে শ্যেনপক্ষী। পরক্ষণেই লম্বা লম্বা আঙুল বুলিয়ে দেখতে লাগলেন টিউমারের অবস্থা। এ দৃশ্যও বৃদ্ধের কল্পনায় নতুন দৃশ্য ফুটিয়ে তুলল। আঙুল তো নয়, যেন কিলবিলে সরীসৃপ। ডাইনে বাঁয়ে ওপরে নিচে সর্বদিকেই সমানভাবে বেঁকে যাওয়ার মত আশ্চর্য ক্ষমতাসম্পন্ন আঙুল। কনকনে স্রোত বয়ে যেতে থাকে ভয়ার্ত রেড-ইণ্ডিয়ানের শিরদাঁড়া বেয়ে।

'চমৎকার! খুবই চমৎকার!' এমনভাবে বললেন ডক্টর স্যালভেটর যেন বীভৎস টিউমার দেখে বিলক্ষণ সন্তুষ্ট হয়েছেন তিনি। পরীক্ষাশেষে বুড়োর দিকে ফিরে বললেন—'একমাস পরে আবার আসবে। যে রাতে পূর্ণিমা, সেইদিন সকালে এসে নিয়ে যেও খুকীকে। সব অসুখ সেরে যাবে, কিচ্ছু ভেবো

না।'

বলে, দুহাতে মেয়েটিকে নিয়ে ঘষা কাঁচের পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেলেন ডক্টর।

ইতিমধ্যে পরবর্তী রুগীকে নিয়ে এসেছে সাদাচুলো নিগ্রো। সেই বুড়ি—গোদের মত ফুলে উঠেছে তার পা।

ঘষা কাঁচের অন্তরালে ডক্টরের উদ্দেশ্যে ছোট্ট অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে আসে বুড়ো রেড-ইণ্ডিয়ান।

... ... ..

ঠিক আটাশ দিন পরে আবার খুলে গেল সেই ঘষা কাঁচের পাল্লা। হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল ছোট্ট একটি মেয়ে। পরনে নতুন পোশাক। আপেলের মত রক্তরাঙা গাল। আনন্দোজ্জ্বল মুখ। বুড়ো রেড-ইণ্ডিয়ানকে দেখেই যেন একটু ভয় পেয়ে গেল সে। দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে কোলে তুলে নিলে বুড়ো। সশব্দে চুমু খেয়ে ঘাড় পরীক্ষা করতেই অবাক হয়ে গেল। টিউমার উধাও। শুধু একটা ছোট্ট লালচে কাটা দাগ······অপারেশনের চিহ্ন।

দাদুকে দুহাতে ঠেলে দিতে থাকে নাতনী। কিছুতেই কোলে উঠবে না। চুমু খাওয়ার সময়ে দাড়ির ঘষা খেয়ে একবার তো কেঁদেই উঠল। কান্নাকাটির চোটে কোল থেকে নামিয়ে না দিয়ে পারল না বুড়ো দাদু। স্যালভেটর বেরিয়ে এলেন। স্মিতমুখে খুকীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—'এ যাত্রা বেঁচে গেল তোমার নাতনী। আর দু একঘণ্টা দেরীতে এলে আমিও হার মানতাম।'

থর-থর করে কেঁপে উঠল বৃদ্ধের ঠোঁট। ছলছল চোখে নাতনীকে আর একবার চুমু খেয়ে নতজানু হয়ে বসে পড়ল স্যালভেটরের সামনে।

অবরুদ্ধকণ্ঠে বললে—'আমার নাতনীর জীবন আপনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তার বদলে আমার জীবন আপনাকে আমি দিতে পারি—তাছাড়া দেওয়ার মত তো আর কিছু নেই।'

'তোমার জীবন নিয়ে আমি কি করব ?' অবাক গলায় বললেন স্যালভেটর।

'আমি বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু হাতের জোর এখনো আছে। মায়ের কাছে একে ফিরিয়ে দিয়ে আমি ফিরে আসছি। আমার এ জীবন এখন আপনার—আমার যা উপকার করলেন, তার প্রতিদান। আজীবন কুকুরের মত সেবা করব আপনাকে—দোহাই আপনার, না বলবেন না।'

মাথা নিচু করে ভাবতে লাগলেন স্যালভেটর।

নতুন চাকর-বাকর নেওয়ার পক্ষপাতী নন ডক্টর। তার মানে এই নয় যে লোকের দরকার নেই। কাজের কি আর শেষ আছে ? বাগানে জিমের কাজে হাত লাগানোর জন্যে লোক দরকার। সত্যিই, একটা অন্তত লোক চাই। নিগ্রো হলেই ভালো হত···তবে এ বুড়োকেও তেমন গোলমেলে তো মনে হচ্ছে না···

'তোমার জীবনটাই আমাকে উপহার দিলে! বেশ, আমি গ্রহণ করলাম, কখন আসছো ?'

'দিন পনেরোর মধ্যেই,' স্যালভেটরের কোর্তা চুম্বন করে বললে বৃদ্ধ।

'কি নাম তোমার ?'

'ক্রিষ্টোবাল। ডাক নাম ক্রিষ্টো।'

'ঘুরে এসো, ক্রিষ্টো। আমি অপেক্ষায় রইলাম।'

'এসো, মা, কোলে এসো।' বলে খুকুকে আবার কোলে তুলে নিলে দাদু। আবার কেঁদে ওঠে নাতনী। তাড়াতাড়ি চৌকাঠ পেরিয়ে যায় ক্রিষ্টো।

## বাগানভরা অলৌকিক কাণ্ড

এক সপ্তাহ পরেই ফিরে এল ক্রিষ্টো। আপাদমস্তক তীক্ষ্ন দৃষ্টি বুলিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন ডক্টর স্যালভেটর।

বললেন—'ক্রিষ্টো, এবার যা বলি শোন। আজ থেকে তুমি কাজে বহাল হলে। ভাল মাইনে পাবে, ভাল খাবার পাবে—'

হাত নাড়তে নাড়তে ক্রিষ্টো বললে—'আমি কিছ্ছু চাই না। শুধু আপনার সেবা করতে চাই।'

'চুপ করো।' এক ধমকে থামিয়ে দিয়ে বললেন ডক্টর, 'যা যা বললাম, সব পাবে। কিন্তু একটি সর্ত, একদম বোবা হয়ে থাকবে। এখানে যা দেখবে, তা কাকপক্ষীও যেন জানতে না পারে।'

'আমি বরং আমার জিভটা কেটে কুত্তা দিয়ে খাইয়ে দেব—জন্মের মত বোবা হয়ে থাকতে পারব।'

'ওসব করতে যেও না,' সাবধান করে দেন ডক্টর।

অঙ্গুলি সংকেতে সাদাচুলো নিগ্রো কাছে এসে দাঁড়ায়। ক্রিষ্টোকে বাগানের ভিতরে জিমের কাছে নিয়ে যেতে আদেশ দেন স্যালভেটর।

নিঃশব্দে মাথা কাৎ করে সম্মতি জানায় নিগ্রো সহচর। ক্রিষ্টোকে নিয়ে পাথর বাঁধানো উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে যায় ভেতরের দেওয়ালে গাঁথা লোহার ফটকের সামনে। টোকা মারতেই পাঁচিলের ওপার থেকে ভেসে আসে কুকুরের ঘেউ-ঘেউ চীৎকার। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে ওঠে ফটকের কব্জা—খুলে যায় আস্তে আস্তে।

ঠেলা দিয়ে ক্রিষ্টোকে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয় সাদা-চুলো নিগ্রো। তারপর নিচু গলায় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নিগ্রোকে কি বলে চলে যায় নিজের কাজে।

ভয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ক্রিষ্টো। অদ্ভুতদর্শন একপাল জানোয়ার তেড়ে আসছে তার দিকে। সলোম চামড়া। হলদে রঙ। ছোপ ছোপ কালো ফুটকি। ঘাসগুল্ম ঢাকা প্রান্তরে এ পশু দেখলে তাদের জাগুয়ারই বলত ক্রিষ্টো। কিন্তু এরা চেঁচাচ্ছে কুকুরের মতো।

হেঁয়ালী নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ছিল না। সবচেয়ে কাছের গাছ লক্ষ্য করে দৌড়ে গিয়ে তড়বড় করে ওপরে উঠে যায় ব্রিণ্টো। এতখানি বয়সে এরকম ক্ষিপ্রতা রীতিমতো বিস্ময়কর।

ক্রুদ্ধ কেউটের মতই মুখ দিয়ে হিস্ হিস্ শব্দ করতে থাকে নিচের নিগ্রো। হিসহিসানি শুনেই আচমকা স্তব্ধ হয়ে যায় বজ্রনির্ঘোষের মত গজরানি। তৎক্ষণাৎ মাটির ওপর শুয়ে পড়ে জানোয়ারগুলো। সামনের পা মুড়ে থাবার ওপর চোয়াল রেখে জ্বল জ্বল করে তাকিয়ে থাকে মনিবের দিকে।

আবার হিস্ হিস্ করে ওঠে কৃষ্ণকায় দৈত্য। এবার ব্রিণ্টোর দিকে—ইঙ্গিতে নেমে আসতে বলে নিচে।

'সাপের মত ওরকম হিস্ হিস্ করছ কেন বলো তো? জিভটা গিলে বসে আছো নাকি?'

উত্তরে, শুধু একটা সরোষ জড়িত ধ্বনি বেরিয়ে আসে নিগ্রোর কণ্ঠ থেকে।

নিশ্চয় বোবা, স্যালভেটরের হুঁশিয়ারি মনে পড়ে যায় ক্রিণ্টোর। কথা ফাঁস করে দেওয়ার জন্য সত্যি সত্যিই কি ডক্টর জিভ কেটে নেন? নিশ্চয় নেন। এ বেচারীও তাদেরই একজন। আচম্বিতে নিঃসীম আতংকে অবশ হয়ে আসে ক্রিণ্টোর সর্ব অংগ। দেওয়ালের ওদিকে থাকলে ভাল হত। একি ভুল সে করল? তাড়াতাড়ি চোখ তুলে দেখলে গাছ থেকে দেওয়াল কতখানি। এদিকে পায়ের তলায় এসে দাঁড়িয়েছে যমদূতের মত সেই নিগ্রো। অধীরভাবে পা ধরে হ্যাঁচকা টানও দিয়েছে। ইঙ্গিত খুবই স্পষ্ট। নিচে নামতে হবে। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল ক্রিণ্টো। একগাল হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে—

'জিম?'

মাথা হেলিয়ে সায় দিল নিগ্রো দৈত্য।

'বোবা?'

কোনো উত্তর নেই।

'জিভ নেই?'

তবুও কোনো উত্তর নেই।

জিভ নাই বা থাকল, ইঙ্গিতেও কথাবার্তা চালানো যাবে—ভাবে ক্রিণ্টো। তার আগেই ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় নিগ্রো। অদ্ভুত জানোয়ারের দিকে ফিরে হিস্ হিস্ করতে করতেই উঠে আসে তারা। ঘুরে ঘুরে শুঁকে শুঁকে পরীক্ষা করে ক্রিণ্টোকে। তারপর ধীর পদক্ষেপে চলে যায় অন্যত্র।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচে ক্রিণ্টো।

পাথরের চাকতি দিয়ে বাঁধানো উঠোনের পরেই ফল আর ফুলের বাগান দেখে মনটা নেচে ওঠে। বাগান তো নয় যেন নন্দন কানন। অজস্র বর্ণ আর সৌরভের অপরূপ স্বর্গ। পূর্বদিকে ধীরে ধীরে নেমে গেছে বাহারি গাছের সারি—সেই সমুদ্র-তীর পর্যন্ত। মধ্যে মধ্যে সংকীর্ণ পথে শামুক গুগলি ঝিনুকের সূক্ষ্ম

গুঁড়ো ছাড়ানো···লালাভ গুঁড়োয় মানিয়েছে ভাল। দুপাশে সারি সারি কিম্ভূত-কিমাকার ক্যাকটাস, শাঁশালো নীলচে-সবুজ রঙের অ্যাগ্রেভ; পীচ অলিভকুঞ্জের মধ্যে মধ্যে হলদে-সবুজাভ ফুলের রুচি-সুন্দর যতি। তাজা ঘাসে ছায়া পড়েছে ঝোপ ঝাড়ের। গাঢ় সবুজ ঘাসের গালিচার মাঝে মাঝে কাশ্মিরী-নক্সার মত সাদা পাথর বাঁধানো ছোট ছোট জলাশয় আর ঝকঝকে বহুরঙা ফুলের নিকুঞ্জ। শূন্যে ঠেলে উঠেছে কয়েকটা ফোয়ারা······বাষ্পকণায় রোদ্দুর প্রতিসরণের ফলে রামধনুর কারুকাজ···বাতাস শীতল, স্নিগ্ধ।

পাখীর গানে আর পশুর হুহুংকারে সরগরম গোটা বাগানটা।

যেদিকে তাকায়, সেই দিকেই পশু পাখীর যে সব নমুনা চোখে পড়ল সে রকমটি জীবনে দেখেনি ক্রিষ্টো।

খর খর করে পথ দিয়ে এগিয়ে এল একটা দু'পেয়ে টিকটিকি। সূর্যের প্রখর কিরণে তার সবুজাভ কৃকলাশ-চর্ম তামাটে দেখাচ্ছে।

গাছ থেকে ঝুলছিল দু মাথাওলা একটা সাপ। দুদুটো মুখ দিয়ে একযোগে হিস্ শব্দে কিলবিলিয়ে উঠতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছিল ক্রিষ্টো কিন্তু নিগ্রো সঙ্গীর হিসহিসানি সাপের গর্জনকেও ছাপিয়ে উঠতে একদম চুপ মেরে গেল বিচিত্র সরীসৃপ। শুধু তাই নয়, ঝপ করে—ডাল থেকে মাটিতে নেমে নিমেষে উধাও হয়ে গেল পাশের ঝোপে। রাস্তার ওপর রোদ পোহাচ্ছিল আরো একটা সাপ। তাড়াতাড়ি এক জোড়া পা চালিয়ে পাঁই পাঁই করে উধাও হল চোখের আড়ালে। এক টুকরো ঘেরা জমিতে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে পায়চারী করছিল একটা শুওর। ক্রিষ্টোকে দেখেই একটি মাত্র বিশাল চোখে মেলে তাকিয়ে রইল তার পানে।

তারপরেই চোখে পড়ল একজোড়া সাদা ইঁদুর। গায়ে গায়ে জোড়া। খস্ খস করে লালাভ পথ বেয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ক্রিষ্টো! একী সর্বনেশে কাণ্ড! ইঁদুর তো নয় ঠিক যেন একটা কল্পনাতীত দানো—যার জোড়া মাথা আর আট-পায়ে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতা। ছুটতে ছুটতেই লড়াই লাগছে যমজের মধ্যে প্রত্যেকই চাইছে অন্যদিকে যেতে—কিচমিচ করে জানাচ্ছে অসন্তোষ। কিন্তু প্রতিবারে জিতে যাচ্ছে ডানদিকের ইঁদুরটা। রাস্তার ধারে ঘাস খাচ্ছে—আরও একটা শ্যামদেশের যমজ···একজোড়া ভারী সুন্দর ভেড়া। যমজ-ইদুঁরের মত মোটেই খিটিমিটি নেই দুজনের মধ্যে। একসঙ্গে ঘোরা ফেরায় দুইজনেই দিব্যি খুশি।

কিন্তু এরপরেই যে পশু দৈত্য চোখে পড়ল তা দেখে ঢিপ ঢিপ করে ওঠে ক্রিষ্টোর বুক। গোলাপী রঙের মস্ত একটা কুকুর। গায়ে লোমের বালাই নেই। কিন্তু মাথার জায়গায় বসানো একটা ছোট্ট বাঁদর।

ক্রিষ্টোকে দেখেই ল্যাজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল। বিচিত্র সেই বাঁদর-কুকুর। আর সামনে এদিক-ওদিক মাথা নেড়ে ক্রিষ্টোকে মুখ ভেংচে কুকুরের পিঠ চাপড়াতে লাগল ছোট্ট বাঁদরটা। প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একদলা

চিনি বার করে বাঁদরটাকে দিতে যাচ্ছে ক্রিস্টো, এমন সময়ে পেছন থেকে কে হাত চেপে ধরল। বিস্তুতেদের রাজ্যে এসে জিম-এর কথা একদম ভুলে মেরে দিয়েছিল ক্রিস্টো। ইসারা করে জিম জানিয়ে দিলে এখানে বাঁদর খাওয়ানো নিষিদ্ধ ব্যাপার। সেই ফাঁকে শুকপাখীর মাথা বসানো একটা চড়ুই সাঁই করে ছোঁ মেরে চিনির ডেলাটা নিয়ে উধাও হল পাতার ফাঁকে। অনেক দূরে মাঠের মাঝ থেকে শোনা গেল গরুর মাথাওলা একটা ঘোড়ার হাম্বারব।

মাঠের ওপর দিয়ে তীর বেগে ছুটে গেল একজোড়া পেরুদেশের মেষ—ছোটার বেগে উড়তে লাগল ঘোড়ার ল্যাজ। চারদিক থেকে আরও কত বিকট প্রাণী ঘিরে ধরল ক্রিস্টোকেঃ মিউ-মিউ করে এল বেড়ালমুখো কুকুর, হাঁসের মত পাতা-পা ফেলে দুলতে দুলতে ছুটে এল মোরগ, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে পাশ দিয়ে উধাও হল শিংওলা বরাহ, ঈগল পাখীর চঞ্চুবসানো অস্ট্রিচ, পুমার দেহ নিয়ে ভেড়া।

ক্রিস্টো ভাবলে নিশ্চয় দুঃস্বপ্ন দেখছে সে। চোখ রগড়ে নিয়ে মাথায় খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢালল, কিন্তু ফল হল না কিছুই। ভৌতিক চেহারা নিয়ে বীভৎস জানোয়ারগুলো ক্ষণেক্ষণে পিলে চমকে দিতে লাগল তার। পুকুরে মাথা ভেজাতে গিয়েও ভিরমি যাওয়ার উপক্রম হল। কেন না, সেখানেও দেখা গেল মাছের মুণ্ডু আর কানকো নেড়ে দিব্বি সাঁতরাচ্ছে কিলবিলে সাপ, ব্যাঙের পা-ওলা মাছ, গিরগিটির মত লম্বা শরীর নিয়ে অতিকায় কোলা ব্যাঙ।

ইষ্ট মন্ত্র জপ করতে করতে ক্রিস্টো ভাবলে কি গুখুরির কাজই করেছি পাঁচিলের এপাশে এসে—এখন প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচি।

সবশেষে বালি ছড়ানো প্রশস্ত একটা প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়াল ক্রিস্টো। ঠিক মাঝখানে সাদা মার্বেল পাথরের একটা ভিলা। মুর দেশীয় স্থাপত্য কৌশলে তৈরী ভিলা। পাম গাছের সারিতে আদ্ধেক ঢাকা পড়ে গেছে বড় বড় খিলেন আর থামগুলো। ছোট ছোট জলাধারে তামার মূর্তি। ডলফিন আকারের ফোয়ারা থেকে ফিনকি দিয়ে জল উঠে ছড়িয়ে পড়ছে আবার জলাধারের মধ্যেই—কাঁচের মত স্বচ্ছ জলে ল্যাজ নেড়ে নেড়ে খেলা করছে কত লাল-নীল সোনালীমাছ। প্রধান তোরণের ঠিক উল্টোদিকে রয়েছে একজন তরুণ—শূন্যে উত্থিত একহাত দিয়ে পেঁচালো একটা শাঁখ ধরে রয়েছে ঠোঁটের ওপর। নিশ্চয় পুরাকালের বরুণ দেবতা ট্রাইটন। ভাস্করের তারিফ না করে পারা যায় না—তামার মূর্তি বলেই মনে হয় না—যেন জীবন্ত মাছ আচমকা স্থাণু হয়ে গিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে ফোয়ারা ধারা।

ভিলার পেছনে কয়েকটা আউট হাউস। তারও পেছনে কাঁটাওলা ক্যাকটাস-জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা সাদা পাঁচিল।

আরও একটা পাঁচিল, ভাবে ক্রিস্টো।

ছোট্ট কিন্তু ঠাণ্ডা একটা ঘরে ক্রিস্টোকে নিয়ে গেল জিম। ইসারা ভাষা দিয়ে বুঝিয়ে দিলে এঘর তার।

# তৃতীয় পাঁচিল

ধীরে ধীরে এই আশ্চর্য দুনিয়ার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিল ক্রিস্টো। দুদিন যেতে না যেতেই দেখলে, যতই কিম্ভূতকিমাকার চেহারা হোক না কেন, জন্তু-জানোয়ারগুলো প্রত্যেকেই পোষমানা। অনেকের সঙ্গে দোস্তিও জমে গেল। জাগুয়ারের চামড়া মোড়া যে কুকুরের দঙ্গল দেখে প্রথমদিন আঁৎকে উঠেছিল ক্রিস্টো, তারাই আবার এমনই ন্যাওটা হয়ে পড়ল যে যখন-তখন হাত চেটে আনুগত্য জানিয়ে যেতে লাগল। লা-মা অর্থাৎ পেরুদেশের মেষগুলোও নির্ভয়ে খাবার খেয়ে গেল হাত থেকে, কাঁধের ওপর এসে বসল কাকাতুয়ার দল।

বাগান আর জানোয়ারদের দেখাশুনা করত সবশুদ্ধ বারোজন নিগ্রো। প্রত্যেকেই জিমের মত বেবাক বোবা। অন্তত ক্রিস্টো তো কাউকে কথা বলতে শোনেনি। টুঁ শব্দটি উচ্চারণ না করে প্রত্যেকেই যে-যার কাজ করে যেত। বারোজনের কাজ তদারক করত জিম। সে-ই ছিল এদের সুপারিনটেনডেন্ট। কাজ সে বুঝিয়ে দিত এবং বুঝে নিত। জিমেরই সহকারী হিসেবে নিজেকে বহাল হতে দেখে অবাক হয়ে গেল ক্রিস্টো। কাজও তেমন কিছু না। খাওয়া দাওয়া ঢালাও। সবই ভাল, অসহ্য শুধু নিগ্রোদের শব্দহীন তৎপরতা। দেখে শুনে ক্রিস্টোর বদ্ধ ধারণা জন্মে গেল যে ওরা কথা বলে না, বলতে পারে না বলে। কারণ কারুরই জিভ নেই—সবই কাটা গেছে। যতবার স্যালভেটর ডেকে পাঠিয়েছেন তাকে, ততবারই মুখ শুকিয়ে গেছে তার—এইবার বুঝি এলো তার পালা। এ ভয় অবশ্য শীগগিরই দূর হল একটা ঘটনার পর।

একদিন একটা অলিভ গাছের ছায়ায় চিৎপাত হয়ে দিব্বি নাক ডাকাচ্ছে জিম, এমন সময়ে ক্রিস্টো এসে হাজির সেখানে। জিম-এর হাঁ-করা মুখের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মেরে আস্ত জিভটা দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে ক্রিস্টো।

সারাদিন রুটিন মাফিক কাজ করতেন ডক্টর স্যালভেটর। সাতটা থেকে নটা পর্যন্ত অপারেশন। ভিলায় গিয়ে ল্যাবোরেটরীর কাজ, এখানে জন্তু-জানোয়ারের শরীর নিয়ে কাটাছেঁড়া করে বিস্তর এক্সপেরিমেণ্ট করতেন ডক্টর। এক্সপেরিমেণ্ট শেষে আবার বাগানে ফিরে যেত পশুরা। ভিলার ঘর দুয়ার সাফ সুতরো করার ভার ছিল ক্রিস্টোর ওপর। ফাঁক পেয়েই একবার ল্যাবোরেটরীতে ঢুকে পড়েছিল। সেখনকার কাণ্ডকারখানা দেখে তো তার চক্ষু চড়কগাছ হবার জোগাড়। কাঁচের জারের মধ্যে আরকে ভিজোনো হৃৎপিণ্ড আর মূত্রাশয়, ···দেহবিচ্ছিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ···আরও কত কি।

সেই থেকেই আর ল্যাবোরেটরীমুখো হয় না ক্রিস্টো। এর চাইতে বাগান অনেক ভালো। সেখানকার জানোয়াররা কিম্ভূতকিমাকার হলে কি হবে, জীবন্ত তো!

ক্রিস্টোর ওপর আস্থা ছিল ডক্টরের—কিন্তু তা সত্ত্বেও তৃতীয় দেওয়ালের

ওদিকে যাওয়ার অনুমতি মেলেনি, অথচ ওপারের রহস্যময় জগৎ যেন চুম্বকের মত টানতো ক্রিণ্টোকে। একবার ভরদুপুরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সেই সুযোগে পাঁচিলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। কানে ভেসে এসেছিল খোকাখুকুদের কচি গলা। রেড-ইণ্ডিয়ান ভাষা জানত বলে ক্রিণ্টোর বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কিন্তু এই ভাষারই ফাঁকে ফাঁকে শোনা গেছিল আরও কতকগুলো কণ্ঠ। সরু ক্যানকেনে গলা। ভাষাটা রেড-ইণ্ডিয়ানদের বলেই মনে হয়েছে, কিন্তু তেমন পরিষ্কার বুঝতে পারেনি। মনে হয়েছে, যেন দুই ভাষায় রীতিমত কথার লড়াই চলেছে।

বাগানের মধ্যে একদিন ক্রিণ্টোর সামনে এসে দাঁড়ালেন ডক্টর স্যালভেটর। সেজো চোখে-চোখে তাকিয়ে বললেন ঃ

'মাস খানেক হল, আমার এখানে রয়েছ, ক্রিণ্টো। তোমার কাজ আমার পছন্দ হয়েছে। নিচের বাগানে একজন চাকর অসুস্থ। তুমি তার কাজ করবে এখন থেকে। তবে মনে রেখো প্রথমদিন কি বলেছিলাম। জিভ হারানোর ইচ্ছে নিশ্চয় তোমার নেই।'

'আপনার বোবা নিগ্রোদের সঙ্গে থাকতে গিয়ে জিভের ব্যবহারই ভুলে বসেছি,' তক্ষুণি জবাব দিয়েছে ক্রিণ্টো।

'চমৎকার! বোবা থাকলে পুরস্কার মিলবে। যাই হোক অ্যাণ্দিজে কি করে যেতে হয় জানো?'

'পাহাড়েই আমার জন্ম। পাহাড়েই আমি মানুষ।'

'উত্তম। নতুন কিছু পাখী আর জানোয়ার আমার এই চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসতে চাই। আমার সঙ্গে তুমি যাবে। এখন যেতে পারো। নিচের বাগানে জিম নিয়ে যাবে তোমাকে।'

এ বাগানের বিস্ময় অনেকটা গা-সওয়া হয়ে এসেছিল, কিন্তু এবার যে বিস্ময়ের দুয়ার খুলে গেল সামনে, তার জন্য প্রস্তুত ছিল না ক্রিণ্টো।

রৌদ্রালোকিত প্রশস্ত সবুজ মাঠে খেলা করছে একদল শিশু। নগ্ন, কিন্তু স্বাস্থ্যদীপ্ত। খেলা করছে বাঁদরদের সঙ্গে।

তিন থেকে বারো বছর তাদের বয়স। আর্জেণ্টাইন তাদের মাতৃভূমি। প্রত্যেকেই স্যালভেটরের রুগী। কারো কারো কঠিন অপারেশন হয়েছে। সেরে না ওঠা পর্যন্ত বাগানে খেলা করবে তারা। তারপর একে একে ফিরে যাবে বাপ-মার কাছে। তাজ্জব চেহারা বাঁদরগুলোর, ল্যাজ নেই, সারা গায়ে একগোছা লোমের চিহ্নমাত্র নেই কিন্তু তার চাইতেও তাজ্জব ব্যাপার হচ্ছে মানুষের মতই কথা বলছে বাঁদর-শিশুরা। প্রত্যেকেই একটা না একটা রেড-ইণ্ডিয়ান ভাষা জানে। সরু ক্যানক্যানে গলায় চেঁচিয়ে ঝগড়া করছে তারা মানুষ শিশুদের সঙ্গে। কিন্তু দিব্বি ভাব জমে গেছে মানুষে-বাঁদরে।

ছানাবড়ার মত এই অসম্ভব দৃশ্য দেখতে দেখতে ক্রিণ্টো ভাবলে, স্বপ্ন দেখছে

না তো ? না, মানুষকেই বাঁদর বলে ভ্রম হচ্ছে ?

নিচের বাগানটা অবশ্য ওপরের বাগানের চাইতে ছোট। ঢালু হয়ে নেমে গেছে সমুদ্রের দিকে। বাগান যেখানে শেষ, সেখানে দেওয়ালের মত খাড়া উঠে গেছে পাহাড়। তার ওদিকে গজরাচ্ছে অদৃশ্য সমুদ্র।

খাড়া পাহাড়ের কাছে গিয়ে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছিল ক্রিস্টোর, পাহাড় বটে, কিন্তু মানুষের গড়া পাহাড়। আসলে আর একটা পাঁচিল। চতুর্থ পাঁচিল, পাঁচিলের গায়ে লোহার দরজা। পাথরের রঙে রঙ মিলিয়ে ধূসর রঙ মাখানো দরজায়। শুধু তাই নয়, উইস্টেরিয়ার ঘন ঝোপের আড়ালে প্রায়-অদৃশ্য।

কানখাড়া করে সমুদ্রের অশান্ত গর্জন ছাড়া কানে আর কিছুই ভেসে আসেনি। ছোট দরজাটা তাহলে কিসের পথ আগলে রয়েছে ? বালুকাবেলার ?

আচম্বিতে পেছন থেকে হৈ-হৈ করে উঠেছিল মানুষ-শিশু আর বাঁদর-শিশুরা। চমকে উঠেছিল ক্রিস্টো। বোঁ করে পেছন ফিরতেই চোখে পড়েছিল, সবারই দৃষ্টি আকাশের দিকে। চোখ তুলতেই দেখা গেছিল একটা ছোট্ট লাল বেলুন। হেলতে দুলতে আকাশে উঠে বাগানের ওপর দিয়ে হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে।

ছেলেভুলোনো পুঁচকে একটা বেলুন। কিন্তু তাই দেখেই নিদারুণ চঞ্চল হয়ে ওঠে ক্রিস্টো। অসুস্থ চাকর কাজে ফিরে আসতেই সিধে স্যালভেটরের সামনে হাজির হল ক্রিস্টো।

বলল—'অ্যান্দিজে গেলে ফিরতে বেশ দেরী হবে। তার আগে মেয়ে আর নাতনীকে একবার দেখে আসবো ?'

চাকরবাকরদের বাইরে যাওয়াটা পছন্দ করতেন না স্যালভেটর। তাই তক্ষুণি কোনো জবাব দিলেন না, ক্রিস্টোও নাছোড়বান্দার মত দাঁড়িয়ে রইল······স্যাল-ভেটরের স্থির নিরুত্তাপ চোখে চোখ রাখতেও ভয় পেল না।

অবশেষে বললেন স্যালভেটর—'প্রতিশ্রুতি মনে রেখো। তোমার জিভ কাটা যাক, তা আমি চাই না। এখন যেতে পারো। কিন্তু তিনদিনের মধ্যে ফিরে আসা চাই। দাঁড়াও !'

বলে, ভেতরের ঘরে গিয়ে একটা ছোট্ট চামড়ার থলি নিয়ে এলেন। ক্রিস্টোর হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন—'তোমার নাতনীর জন্যে, আর তোমার চুপ করে থাকার জন্যে কিছু দিলাম।'

## ঘাপটি

রেগে তিনটে হয়ে গেল জুরিটা—'এখনও যদি না আসে ও, তাহলে তোমাদের দুজনকেই দেখে নেবো আমি। দূর করে তাড়িয়ে দেব, অন্য লোক লাগাবো।' বলে অস্থির হাতে গোঁফ টানতে লাগল।

পেড্রো জুরিটার পরনে আজ শহরের সাদা পোশাক। মাথায় পানামা টুপী। সাক্ষাৎস্থল, বিউনো আয়াসের্র বাইরে, ভুট্টাক্ষেতের পাশে।

বালতাসারের পরনে সাদা জামা আর নীল ডোরাকাটা ট্রাউজার্স। রাস্তার পাশেই থেবড়ে বসে রোদে-হলুদ ভঙ্গুর ঘাস টানছিল তেতোমুখে।

আর ভাবছিল, স্যালভেটরের ডেরায় গুপ্তচরগিরি করার জন্যে ভাইকে পাঠানো খুবই ভুল হয়েছে।

বালতাসারের চাইতে দশ বছরের বড় হলে কি হবে, পাতলা চেহারায় রীতিমতো শক্তি ধরে ক্রিস্টো, ধড়িবাজিতে বুনো বেড়ালকেও হার মানায়। কিন্তু তার ওপর ভরসা করা যায় না মোটেই। নিষ্ঠার সঙ্গে কিছু করা ক্রিস্টোর কোষ্ঠিতে লেখা নেই। কিছুদিন চাষবাস করেছিল। দুদিন যেতে না যেতেই একঘেয়েমির অজুহাতে তা ছেড়ে দিলে। তারপর জাহাজ ঘাটায় মদের দোকান খুলল। কিন্তু দোকানের সব মদ নিজেই খেয়ে সাবাড় করে দেওয়ায় দোকান উঠে গেল। ইদানীং টুকটাক বেআইনী কাজকারবার করে বেশ দুপয়সা কামাচ্ছিল ক্রিস্টো। অতিরিক্ত সেয়ানাপনার জন্যে দুরূহ কাজ তার ওপর ছেড়ে দিতে দ্বিধা হয় না বটে, কিন্তু নিশ্চিন্তও হওয়া যায় না। দরকার হলে ভাইকেও কলা দেখাতে পেছপা হবে না ক্রিস্টো—বালতাসার তা জানতো বলেই জুরিটার মতই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল।

'বেলুনটা ক্রিস্টোর চোখে পড়েছে তো ?

মুখে কোন জবাব দিল না বালতাসার। এমনভাবে কাঁধ ঝাঁকালো, যাতে হ্যাঁ-ও বোঝায় না-ও বোঝায়। আসলে এসব ঝামেলা মোটেই ভালো লাগছিল না তার। এর চাইতে বাড়ী ফিরে গিয়ে এক গেলাস ঠাণ্ডা জলে খানিকটা মদ মিশিয়ে নিয়ে গিললে কাজ দিত। তারপর নিরিবিলিতে দোকানে বসে থাকার মত মেজাজী কাজ কি আর আছে ?

ঠিক এই সময়ে দূরে রাস্তার মোড়ে দেখা গেল একটা ধুলোর কুণ্ডলী। পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে পড়ল ব্যাঙের ছাতার মত ধুলোর ওপর। পরক্ষণেই শোনা গেল তীক্ষ্ম তীব্র শিসের শব্দ।

সিধে হয়ে বসল বালতাসার।

'আসছে ক্রিস্টো।'

'হুম! খুব একটা দেরীও হয়নি,' বললে জুরিটা।

লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল ক্রিস্টো। কে বলবে এ সেই বৃদ্ধ রেড-ইণ্ডিয়ান, ক'দিন আগে যে মরো-মরো নাতনীকে নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়েছিল। আরও একবার শিস্ দিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল ক্রিস্টো। তারপরেই খটাস ক'রে স্যালুট ঠুকে দিলে ভাই আর ভাইয়ের মনিবকে।

ভণিতা না করে সোজা জিজ্ঞেস করলে জুরিটা—'সমুদ্র-শয়তানকে দেখেছো ?'

'এখনো দেখিনি, তবে ওখানেই আছে সে। চার-চারটে দেওয়ালের আড়ালে

তাকে লুকিয়ে রেখেছেন স্যালভেটর। সোজা কথাটা কি জানো, স্যালভেটর আমাকে বিশ্বাস করেন। রোগা মেয়েটার জন্যেই অবশ্য তা হয়েছে,' বলে হেসে ফেলল ক্রিণ্টো, 'ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি সেদিন। নাতনিকে কোলে নিয়ে চুমু খেতে না খেতেই দাদুকে লাথিয়ে খামচে চেঁচিয়ে এমন কাণ্ড জুড়ে দিয়েছিল যে হাটে হাঁড়ি ভাঙবার জোগাড়।'

'মেয়েটাকে জোগাড় করলে কোত্থেকে ?' জানতে চায় জুরিটা।

'টাকা জোগাড় করাই শক্ত, মেয়ে জোগাড় করা মোটেই শক্ত নয়,' বললে ক্রিণ্টো। 'তাছাড়া তার মা-ও খুশী। সে পেয়েছে সুস্থ মেয়ে, আর আমি পেয়েছি পাঁচটা পিসোস্।'

স্যালভেটরের কাছ থেকে বেশ একটা মোটা টাকা তন্খা হিসেবে মিলেছে, সে কথাটা বেমালুম চেপে গেল ক্রিণ্টো। মা যখন মেয়েকেই পেয়ে গেছে, তখন আর তাকে টাকার ভাগ দিয়ে কি হবে ?

'জায়গা তো নয়, একটা আস্ত চিড়িয়াখানা—রাক্ষসখোক্কসের চিরিয়াখানা,' বলে গল্প শুরু করে দেয় ক্রিণ্টো।

'মন্দ নয়,' সব শুনবার পর একটা চুরুট ধরিয়ে বলল জুরিটা—'কিন্তু আসল মালটাই তো তুমি দেখনি। এরপর কি করবে ঠিক করেছো ?'

'অ্যান্দিজে যাবো,' স্যালভেটরের প্রোগ্রামের কথা বলল ক্রিণ্টো।

'চমৎকার ! চমৎকার ! সোল্লাসে বললে জুরিটা। 'স্যালভেটর দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেলেই বাগানে হানা দেব আমরা। গুম করব সমুদ্র-শয়তানকে। লোকালয় থেকে অনেক দূরে, কাজেই টেরও পাবে না।'

মাথা নাড়তে নাড়তে ক্রিণ্টো বললে—'উহুঁ, অমন কাজটি করতে যেও না। জাগুয়ারেরা তোমাদের মাথা চিবিয়ে ফেলবে। জাগুয়ারের হাত থেকে বাঁচলেও সমুদ্র-শয়তানকে খুঁজে পাবে না। যতক্ষণ না আমি তার হদিশ পাচ্ছি, ততক্ষণ ওসব হামলা করতে যেও না।'

একটু ভেবে নিয়ে উর্বর-মস্তিষ্ক জুরিটা বললে—'আর এক কাজ করলে হয়। ওৎ পেতে বসে থাকব আমরা। হঠাৎ হানা দিয়ে চেলাচামুণ্ডা সমেত স্যাল-ভেটরকে বন্দী করব। তারপর মুক্তিপণ চাইব—সমুদ্র-শয়তান।'

ফস করে জুরিটার বুক পকেট থেকে চুরুট তুলে নিলে ক্রিণ্টো।

বলল—'বহু ধন্যবাদ। এ প্ল্যানটা মন্দের ভালো। কিন্তু তখন রাজী হলেও স্যালভেটর পরে কলা দেখাতে পারে। স্প্যানিয়ার্ড'রা দারুণ নচ্ছার—' কাশির ধমকে বাকী কথাগুলো আর শোনা গেল না।

খেঁকিয়ে উঠে বলল জুরিটা—'তোমার মতলব-টতলব কিছু আছে ?'

'সবুরে মেওয়া ফলে। স্যালভেটর আমাকে বিশ্বাস করেন ঠিকই, কিন্তু তিনটে দেওয়াল পেরোতে দিয়েও চার নম্বর দেওয়ালের ওদিকে এখনও যেতে দেননি। এমন কিছু করতে হবে যাতে উনি নিজের ছায়ার মতই আমাকে বিশ্বাস

করতে শুরু করেন। তাহলেই নিজে থেকেই সমুদ্র-শয়তানকে দেখিয়ে দেবেন।'

'কি করতে হবে শুনি?'

'বোম্বেটেরা বন্দী করবে স্যালভেটরকে,' বলে, তর্জনী দিয়ে জুরিটার বুকে খোঁচা মারল ক্রিস্টো, 'স্যালভেটরকে উদ্ধার করবে তার একান্ত বিশ্বাসী চাকর,' এবার খোঁচা পড়ল নিজের বুকে, 'তাহলেই স্যালভেটরের বাড়ীতে কোনো রহস্যই অজানা থাকবে না।'

'মতলব খারাপ নয়।'

তারপর ঠিক হল কোন কোন রাস্তা দিয়ে স্যালভেটরকে নিয়ে যাবে ক্রিস্টো।

'যাওয়ার ঠিকঠাক হয়ে গেলে পাঁচিল টপকিয়ে একটা লাল পথর ছুঁড়ে দেব আমি,' বলে অদৃশ্য হয় ক্রিস্টো।

এত আটঘাট বেঁধেও প্ল্যান ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হল সামান্য একটা ব্যাপারে।

জনা বারো গলা কাটা খুনে গুণ্ডাকে জাহাজঘাটা থেকে ভাড়া করল জুরিটা। বন্দুক টন্দুক নিয়ে ঘোড়ায় চেপে ঘাপটি মেরে রইল রাস্তার পাশে। কুচকুচে কালো রাত। ঘোড়ার পায়ের খটখট শব্দ শোনার আশায় কান খাড়া করে রইল দস্যুদল।

আচম্বিতে শোনা গেল ইঞ্জিনের শব্দ। দূর থেকে দ্রুতবেগে কাছে এগিয়ে এল ইঞ্জিন-গর্জন। চবিতে অন্ধকার ফালা-ফালা হয়ে গেল দু'দুটো জোরালো হেডলাইটে এবং কেউ কিছু বোঝাবার আগেই ঝড়ের মত পাশ দিয়ে উধাও হয়ে গেল মিশমিশে কালো একটা মোটর গাড়ী।

স্যালভেটর যে চিরাচরিত বাহন ছেড়ে এমন আধুনিক বাহন ব্যবহার করবেন, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি ক্রিস্টো।

রাগে ফুলতে ফুলতে পাশে এসে দাঁড়াল জুরিটা। কিন্তু পরম কৌতুকে দু'-চোখ নেচে উঠল বালতাসারের।

'খামোকা মেজাজ খারাপ করবেন না। সারারাত গাড়ী চালিয়ে দিনের বেলা যখন বিশ্রাম নেবে ওরা, তখন নাগাল ধরে ফেলব,' বলে পায়ের খোঁচায় ঘোড়া চালিয়ে দেয় বালতাসার। পাছু নেয় অন্যান্য বোম্বেটেরা।

'ঐ তো ওরা। কিন্তু কিছু একটা হয়েছে মনে হচ্ছে। দাঁড়াও তো তোমরা, দেখে আসি ব্যাপারটা।'

ঘোড়া থেকে নেমে সাপের মত বুকে হেঁটে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল বালতাসার।

ফিরে এল ঘণ্টাখানেক পরে।

'গাড়ীর মেশিন বিগড়েছে। ইঞ্জিন মেরামত চলছে। ক্রিস্টো চৌকি দিচ্ছে। দেরী নয়, চটপট চলে এস, কাজটা সেরে আসি।'

তুরঙ্গ বেগে স্যালভেটরদের ঘিরে ফেলল হানাদারেরা। চমকে উঠল সবাই,

কিন্তু বাধা দেওয়ার আগেই স্যালভেটর, ক্রিষ্টো আর তিন নিগ্রোর হাত-পা বেঁধে ফেলল দস্যুদল। গাড়ী মেরামত প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল, এমন সময়ে একী বিপত্তি! সমস্ত জিনিসটা এমন তুরন্ত ঘটে গেল যে একটা বন্দুকের শব্দও শোনা গেল না, চেচাঁমেচিও না।

জুরিটা আড়ালে ছিল, বোম্বেটের একজন সর্দার সেজে স্যালভেটরের কাছে এসে মোটা অংকের টাকা দাবী করলে, বিনিময়ে মুক্তি দেওয়া হবে তাঁকে।

স্যালভেটর শুধু বললেন—'দেব।'

সর্দার দেখলে এ তো বড় জব্বর শাঁসালো পার্টি। সঙ্গে সঙ্গে হেঁকে উঠল —'এ টাকা শুধু আপনার জন্যে। ডবল টাকা দিতে হবে যদি লোকজনদেরও ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে চান।'

একটু থেমে স্যালভেটর বললেন—'অত টাকা আমার নেই।'

'তবে মরো!' একযোগে বাকী বোম্বেটেরা চেঁচিয়ে উঠল। মুখপাত্র বললে —'কাল ভোর পর্যন্ত ভাববার সময় দিচ্ছি।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্যালভেটর আবার বললেন—'অত টাকা আমার নেই।'

এমন ধীর স্থির শান্তভাবে বললেন যে, থমকে গেল ডাকাত দল।

ধরাধরি করে স্যালভেটর আর তার লোকজনদের সরিয়ে রাখা হল একপাশে। তারপর গাড়ী লুঠ করে প্রচুর মদ পাওয়া গেল। তাই গিলে অচিরেই গড়াগড়া হল ডাকাতেরা।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই শুঁয়াপোকার মত একজন গুঁড়ি মেরে এল স্যালভেটরের পাশে।

'আমি,' ক্রিষ্টোর গলা শোনা গেল, 'অনেক কষ্টে বাঁধন খুলেছি। যে ব্যাটা ডাকাত পাহারা দিচ্ছিল, তাকেও যমের বাড়ী পাঠিয়েছি। বাকি সবাই মদে চুর-চুর—ঘুমিয়ে কাদা। চটপট আসুন।'

একে একে উঠে দাঁড়াল বন্দীরা। গাড়ীতে স্টার্ট দিলে নিগ্রো ড্রাইভার, পরমুহূর্তেই গর্জে উঠে ধেয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

পেছন থেকে ভেসে এল দস্যুদলের হট্টগোল আর রাইফেলের ধমক।

ক্রিষ্টোর হাত চেপে ধরলেন স্যালভেটর।

স্যালভেটরের অন্তর্ধানের পরেই জুরিটা জানতে পারল, সত্যি সত্যিই টাকা দিতে রাজী হয়েছিলেন স্যালভেটর। আপশোষে হাত কামড়াতে ইচ্ছে হল তার। কিছু টাকা বাগিয়ে নিয়ে তারপর সমুদ্র-শয়তানকে কিডন্যাপ করলেই তো ল্যাটা চুকে যেত। এত খরচপত্তরের খানিকটা তো উঠে আসত। চিলের ছোঁ মেরে যা আসত, তাই লাভ হত!

মেজাজ খিঁচড়ে গেল জুরিটার।

# উভচর মানুষ

ক্রিস্টো আশা করেছিল, স্যালভেটর তাকে ডেকে পাঠাবেন।

বলবেন—'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ, ক্রিস্টো। আজ থেকে তোমার আমার মধ্যে আর কোন গোপন রহস্য রইল না। এস আমার সঙ্গে। সমুদ্র-শয়তানকে দেখবে চলে।'

একেবারে এই কথা না হোক, এই ধরনের কিছু শোনার আশা করেছিল ক্রিস্টো।

কিন্তু হায় রে! স্যালভেটরের কি শেষে ছন্নমতি হল? সাহসিকতার জন্যে ক্রিস্টোকে অবশ্য পুরস্কার দিতে কসুর করলেন না স্যালভেটর। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তারপর আবার তন্ময় হয়ে গেলেন গবেষণা নিয়ে।

কাজে-কাজেই ক্রিস্টোর নিজের গবেষণা শুরু করে দিলে। চোরা-দরজা খুলতে হিমশিম খেয়ে গেল বেচারী। চাবীর ফোকর নেই, হুড়কো নেই, সুতরাং এ দরজা আদৌ খোলা যায় কিনা, এই সংশয় যখন দেখা দিয়েছে তার মনে, তখনই পাওয়া গেল দরজা খোলার হদিশ।

একদিন বোতামের মত এতটুকু একটা উঁচু জায়গা টিপে ধরতেই ধীরে ধীরে দুহাট হয়ে গেল চোরা দরজা। ঠিক যেন পাতাল ঘরের ইস্পাতের দরজা খুলে গেল। ফাঁক দিয়ে সুট করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ক্রিস্টো। সঙ্গে সঙ্গে দুলে উঠল পাল্লা—খটাং করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

চমকে উঠল ক্রিস্টো। বোতামের মত যেখানে যত উঁচু জায়গা পেলে, কিছুই টেপাটেপি করতে বাকী রাখলে না।

কিন্তু দরজা আর খুললো না।

'এ তো দেখছি কড়া ফাঁদ,' বিড়বিড় করে আপন মনেই বললে ক্রিস্টো, 'ঠিক আছে, আটকেই যখন পড়েছি, তখন এক চক্কর ঘুরে আসা যাক।'

জামবাটির মত একটা খাবলা গর্তের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল ক্রিস্টো। ঘন গাছ-গাছড়ায় ঢাকা সমস্ত অঞ্চলটা। তেমনি সপুষ্প সপত্র ঝোপ। আর চারিদিকে বেড় দিয়ে আছে মানুষের তৈরী খাড়া পাহাড়।

স্যাঁৎসেঁতে মাটিতে যে ধরনের গাছপালা জন্মায়, এখানকার গাছ-গাছড়া-গুলোও সেই জাতের। ঘন পাতার চাঁদোয়া ফুঁড়ে খুব কম সূর্যকিরণই মাটিতে পৌঁচোচ্ছে। মাটি মোটেই শুকনো নয়। অসংখ্য জলধারা স্রোতের মত বয়ে চলেছে হেথায় হোথায়। গাছপালার মধ্যে মধ্যে দেখা যাচ্ছে ফোয়ারাধারা। ফলে, বাতাসের আর্দ্রতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। মিসিসিপির নিম্নভূমি যেমন স্যাঁৎসেতে, এ জায়গাও ঠিক তেমনি। তেমনি ভিজেভিজে হাওয়া, সোঁদা সোঁদা গন্ধ।

ঠিক মাঝখানে রয়েছে একট বাড়ী। ছোট্ট কিন্তু আগাগোড়া পাথর দিয়ে

তৈরী। চ্যাটালো ছাদ। ছ্যাতলাপড়া দেওয়াল। জানলায় সবুজ পর্দা নামানো। দেখে মনে হয় না, এ বাড়ীতে কেউ থাকে।

বাগানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গেলে ক্রিষ্টো। খাড়া পাহাড়ের ওদিক থেকে ভেসে এল নুড়ির সরে যাওয়ার কড়মড় শব্দ···সমুদ্র তাহলে কাছেই। স্যালভেটরের জমির সীমা তাহলে একেবারে সমুদ্রতীর পর্যন্ত।

কৃত্রিম পাহাড়ের সামনেই একটা মস্ত চৌকো চৌবাচ্চা। চারপাশে সারি সারি গাছ। চৌবাচ্চা না বলে সুইমিং পুলই বলা উচিত। গভীরতা কমসে কম পনেরো ফুট।

ক্রিষ্টোর পায়ের শব্দে আচম্বিতে গাছের তলা থেকে বিদ্যুৎ-গতিতে বেরিয়ে এল একটা প্রাণী এবং পরমুহূর্তেই ছপাৎ করে লাফিয়ে পড়ল সুইমিং-পুলে। আর উঠল না।

ছলাৎ করে উঠল ক্রিষ্টোর বুকের রক্ত। সমস্ত জিনিসটা এমন চকিতে ঘটে গেল যে প্রাণীটাকে ভাল করে দেখবারও সুযোগ পেল না ক্রিষ্টো।

তবে কি সমুদ্র-শয়তান? এত কাঠখড় পুড়োনোর পর দেখা পাওয়া যাবে তার? পায়ে-পায়ে চৌবাচ্চার কিনারায় এগিয়ে গেল ক্রিষ্টো—উত্তাল হয়ে ওঠে অবাধ্য হৃৎপিণ্ড।

কাকচক্ষুর মত পরিষ্কার জলের মধ্যে দিয়ে তাকালো ক্রিষ্টো।

চৌবাচ্চার তলা সাদা পাথরের টালি দিয়ে বাঁধানো। মসৃণ সেই পাথরের ওপর উবু হয়ে বসে রয়েছে একটা বাঁদর। ক্রিষ্টোর দিকে অপলকে তাকিয়ে রয়েছে সে—দু'চোখে ফুটে উঠেছে কৌতূহল আর ভয়।

শুধু তাই নয়। জলের তলায় শ্বাস নিচ্ছে বাঁদরটা! মন্ত্রমুগ্ধের মত বিস্ফারিত চোখে দেখতে লাগল ক্রিষ্টো, শ্বাস প্রশ্বাসের তালে তালে তার বুকের দুপাশ উঠছে নামছে··· উঠছে আর নামছে!···

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে অট্টহাস্য করে উঠল ক্রিষ্টো, হায় কপাল! সমুদ্র-শয়তান তাহলে একটা বাঁদর। জলের মধ্যে শ্বাস নিতে পারে, এমনি একটা বাঁদর দেখেই তিল থেকে তাল বানিয়ে ফেলেছে জেলেগুলো, যত্তো সব ধাপ্পাবাজের দল।

বাঁদর দেখে ক্রিষ্টো যতখানি খুশী হল, ঠিক ততখানি নিরাশ হল। এত বর্ণনা শোনার পর কিম্ভূতকিমাকার একটা রাক্ষস দেখারই আশা করেছিল সে। তার জায়গায় কিনা নিরীহ একটা বানর! আরে ছ্যাঃ, ছ্যাঃ!

সমুদ্র-শয়তানের রহস্যভেদ তো হল, এবার পয়াকার দেবার পালা। চোরা দরজার সামনে ফিরে এল ক্রিষ্টো। দেওয়ালের পাশে লম্বা একটা গাছ বেয়ে ওপরে উঠে পড়ল। তারপর পাঁচিল টপকে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়তে না পড়তেই কানে ভেসে এল স্যালভেটরের কণ্ঠ।

'ক্রিষ্টো, কোথায় তুমি?'

তাড়াতাড়ি একটা কাঁটা-মুখ বিদা তুলে নিয়ে শুকনো ঘাস জড়ো করতে

করতে সাড়া দিল ক্রিষ্টো—'এই তো আমি।'

মসমস করে চোরা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন স্যালভেটর।

বললেন—'এসো আমার সঙ্গে। দরজা খুলতে হলে এ খানটা টিপে ধরবে,' বলে, একটু আগেই ক্রিষ্টো যেখানে টিপুনি দিয়েছে সেইখানটাই টিপে ধরলেন স্যালভেটর।

আর একটু আগে দেখালেই পারতেন, মনে মনেই বলে ক্রিষ্টো। বাগানের মধ্যে পা দিল দুজনে। ছ্যাতলা-ঢাকা বাড়ী পেরিয়ে সিধে সুইমিং পুলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো স্যালভেটর। বাঁদরটা তখনও বসেছিল জলের তলায় সাদা পাথরের ওপর। শ্বাস নিচ্ছিল সেই একই ছন্দে—প্রতিবার নিশ্বাস ফেলার সাথে-সাথে বুর-বুর করে বুদবুদ ভেসে উঠছিল জলের ওপর। অভিনব সেই বাঁদর দেখে যেন দারুণ অবাক হয়ে গেছে, এমনি ভান করল ক্রিষ্টো এবং পরক্ষণে সত্যি সত্যি অবাক হল।

কেন না, বাঁদরটার দিকে কোনো মনোযোগই দিলেন না স্যালভেটর। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এমনভাবে হাতের ভঙ্গিমা করে এগিয়ে গেলেন যেন মাছের মত শ্বাস-নেওয়া বানর নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় তাঁর নেই।

প্রায় তক্ষুণি সাঁতরে উঠে এল বাঁদরটা, হাঁচরপাঁচর করে তীরে এসে গা ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে পড়ল পাশের গাছে।

হেঁট হয়ে ঘাসের আড়ালে লুকোনো ছোট্ট একটা পাত টিপে ধরলেন স্যাল-ভেটর। নীল রঙের ধাতুর পাত। শূন্যগর্ভ কলস-নিনাদের মত একটা গুম-গুম ধ্বনি শোনা গেল—সেই সঙ্গে একটা চাপা ঝন্-ঝন্ ধাতব শব্দ।

সুইমিং পুলের মেঝে থেকে সরে গেল কয়েকটা পাথর—বেরিয়ে পড়ল ম্যানহোলের মত অনেকগুলো বড় বড় গুপ্তদ্বার। হু-হু করে চৌবাচ্চার জল নেমে গেল সেই সব ফুটো দিয়ে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে এক ফোঁটাও জল রইল না চৌবাচ্চায়। ঘটাং ঘটাং করে আবার সরে এল পাথরের মত পাটাতনগুলো। সুইমিং পুলের গায়ে কোথাও লুকোনো ছিল লোহার একটা মই। এবার তা আপনা হতেই ঘড়ঘড় করে বেরিয়ে এল গোপন কন্দর থেকে।

'এসো, ক্রিষ্টো।'

মই বেয়ে নিচে নেমে গেলেন স্যালভেটর। বিশেষ একটা টালির ওপর চাপ দিতেই চৌবাচ্চার ঠিক মাঝখানেই সরে গেল আর একটা পাটাতন। দেখা গেল, ভূগর্ভের অন্ধকারের মধ্যে নেমে গেছে সারি সারি সিঁড়ির ধাপ।

স্যালভেটরের পেছন পেছন একটা অলিন্দে এসে দাঁড়াল ক্রিষ্টো। উন্মুক্ত পাটাতনের মধ্যে দিয়ে সামান্য আলো এসে পড়েছে। কিন্তু তাতে কি পাতালের অন্ধকার পাতলা হয়? কিছুদূর যাবার পরেই নিরন্ধ্র তমিস্রায় সবকিছু গেল হারিয়ে। হাতড়ে হাতড়ে কোনমতে এগিয়ে চলল ক্রিষ্টো। ফাঁকা অলিন্দে দূর থেকে

ভেসে যেতে লাগল প্রতিধ্বনির পর প্রতিধ্বনি—দুজনের পদশব্দের প্রতিধ্বনি।

'ক্রিস্টো, আমরা এসে গেছি।'

দাঁড়িয়ে গিয়ে দেওয়ালের ওপর হাত বোলাতে লাগলেন স্যালভেটর। একটা ক্লিক শব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে আলোর বন্যায় ভেসে গেল পাতালপুরী।

মস্ত একটা গুহার মধ্যে দাঁড়িয়ে দুজনে। গুহার ছাদ থেকে চূণের জল চুঁয়ে পড়তে পড়তে জমে গেছে। অসংখ্য প্রাকৃতিক ঝাড়ের মত তা শোভা পাচ্ছে মাথার ওপর।

সামনেই একটা পেতলের দরজা। দরজার ওপর সিংহের মুণ্ড। পশুরাজের চোয়ালের ফাঁক দিয়ে ঝুলছে কতগুলো পেতলের আংটা, একটা আংটা ধরে টান মারলেন স্যালভেটর। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে খুলে গেল ভারী মজবুত দরজাটা। চৌকাঠ পেরিয়ে আঁধার ভরা বিশাল হলঘরে এসে দাঁড়ালো ক্রিস্টো।

শোনা গেল আরো একটা ক্লিক শব্দ, জ্বলে উঠল একটা অতিকায় আলোর ফানুস। অস্বচ্ছ ফানুসের মোমের মত নরম আলোয় দেখা গেল একটা মস্ত গুহা। পাতাল গুহার দূরের দেওয়ালটা আগাগোড়া কাঁচ দিয়ে তৈরী। একখানা মাত্র বিশাল কাঁচ নেমে এসেছে গুহার ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত।

খটখট করে কয়েকটা সুইচ টিপলেন স্যালভেটর। আবার অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল গুহা আর কয়েকটা বড় বড় জোরালো সার্চলাইটের প্রখর আলো গিয়ে পড়ল কাঁচের দেওয়ালের ওপর।

কাঁচের দেওয়ালের ওপাশে ছড়িয়ে গেল আলোর স্রোত। দেখা গেল এক বিচিত্র অকল্পনীয় অ্যাকুয়ারিয়াম। প্রকাণ্ড মৎস্যাধার—এত বড় যে কল্পনাতেও আনা যায় না। সমুদ্র-গুল্ম আর প্রবালের মধ্যে দিয়ে লুকোচুরি খেলছে কতশত বাহারি মাছ। এদেরই মধ্যে আচম্বিতে চোখে পড়ল মানুষের মত একটা প্রাণী। ফানুসের মত বড় বড় বর্তুলাকার চোখ, ব্যাঙের, মত হাত-পা। একটা ঘন সমুদ্র-গুল্মের আড়াল থেকে দিব্বি হেঁটে বেরিয়ে এল আশ্চর্য সেই জীব। তারপর, সহজ স্বচ্ছন্দ কিন্তু অপূর্ব সুন্দর ভঙ্গিমায় সাঁতার কেটে ভেসে এল কাঁচের দেওয়ালের সামনে, সার্চলাইটের আলোয় দপ-দপ করতে লাগল অস্বাভাবিক দুই চোখ, আগুনের মত জ্বলতে লাগল নীলচে-রুপোলী আঁশ। মাথা হেলিয়ে স্যালভেটরকে অভিবাদন করল প্রাণীটা, দেওয়ালের গায়ে লাগানো আগাগোড়া কাঁচে তৈরী একটা খুপরীর মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। খুপরির, দরজা বন্ধ করতেই হু-হু করে জলশূন্য হয়ে যেতে লাগল কাঁচের ঘরটা। কয়েক মিনিটের মধ্যেই জল একদম বেরিয়ে যেতেই কাঁচের দেওয়ালের কাঁচের দরজা খুলে গুহার মধ্যে নেমে এল সে।

'দস্তানা আর গগ্‌লস্‌ খুলে ফ্যালো,' বললেন স্যালভেটর।

একান্ত অনুগতের মত হুকুম তামিল করল জলচর আগন্তুক।

ক্রিস্টোর বিস্ময় বিস্ফারিত চোখের সামনে স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে সুদর্শন এক তরুণ। ছিপছিপে একহারা চেহারা। সারা অঙ্গে সতেজ লাবণ্য।

'ইকথিয়ানডার এর নাম, লোকে যাকে সমুদ্র-শয়তান বলেই জানে,' ক্রিস্টোর সাথে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন স্যালভেটর।

অমায়িক হেসে ক্রিস্টোর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে পরিষ্কার স্প্যানিশ ভাষায় বললে আগন্তুক তরুণ—'হ্যালো!'

যন্ত্রচালিতের মত ক্রিস্টোও কোনমতে হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দন সেরে নিলে। জীবনে এরকম অবাক সে কখনও হয়নি। বিস্ময়াবিষ্ট জিভটাও বুঝি অসাড় হয়ে গেছে।

'ইকথিয়ানডারের দেখাশুনা করে একজন নিগ্রো। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে। আপাতত তার কাজের ভার তোমার ওপর দিলাম। কাজ দেখিয়ে যদি খুশী করতে পার, তাহলে বরাবরের মত এ দায়িত্ব তোমাকেই দেব,' বললেন স্যালভেটর।

নীরবে ঘাড় কাৎ করে সায় দিল ক্রিস্টো।

## ইক্‌থিয়ানডারের সঙ্গে একটি দিন

রাত তখনো শেষ হয়নি, ভোর হতে আর দেরী নেই।

ম্যাগনোলিয়া, টিউবরোজ আর মিগ্‌নোনেটের উগ্র সৌরভে বাতাস আবিষ্ট। উষ্ণ অথচ আর্দ্র বাতাসে আশ্চর্য মদিরতা। কোথাও কোনো পাতার কাঁপন নেই। চারিদিকে অনাবিল প্রশান্তি। পায়ের নিচে বালি সরে যাওয়ার মচমচ আওয়াজ ছাড়া নৈঃশব্দ্যের বুকে নেই আর কোনো শব্দতরঙ্গ।

বাগানের পথ বেয়ে চলেছে ইকথিয়ানডার। কোমরের বেল্ট থেকে ঝুলছে ছোরা, গগ্‌ল্‌স, ব্যাঙের থাবার মত ঝিল্লী দিয়ে আঙ্গুলজোড়া দস্তানা আর সাঁতার কাটবার জুতো। ডেলা ডেলা জমাট কালো অন্ধকারের মত হেথায়-সেথায় দাঁড়িয়ে ঝোপ আর গাছগাছড়া। তারই মাঝে দিয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে পথ। পথ চলতে চলতে মধ্যে মধ্যে পাতায় শাখায় গা লেগে যাচ্ছে ইক্‌থিয়ানডারের; নাড়া খেয়ে ঝড়ে পড়ছে ভোরের শিশিরবিন্দু; মুক্তাবিন্দুর মত অপরূপ সুষমা নিয়ে তা গড়িয়ে পড়ছে চুল আর সদ্য নিদ্রোত্থিত উষ্ণ কপোল বেয়ে।

একটু ডাইনে বেঁকেছে রাস্তাটা, তারপরেই ঢালু হয়ে নেমে গেছে। বাতাস যেন আরো স্যাঁতসেঁতে, আরো আর্দ্র। চাকা-চাকা পাথর দিয়ে বাঁধানো ঘাটের ওপর পা পড়ে ইক্‌থিয়ানডারের। থমকে দাঁড়ায়।

তাড়াহুড়োর কোনো দরকার ছিল না। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে সাঁতার কাটবার সরঞ্জাম চোখে, হাতে আর পায়ে লাগিয়ে নিলে ইক্‌থিয়ানডার। তারপর ফুসফুস থেকে সমস্ত হাওয়া বার করে দিয়ে ঝুপ করে ডাইভ দিলে, সুইমিং পুলে।

শীতল জল। দেহমনকে চনমনে করে তোলার মত স্নিগ্ধ। নিমেষে কানকোর মধ্যে দিয়ে ছুঁচ ফোটার মত অনুভূতি সঞ্চারিত হয়ে যায়। তালে তালে নিয়মিত ছন্দে স্পন্দিত হতে থাকে দুই কানকো। জলের মাছে রূপান্তরিত হয়ে গেল ডাঙার মানুষ।

হাতের কয়েকটা সবল টানেই একদম জলের নিচে গিয়ে পৌঁছোলো ইক্‌থিয়ানডার—তলা বরাবর এগিয়ে গেল আরো খানিকটা। সামনে বিস্তৃত হাতে ঠেকে সর্বপ্রথম লোহার আংটাটা। পাথরের দেওয়ালের নিচেই ডুবন্ত আংটার সারি। একটার পর একটা আংটা ধরে ভেতরে ঢুকে যায় ইক্‌থিয়ানডার—অবশেষে এসে দাঁড়ায় সুড়ঙ্গে। মাথা নিচু করে জলের তোড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যায় সামনে। ঠেলা দিতেই ওপরে উঠে পড়ে ইক্‌থিয়ানডার। এবার এসে পড়ে গরম জলের প্রবাহে। বাগানের সব কটা জলাধারের উষ্ণ জল এইপথেই গিয়ে পড়ছে সাগরে। যুক্তহাতে চিৎ হয়ে ভাসতে থাকে ইক্‌থিয়ানডার। উজানে মাথা ফিরিয়ে দিতেই গরম স্রোতই টেনে নিয়ে যায় সমুদ্রের দিকে।

সুড়ঙ্গের মুখ এগিয়ে আসছে। কানে ভেসে আসছে খচমচ আওয়াজ। বালির ওপর নুড়ি আর ঝিনুকের খোলার ওপর গরম জলের উষ্ণ প্রস্রবণ আছড়ে পড়ছে। তাই এই শব্দ। সুড়ঙ্গের মুখেই ঝরনার আকারে সমুদ্রে গিয়ে মিশছে গরম জলের ধারা।

উল্টো গিয়ে ফিরে তাকায় উভচর ইকথিয়ানডার। কিন্তু এখনও কালির মত অন্ধকার। কিছুই চোখে পড়ে না। দুহাত বাড়িয়ে দেয় সামনে। পরমুহূর্তেই হাতে ঠেকে লোহার গরাদ। সমুদ্র-গুল্মের পুরু আস্তরণে হড়হড়ে গরাদগুলো··· মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট শামুকের কর্কশতা। পিচ্ছিল গুল্মের মধ্যেই লেগে রয়েছে ক্ষুদে শামুকগুলো—যেমনটি জাহাজের নিচে দেখা যায়।

জটিল তালাটার জন্যে কিছুক্ষণ হাতড়াতে হয় ইক্‌থিয়ানডারকে। অচিরেই ভারী গোলাকার দরজাটা খুলে যেতে থাকে আস্তে আস্তে, ফাঁক দিয়ে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে পড়ে ইক্‌থিয়ানডার,—খোলা সমুদ্রের দিকে সাঁতরে যেতে যেতেই শুনতে পায় আপনা হতেই তালাবন্ধ হয়ে গেল পেছনের লৌহদ্বারের।

জলের নিচে এখনও গাঢ় অন্ধকার। অনেক গভীরে তাল তাল রন্ধ্রহীন তমিস্রার মধ্যে মধ্যে আলেয়ার ভৌতিক আলোর মতই দপ দপ করে জ্বলে উঠছে 'নকটিলুকা'র নীলাভ দ্যুতি। সামুদ্রিক কীট নকটিলুকা। রাতের অন্ধকারে ঢেউয়ের ডগায় যে ফসফরাসের আভা, তা বেরোয় এদেরই গা থেকে। আর দেখা যাচ্ছে নিস্প্রভ লালাভ প্রভা—জলচর প্রেতের মতই ছুটোছুটি করছে জেলীফিশ। কিন্তু ভোর হতে আর বিশেষ দেরী নেই। আকাশের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে একে একে নিভে যাবে সমুদ্রের ফসফরাস পিদিমগুলো। দিনের আলোয় জ্যোতিহীন হয়ে যাবে তারা, যারা রাতের আঁধারে ফসফরাসের অগুন্তি লণ্ঠন জ্বালিয়ে সাজিয়ে রাখে সাগরের কালো জল।

সহজভাবে আর শ্বাস নিতে পারছে না ইক্‌থিয়ানডার। কানকোর মধ্যে ছুঁচফোঁটার মত জ্বালা। শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টকর হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে। কারণ খুব সোজা। পাথুরে জমি ছাড়িয়ে নিশ্চয় নদীর মোহনার কাছে চলে এসেছে সে। কাদাটে জল এসে মিশছে সাগরের জলে। তাই অস্বস্তি।

কাদাঘোলা জলে মাছগুলো বাঁচে কি করে, ভেবে অবাক হয়ে যায় ইক্‌থিয়ানডার। কানকো নিশ্চয় খুব মজবুত।

হঠাৎ ডানদিকে মোড় নেয় ইক্‌থিয়ানডার। দক্ষিণমুখো। তারপর আস্তে আস্তে নেমে যায় গভীর জলে। অচিরে এসে পড়ে ঠাণ্ডা জলের প্রবাহে। উপকূল বরাবর জলের মধ্যে দিয়ে বারোমাস বইছে এই প্রবাহ। বইছে উত্তরদিকে। কিন্তু বিশাল পারানা নদীর মোহানায় জলস্রোতের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে খরস্রোতা এই প্রবাহ বাঁক নিয়েছে পূর্বদিকে। প্রবাহের একদম নিচে যেতে হলে অনেক গভীর জলে ডুব দিতে হয়। কিন্তু জলের মাত্র পঞ্চাশ ফুট নিচে নামলেই নাগাল পাওয়া যায় সেই শীতল স্রোতের—ইক্‌থিয়ানডার এসে পেঁছায় সেইখানেই। এবার জিরোবার পালা। নিশ্চিন্ত মনে চুপচাপ শুয়ে থাকলেই হল। স্রোতের টানে আপনা থেকেই পেঁছে যাওয়া যাবে খোলা সমুদ্রে।

অন্ধকার থাকতে থাকতে খানিকটা ঘুমিয়েও নেওয়া যায়। সমুদ্রের শিকারী মাছদের দেখা পেতে এখনো দেরী। তাছাড়া, ভোরের দিকের ঘুমটা জমে ভাল। স্নিগ্ধ শীতল জলে মিষ্টিমধুর আমেজ।

ঘুমিয়ে পড়ে ইক্‌থিয়ানডার। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও সক্রিয় থাকে তার প্রতিটি লোমকূপ। জলের তাপমাত্রা আর জল চাপের সামান্যতম পরিবর্তনও ধরা পড়ে সেখানে। একটু পরেই কানের পর্দায় ধাক্কা খায় লোহায় লোহায় ঠোকা-ঠুকির কড়াং কড়াং শব্দ। তীক্ষ্ন নয়, চাপা শব্দ। সে শব্দ আবার ভেসে আসে অন্যদিক থেকে······আবার······আবার।

নোঙরের শেকলের আওয়াজ। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কয়েক মাইল দূরের যে উপ-সাগরের দিকে ভেসে চলেছে ইক্‌থিয়ানডার, এ আওয়াজ আসছে সেইখান থেকেই। ভোরের হাওয়ায় মাছধরার জন্যে নোঙর তুলছে জাহাজগুলো। তারপরেই সব ডুবে যায় নতুন একটা শব্দে। একখানা গুর-গুর ধ্বনি। বহু দূরাগত, কিন্তু তবুও রীতিমত জোরালো। বিরামহীন এই নির্ঘোষ আসছে 'হরক্‌স্‌' জাহাজের প্রপেলার থেকে। লিভারপুল আর বিউনোআয়ার্সের মধ্যে যাতায়াত করে বৃটিশ জাহাজ 'হরক্‌স্‌'। অন্ততপক্ষে প্রায় বিশমাইল দূরে রয়েছে 'হরক্‌স্‌'। কিন্তু সমুদ্রে এ দূরত্বে শব্দ আটকে রাখা যায় না। জলের মধ্যে দিয়ে মিনিটে প্রায় পঞ্চাশ মাইল বেগে ছুটতে থাকে যে কোনো আওয়াজ। রাতের অন্ধকারে 'হরক্‌স্‌' জাহাজ দেখলে তাক লেগে যায়। ঠিক যেন একটা ভাসমান নগরী। আলোময়, উৎসব মুখর প্রাণোচ্ছল।

কিন্তু নিশুতি রাতে এ দৃশ্য দেখতে হলে সাঁঝের বেলাই সাগর পাড়ি দিতে

হয় ইক্‌থিয়ানডারকে। সূর্য ওঠার পর বিউনোআয়ার্সের জাহাজঘাটায় যখন 'হরক্‌স্‌' এসে দাঁড়ায়, তখন আর তাকে চেনা যায় না। আলোর মালাহীন একটা বিশাল জাহাজ ছাড়া তাকে আর কিছুই বলা যায় না।

অনেক ঘুম হয়েছে, এবার ঘুম ভাঙা দরকার। 'হরক্‌স্‌'-এর প্রপেলার নির্ঘোষে এখুনি সাগরের সব বাসিন্দারই ঘুম ছুটে যাবে। একটু আগেই জলের চাপেও একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে ইক্‌থিয়ানডার। নিশ্চয় ডলফিনদের চলাচলের জন্যেই এই পরিবর্তন। জাহাজ আসার খবর সবার আগে ওরাই ওদের তীক্ষ্ন অনুভূতি দিয়ে ধরে ফেলে। এতক্ষণে নিশ্চয় 'হরক্‌স্‌' অভিমুখে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে ডলফিন বাহিনী—জাহাজ দেখার আনন্দে লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে ঢেউয়ের ওপরে।

... ... ... ...

জাহাজঘাটা আর উপসাগর সরগরম হয়ে ওঠে। জাহাজের ইঞ্জিন চলার গুমগুম শব্দ আছড়ে পড়ে ইকথিয়ানডারের কানের পর্দায়। ঘুমোনো চলে না। চোখ খোলে ইক্‌থিয়ানডার। মাথা ঝাঁকিয়ে আড়মোড়া ভেঙ্গে তীরবেগে উঠে যায় ওপরে।

ধারে কাছে নৌকা বা স্কুনারের চিহ্নমাত্র নেই। মাথার ওপর উড়ছে অতিকায় গাংচিল। মাঝে মাঝে এত নিচে নামছে যে আয়নার মত চকচকে ঢেউয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে ডানার ডগা অথবা বুকের পালক। গাংচিলের ডাক শুনে মনে হয় যেন শিশুর কান্না। বিশাল ডানা নেড়ে তীরের দিকে উড়ে গেল একটা অ্যালবেট্রস। ডানার এ-ডগা থেকে ও-ডগা পর্যন্ত কম করে বারো-ফুট লম্বা। হিংসে হয় ইক্‌থিয়ানডারের। ওরকম দুখানা ডানা যদি থাকত!

পশ্চিমে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে রাত। পূব রাঙিয়ে আসছে ঊষা। অল্প অল্প হাওয়া বইছে। শান্ত জলে তরঙ্গ উঠছে। আঃ, কি মিষ্টি হাওয়া!

সারি সারি কয়েকটা পালতোলা স্কুনার চোখে পড়ল। বাবার হুকুম মনে পড়ল—লোকজন অথবা নৌকো জাহাজের যেন ধারে কাছে না যায় ইক্‌-থিয়ায়ানডার। কাজেই এক ডুবে আবার ঠাণ্ডা জলের স্রোতের টানেই পেঁছিবে সে গভীর সমুদ্রের রূপসাগরে—যেখানে হাজারো রঙের ফুরফুরে প্রজাপতির মত খেলা করছে হলদে সবুজ বাদামী মাছের দল।

মাথার ওপর ঘড় ঘড় শব্দ শোনা গেল। মুহূর্তের জন্য ছায়া পড়ল জলে। সী প্লেন। নিচু দিয়ে উড়ছে।

একবার চুপি-চুপি একটা সী-প্লেনে উঠেছিল ইক্‌থায়ানডার। জলের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল উড়োজাহাজটা। সেবার মরতে মরতে বেঁচে গেছিল ইক্‌থিয়ানডার। আচমকা শূন্যে উঠে পড়ল সী-প্লেন। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিল ইক্‌থিয়ানডার। ফুট তিরিশেক উঁচুতে ওঠার পর উপস্থিত বুদ্ধি ফিরে আসে—তক্ষুনি সাগরের

বুকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণে বেঁচে যায় সে।

... .. ... ...

ওপরে তাকায় ইক্‌থিয়ানডার।

আলোভরা মস্ত গোলকের মত সূর্য ঠিক মাথার ওপরে। জলের ওপরে দুপুর। কিন্তু জলের নিচে গোধূলি। সবুজাভ গোধূলি।

কঁকিয়ে কেঁদে এখনও উড়ছে গাংচিল। উড়ছে বেগবান ফ্রিগেট পাখী! ধারালো ডানার ঘায়ে বাতাস যেন কেটে কেটে যাচ্ছে। উড়ছে উড়ন্ত মাছ। আশেপাশে এক-এক লাফে চল্লিশ ফুট পর্যন্ত উড়ে যাচ্ছে—আবার ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসছে—ঢেউ ছুঁতে না ছুঁতেই আবার উড়ছে। হঠাৎ গোঁৎ খেয়ে নেমে আসে একটা ফ্রিগেট—ছোঁ মেরেই উঠে যায়। কঠিন বক্র চঞ্চুতে ছটফট করছে রুপোলী একটা মাছ। ঘুরে ঘুরে ক্রমশ ওপরে উঠে যাচ্ছে অ্যালবেট্রসগুলো —ঝড় আসছে—আগেই টের পেয়েছে ওরা।

মেঘের আড়ালে সূর্য মুখ লুকোবার আগেই বিন্দুকক্ষেতে পেঁছিতে হবে ইক্‌থিয়ানডারকে। দুপুরের খাওয়া সারতে হবে সেইখানেই। ব্যাঙের মতই লাফিয়ে এগিয়ে যায় ইক্‌থিয়ানডার।

আচ্ছা, ঢেউ ভেঙ্গে সাঁতরাবার সময়ে যে জলকে গাঢ় নীল দেখায়, পেছন ফিরে তাকালে তা এত ফ্যাকাশে মনে হয় কেন? আপন মনেই ভাবে ইক্‌থিয়ানডার।

যেতে যেতে মাঝে মাঝে চিৎ হয়ে গিয়ে সূর্যের দিকে ফিরে তাকায়। পথ চিনতে কানকো আর গায়ের চামড়াও অনেক সাহায্য করে। বিন্দুকক্ষেতের কাছে জলে অক্সিজেনের পরিমাণ অনেক বেশী। নিজেকে অনেক হাল্কা মনে হয় সেখানে। মনটা সুখের অনুভূতিতে টলমল করে ওঠে। কিন্তু জল বড় নোনতা। তাই একটু জলের স্বাদ নেয় ইক্‌থিয়ানডার। সামুদ্রিক নেকড়ের মতই জলের স্বাদে বুঝতে পারে ডাঙা আর কতদূর।

এবার ডাইনে আর বামে চোখে পড়ে খাড়াই পাহাড়গুলো। জলের মধ্যেই বহু উঁচুতে উঠে গেছে এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ের সারি। মাঝামাঝি জায়গায় একটুকরো সমতলভূমি। চারিদিকে পাথুরে দেওয়াল। এই হল ইক্‌থিয়ানডারের জলতলের বন্দর। দারুণ ঝড়ে সাগর তোলপাড় হয়ে গেলেও এখানে তার রেশমাত্র পেঁছায় না। তবে মেঘডাকার গুম গুরু ধ্বনি ভেসে আসে এত নিচেও।

শান্ত নিথর সেই বন্দরে শুধু ইক্‌থিয়ানডার নয়, লক্ষ লক্ষ মাছ আশ্রয় নেয় ঝড়ের সময়ে। হলুদ ডোরাকাটা, কমলার ওপর কালো ফুটকি, বেগুনী এবং আরও কতশত মনমাতানো রঙ। এক রকম মাছ আছে পাশ থেকে দেখতে ভারী সুন্দর। কিন্তু ওপরে গেলে আর দেখাই যায় না। বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রথম-প্রথম দারুণ ঘাবড়ে যেত ইক্‌থিয়ানডার। তারপর একদিন একটা মাছ ধরেছিল। চওড়ায় হাতের চেটোর মত। কিন্তু প্রায় পিচবোর্ডের মত পাতলা। এত ফিনফিনে যে ওপর থেকে দেখাই যায় না।

এবার খাওয়ার পালা। ঝিনুকক্ষেতে উবু হয়ে বসে পড়ে ইক্‌থিয়ানডার। হাতের কাছে প্রথমেই শাঁখ-শামুক, ঝিনুক, যা পায় তাই তুলে নেয়। মুখের মধ্যে পুরে দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচকিরির মত জল বার করে দ্যায়। সামান্য জল অবশ্য পেটে চলে যায়, কিন্তু তা অভ্যেস হয়ে গেছে ইক্‌থিয়ানডারের।

মাথার ওপর একটা কালো ছায়া না? খাওয়া তো হয়ে গেছে। এবার দেখে আসা যাক্ তো কি ব্যাপার। পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে মাছের মত পিছলে ওপরে উঠে যায় ইক্‌থিয়ানডার। ঢেউয়ের ওপর দুলছে একটা মস্ত অ্যালবেট্রস। কমলারঙের পা দুটো নাগালের মধ্যে।

হঠাৎ দুষ্টুমি বুদ্ধি গজায় ইক্‌থিয়ানডারের মাথায়। হাত বাড়িয়ে চট করে চেপে ধরে পা দুটো। ভড়কে গিয়ে ডানা ঝটপটিয়ে শূন্যে উঠে পড়ে অ্যালবেট্রস—সেই সাথে ইক্‌থিয়ানডার। কিন্তু জলের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওজন বেড়ে যায়—সব শুদ্ধ ঝুপ করে জলে আছড়ে পড়ে। নরম বুকের উষ্ণ পালকে ঢাকা পড়ে যায় সর্বাঙ্গ। কিন্তু দানব পাখীর কঠিন চঞ্চুর ঠোক্কর খাওয়ার আগেই পা ছেড়ে ডুব দিয়ে পালায় ইক্‌থিয়ানডার।

কাড়ানাকাড়া ধ্বনির মত মেঘের গর্জন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে। ঝড়ও আর নেই। চিৎ হয়ে ভাসতে থাকে ইক্‌থিয়ানডার। বৃষ্টি এখনও পড়ছে। সীসের চাদরের মতো ঢেকে রেখেছে সসাগরা ধরিত্রীকে। বড় ভালো লাগে ইক্‌থিয়ানডারের। বিশাল বিশাল ঢেউয়ের ওপরে ভাসতে থাকে অবলীলাক্রমে। চারিদিকে সাদা ফেনা আর বৃষ্টির টাপুর টুপুর। আকাশ-বাতাস সমুদ্রের এই রুদ্র রূপ দেখলে অন্য মানুষ ভয় পেতে পারে, কিন্তু ইক্‌থিয়ানডার তো আর সাধারণ মানুষ নয়, সে যে জলের মানুষ। কোন্ ঢেউয়ের কি প্রকৃতি তা তার নখদর্পণে।

বৃষ্টি ধরেছে। পূর্বদিকের মেঘ সরে গেছে। বাতাসের শনশন শব্দও শোনা যাচ্ছে না। কালো মেঘের বুক ছিঁড়ে উঁকি দিচ্ছে ঝকঝকে নীল আকাশ ···রুপোর মত কিরণধারা এসে পড়ছে ইক্‌থিয়ানডারের পাশে·· ···পান্নার মত জ্বলছে সমুদ্রের নীল জল······দক্ষিণ পূবে জোড়া রামধনু উঠছে।

সূর্য! সূর্য! ওপরে সোনা সূর্য! নিচে মরকত শয্যা! আকাশ সাগর পাহাড় উপকূল যেন আর চেনাই যায় না। ঝড়ের পর পৃথিবী যে কতখানি তাজা হয়ে ওঠে, তা ইক্‌থিয়ানডার যতখানি জানে, আর কেউ তা জানে না। আকাশে মিশে যায় সমুদ্র, অক্সিজেনে ভরে ওঠে জল। উজ্জ্বল সমুদ্রের ফুরফুরে বাতাস বুক ভরে টেনে নেয় ইক্‌থিয়ানডার, কানকোর মধ্যে দিয়েও তেজালো অক্সিজেন চাঙা করে তোলে দেহমনকে।

ঝড়ের পরে সমুদ্রের এই নতুন রূপের তথ্য মাছেরাও জানে। কিন্তু মানুষরা জানে না।

ডলফিনগুলোও এসে গেছে। দুষ্টুমিভরা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে লাফালাফি

করছে, ছুটোছুটি করছে। হাসতে হাসতে ইক্‌থিয়ানডার দলে ভিড়ে যায়। সূর্যের আলোয় সমুদ্রের জল উজ্জ্বল সবুজ পান্নার মত দেখাচ্ছে। চকচক করছে ডলফিনদের কালো পিচ্ছিল পিঠ। কি মজা! এই আকাশ, এই সমুদ্র, এই সূর্য, আর ডলফিনেরা সবাই যেন সৃষ্টি হয়েছে শুধু ইক্‌থিয়ানডারকেই আনন্দ দেওয়ার জন্যে।

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। ঘাড় উঁচু করে দ্যাখে ইক্‌থিয়ানডার। কিন্তু আজ আর সকাল সকাল বাড়ী ফেরার ইচ্ছে নেই।

বালুকাবেলার দিকে এগিয়ে যায় সে। ঝড়ের তাণ্ডব নাচের পর বহু মাছ, কাঁকড়া, জেলীফিশ, আরো কত প্রাণী আছড়ে পড়েছে বালির ওপর। অন্যান্য দিনে সামুদ্রিক গুল্মের মধ্যে মাঝে মাঝে ডলফিনকেও পড়ে থাকতে দেখা যায়। কত রঙীন প্রবালও ছড়িয়ে এদিকে সেদিকে। যারা এখনো বেঁচে, তাদের নিয়ে জলে ছেড়ে দিয়ে আসে ইক্‌থিয়ানডার। একটা বড় মাছ হাতের ফাঁকে ঝটপট করতে থাকে। হাসে ইক্‌থিয়ানডার। গভীর সমুদ্রে ক্ষিদের মাছটা হয়ত তক্ষুনি খেয়ে ফলত। কিন্তু এখানে সে এদের ত্রাতা, এদের অভিভাবক, এদের বন্ধু।

সাধারণত রাত হলেই জলের নিচের স্রোত ধরে বাড়ী ফেরে ইক্‌থিয়ানডার। কিন্তু আজ আর জলের নিচে বেশীক্ষণ ভালো লাগছে না। এমন তাজা বাতাস ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে যায় না। তাই কখনো ডুব দিয়ে কখনো মাথা তুলে স্বচ্ছন্দ সুন্দর ভঙ্গিমায় সাঁতরে চলল ইক্‌থিয়ানডার। দেখে মনে হয় মাছের সন্ধানে বার বার ছোঁ মারছে একটা মানুষ-পানকৌরি।

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। তারার চবমকি দেখা যাচ্ছে কালো আকাশে। চারিদিক নিস্তব্ধ। নিথর। ভয় পায় না ইক্‌থিয়ানডার। দিন আর রাতের এই সন্ধিক্ষণে ভয় দেখানোর মত ভয়ানক কিছুও থাকে না আশেপাশে।

… … … …

পাওয়া গেছে দক্ষিণমুখো স্রোতটা। আরও নিচে নামলে ঠাণ্ডা জলের স্রোত বইছে ঠিক উল্টো দিকে। কিন্তু ওপরকার এই উষ্ণ প্রবাহে হাত-পা এলিয়ে কেবল ভেসে থাকলেই হল—আপনা হতেই পেঁছে যাবে সুড়ঙ্গের মুখে। তবে সজাগ থাকা দরকার—সুড়ঙ্গের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলে আবার জল কেটে ফিরে আসার ঝামেলা।

চিৎ হয়ে ওপরে তাকায় ইক্‌থিয়ানডার। ধূলিকণার মত মুঠো মুঠো তারা ছড়ানো সারা আকাশে। কিন্তু এ তো সত্যিকারের আকাশ নয়—সমুদ্রের ওপরে ছড়িয়ে রয়েছে অগুন্তি নকটিলুকি—আলোর কীট। জোনাকির মত ক্ষুদে ক্ষুদে লণ্ঠন জ্বালিয়ে সাজিয়ে রেখেছে গোটা সমুদ্র। হেথায়-সেথায় অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে নীলচে আর গোলাপী আলোকপিণ্ড—ঠিক যেন অসংখ্য নীহারিকা……লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে ক্ষুদে অনেক কীটের সমষ্টি। হালকা সবুজ

আলো ছড়িয়ে ভেসে যাচ্ছে দ্যুতিময় বল। পাশ দিয়ে ধীরে ধীরে সরে গেল একটা জেলীফিশ—ঝালরের নিচে জ্বলছে বিচিত্র লণ্ঠন। এ তো গেল ওপরে দৃশ্য জলের নিচে ছোট-বড় মাছেরা আলো ছড়িয়ে তাড়া করছে পরস্পরকে······কখনো জ্বলছে...কখনো নিভছে।

দেখা যাচ্ছে আশ্চর্য প্রবাল। নীল, গোলাপী, সবুজ, সাদা আভা বেরোচ্ছে তাদের কিম্ভূতকিমাকার চেহারা থেকে, কেউ নিভু নিভু, কেউ লোহার মত টকটকে রাঙা।

ডাঙার আকাশে যত তারা দেখা যায়, তার চেয়ে ঢের বেশী তারা চোখে পড়ে সাগরের আকাশে। জলের ওপর ভেসে উঠে সেই দৃশ্যই দেখতে লাগল ইক্‌থিয়ানডার।

চাঁদ উঠেছে। রুপোলী পথ পেতে দিয়েছে তরঙ্গ-ফেনিল সাগরের বুকে।

দূর থেকে ভেসে এল হরক্‌স্‌-এর সিটির আওয়াজ। গেলে হত। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা হল সমুদ্রে টৌ-টৌ করছে ইক্‌থিয়ানডার। আজ বাবা নিশ্চয় বকাবকি করবেন।

সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ে ইক্‌থিয়ানডার। লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে দিয়ে খুলে ফেলে লোহ-জালি—সাঁতরে ঢুকে যায় অন্ধকারের মধ্যে। নিচের ঠাণ্ডা জলের স্রোতে পড়েছে সে······এ স্রোত গিয়ে মিশেছে বাগানের জলাধারগুলোয়।

কাঁধের ওপর টোকা পড়তেই চমক ভাঙ্গল। সুইমিং পুলে পেঁৗছে গেছে ইক্‌থিয়ানডার। তাড়াতাড়ি তীরে উঠে আসে, শ্বাস নেয় ফুসফুস দিয়ে। বাতাসে চেনা ফুলের টাটকা সুরভি।

কয়েক মিনিট পরেই রাজ্যের ঘুম নেমে আসে দু'চোখে। শুধু বাবাকে খুশী করার জন্যে শুয়ে পড়ে বিছানায়······দেখতে দেখতে অচেতন হয়ে যায় সুগভীর নিদ্রায়।

## সেই মেয়েটি ও আগন্তুক

ঝড়ের পর একবার সাগরে গেছিল ইক্‌থিয়ানডার।

লম্বা ডুব সাঁতার দিয়ে জলের ওপর মাথা তোলার পরেই চমকে উঠছিল। প্রথমে মনে হয়েছিল এক টুকরো ছেঁড়া পাল। সাদা কাপড়ের টুকরো। জেলে-ডিঙি থেকে নিশ্চয় ছিঁড়ে এসে পড়েছে জলে।

কিন্তু তা তো নয়। কাছে আসতেই ভুল ভেঙ্গে ছিল। এক টুকরো কাঠের সঙ্গে বাঁধা একটা মেয়ে। সুন্দরী, তরুণী।

মরে গেছে নাকি? মনটা কেমন করে ওঠে ইক্‌থিয়ানডারের। সঙ্গে সঙ্গে জীবনে এই প্রথম সমুদ্রের প্রতি একটা বিতৃষ্ণাও জেগে ওঠে মনে, একী নিষ্ঠুরতা!

এমনও হতে পারে শুধু জ্ঞান হারিয়েছে মেয়েটি ? সুগঠিত ছোট্ট মাথাটা অবশভাবে ঝুলছিল একপাশে, আলতো হাতে ইকথিয়ানডার তুলে দিল ওপরে। তারপর টুকরো কাঠের ভেলা ধরে ঠেলে নিয়ে চলল তীরের দিকে।

প্রাণপণে সাঁতার কাটতে লাগল ইক্থিয়ানডার। মাঝে মাঝে থেমে শিথিল মাথাটা তুলে দিতে লাগল কাঠের ওপর। অবিশ্বাস্য বেগে জল কেটে এগিয়ে যেতে যেতে বিড়বিড় করতে লাগল মেয়েটির কানের কাছে। আপন মনে এমনি-ভাবে মাছেদের সঙ্গে কথা বলে ইকথিয়ানডার। 'আর একটু······আর একটু··· আর কোনো ভয় নেই।'

সাঁতার কাটছে আর ভাবছে ইক্থিয়ানডার। মেয়েটা যদি জ্ঞান ফিরে পেয়ে এখুনি চোখ মেলে তাকায় ? নির্ঘাৎ ভয়ের চোটে ভিরমি যাবে। তার চাইতে গগল্স্ আর দস্তানাগুলো খুলে ফেললে হয় না ? কিন্তু দস্তানা খুলে ফেললে এত জোরে তো এগোনো যাবে না।

অবশেষে ফেণায় ফেণায় সাদা তীরের কাছে এসে পৌঁছায় ইক্থিয়ানডার। পায়ের তলায় বালির ছোঁয়া পেতেই দাঁড়িয়ে পড়ে ঠেলে ঠেলে কাঠ সমেত রূপসীকে তোলে ডাঙার ওপর। বাঁধন খুলে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে যায় একটা ঝোপের আড়ালে। তারপর শুরু হয় কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস বওয়ানোর প্রচেষ্টা।

চোখের পাতাটা একবার কেঁপে উঠল না ? না, চোখের ভুল ? বুকের ওপর কান পাতে ইক্থিয়ানডার। ঐ তো ! ঐ তো ! ঐ তো শোনা যাচ্ছে ধুক-পুকুনি ! বেঁচে আছে ! বেঁচে আছে ! আনন্দে ইকথিয়ানডারের ইচ্ছে হল গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওঠে !

থিরথির করে কাঁপতে কাঁপতে চোখের পাতা আদ্ধেক খুলে যায় মেয়েটার, ইক্থিয়ানডারকে দেখেই শিউড়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে আবার চোখ মোদে।

যুগপৎ হর্ষ আর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে যায় ইক্থিয়ানডারের মন। কি করবে সে এখন ? এর পরেও গোঁয়ারের মত বসে থেকে বেচারীকে ভয় দেখাবে, না, জলের ছেলে জলে ফিরে যাবে ?

আচম্বিতে শোনা গেল কার পায়ের শব্দ। কে যেন এগিয়ে আসছে এদিকে। আর ভাবনার সময় ছিল না। চকিতে জলে ঝাঁপ দিল ইক্থিয়ানডার। এক ডুবে গিয়ে উঠল ওপাশের চোরা পাহাড়ের আড়ালে। চোখ রাখলে মেয়েটির ওপর।

ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রোদেপোড়া ময়লা রঙের একজন পুরুষ। মোটামোটা গোঁফ আর ছাগলদাড়ি উঁকি দিচ্ছে চ্যাটালো টুপীর নিচ থেকে। বালির ওপর শায়িত মেয়েটিকে দেখেই থমকে দাঁড়ালো সে। পরক্ষণেই এক চীৎকার। দৌড়ে এল মেয়েটির দিকে। কিন্তু কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ কি খেয়াল হল, মেয়েটির দিকে না এসে দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াল পেল্লায় একটা ঢেউয়ের সামনে। ঘুরপাক খেতে খেতে সবে ডাঙার ওপর ভেঙ্গে পড়ছিল

ঢেউটা। গুঁফো লোকটা তার সামনে দাঁড়াতেই ভিজে সপসপে হয়ে গেল সে। আবার দৌড়ে উঠে এল ওপরে। মেয়েটির ওপর ঝুঁকে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের চেষ্টা করতে লাগল (ইক্‌থিয়ানডার কিন্তু বুবল না কেন এই ভণিতা!) আর বিরামহীনভাবে বকবক করে যেতে লাগল সুন্দরীর কানের কাছে—'বারণ করেছিলাম······বলেছিলাম না পাগলামি করতে যেও না······কেমন হলো তো... ভাগ্যিস কাঠটার সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিলাম।'

চোখ খুলল মেয়েটি। ঈষৎ মাথা তুলে তাকাল ছাগল দাড়ির দিকে। পূর্ণ দৃষ্টিতে প্রথমে ছিল আতংক, পরে দেখা গেল বিস্ময়, তারপরেই ফুটে উঠল ঘৃণা। গুঁফো লোকটা কিন্তু সমানে বকর বকর করে গেল কানের কাছে, ধরে বসিয়েও দিলে। কিন্তু দারুণ কাহিল হয়ে পড়েছিল নাম-না-জানা মেয়েটি। তাই আবার আস্তে আস্তে শুইয়ে দিলে বালির ওপর।

প্রায় আধঘণ্টা পরে উঠে দাঁড়ানোর মত শক্তি ফিরে পেল মেয়েটা। ইক্‌থিয়ানডারের প্রায় পাশ দিয়েই ধীরে ধীরে হেঁটে গেল দুজনে। ইক্‌থিয়ানডারের কানে এল বাঁশির মত মিষ্টি কণ্ঠ—'তাহলে আপনিই আমাকে বাঁচালেন? ভগবান আপনার ভাল করবেন।'

'আমার ভাল একমাত্র তুমিই করতে পার,' বললে লোকটা।

কিন্তু কথাগুলো মেয়েটার কানে ঢুকেছে বলে মনে হল না।

আপন মনে বললে সে একটু পরে—'অদ্ভুত! আমার মনে হল যেন দানোর মত কাকে দেখলাম আমার পাশে।'

'চোখের ভুল। অথবা যমদূতই এসে বসেছিল তোমার পাশে, আমার জন্যে পালাতে হল ব্যাটাকে। এস, আমার হাত ধরো, কোনো যমদূতের ক্ষমতা নেই তোমার ধারে কাছে আসে।'

আস্তে আস্তে চোখের আড়ালে চলে গেল দুই মূর্তি। অনিমেষ নয়নে সেদিকে তাকিয়ে রইল ইক্‌থিয়ানডার। লোকটার ডাহা মিথ্যে সে ধরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু উদ্ধারকর্তা সেজে কেউ যদি আনন্দ পেতে চায় তো পাক। ইক্‌থিয়ানডার তার কর্তব্য করেছে।

ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে মেয়েটি আর তার সঙ্গী কপট লোকটা। ইক্‌থিয়ানডার কিন্তু তখনও পলকহীন চোখে তাকিয়ে ছিল সেদিকে। এবার সে চোখ ফেরালে সমুদ্রের দিকে। বিশাল, কিন্তু কি শূন্য এই সমুদ্র!

বালির ওপর একটা মাছকে আছড়ে ফেলে দিয়ে গেল ঢেউ। চকচকে রূপোলী পেট মাছটার। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিলে ইক্‌থিয়ানডার। না, কেউ নেই। পায়ে পায়ে এগিয়ে সস্নেহে মাছটাকে তুলে নিয়ে ছেড়ে দিয়ে এল জলে। ল্যাজ ঝটপটিয়ে চকিতে উধাও হল মীন মহাশয়। উদাস দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল ইক্‌থিয়ানডার। বুঝল না এই অকস্মাৎ বিষাদের কারণ। বেশ কিছুক্ষণ জনশূন্য বালুকাবেলায় মাথা নিচু করে পায়চারী করল। মাঝে মাঝে তীরে-

উঠে-আসা মাছ ধরে ছেড়ে দিয়ে এল জলে। আস্তে আস্তে তন্ময় হয়ে গেল সে এই কাজে—কেটে গেল মনের বিষাদ। ফিরে এল মনের স্ফূর্তি, এখনকার মত ভুলে গেল সব কিছু। মাঝে মাঝে সাগরে ঝাঁপ দিয়ে ঠাণ্ডা করে এল কানকো জোড়া। সন্ধ্যে না হওয়া পর্যন্ত বাড়ী ফেরার কথা মনেই পড়ল না।

## ইক্‌থিয়ানডারের পরিচারক

আবার পাহাড়ে অঞ্চলে রওনা হলেন স্যালভেটর। এবার আর ক্রিষ্টো সঙ্গে নেই। ক্রিষ্টোর ওপর তিনি ওপরে ওপরে সন্তুষ্ট বলেই মনে হয়। তাই ইক্‌থিয়ানডারের দেখাশুনো করার কাজে তাকে পাকাপাকিভাবে বহাল করে গেলেন।

ক্রিষ্টো দেখলে এই সুযোগ। মালিক নেই। কাজেই বালতাসারের সঙ্গে যখন তখন দেখাসাক্ষাৎ করাতেও অসুবিধে নেই, সমুদ্র-দানবের হদিশ যে পাওয়া গেছে, এ খবর অবশ্য আগেই চলে গেছে বালতাসারের কাছে। এবার কিডন্যাপ করার ফন্দী আঁটাই শুধু যা বাকী।

কিছুদিন ধরেই ছ্যাতলা পড়া সাদা পাথরের কটেজে আস্তানা নিয়েছিল ক্রিষ্টো। ইক্‌থিয়ানডারের সঙ্গে ঘন ঘন দেখাও হচ্ছিল। দুদিন যেতে না যেতেই দিব্যি বন্ধুত্ব জন্মে গেল দুজনের মধ্যে। ডাঙার মানুষকে ভালবাসে ইক্‌থিয়ানডার। কেন না, ডাঙার মানুষের মধ্যে এমন এক অভিনবত্ব আছে যা জলচরদের মধ্যে নেই। কাজেই বুড়ো রেড-ইণ্ডিয়ানের মাই ডিয়ার হতে বেশী সময় গেল না। তাছাড়া, ক্রিষ্টোর ভাঁড়ার বোঝাই ডাঙার গল্প মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনত ইকথিয়ানডার। ডাঙার সম্বন্ধে কতটুকুই বা সে জানে? জলের দুনিয়া সম্বন্ধে অবিশ্যি তার চাইতে বেশী খবর পৃথিবীর সেরা বিশেষজ্ঞরাও রাখেন না। ভূগোল সম্বন্ধে জ্ঞান তার ভালই—নদীনালা সাগরে দিনরাত টোঁ টোঁ করার ফলে এদিক দিয়ে তাকে টেক্কা মারা খুবই শক্ত। জ্যোতির্বিদ্যা, নৌ চালনা বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা আর প্রাণিবিদ্যাতেও মোটামুটি দখল তার আছে। কিন্তু মানুষ সম্বন্ধে তার বিদ্যের দৌড় পাঁচ বছরের ছেলের মত। পৃথিবীতে অনেক জাতের অনেক মানুষ, এইটুকুই শুধু তার জানা—তার বেশী কিছু নয়। মানুষের ইতিহাস, মানুষে মানুষে রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তার ধারণা একেবারেই ভাসাভাসা—নেই বললেই চলে।

দুপুরবেলা রোদের তাত অসহ্য হয়ে উঠলে ভূগর্ভস্থ জলভরা গুহায় নেমে যায় ইক্‌থিয়ানডার। সমস্ত দিন জলে জলে কাটিয়ে শরীর আর কানকো ঠাণ্ডা রাখে। ফেরে সেই সন্ধ্যায় রোদ কমলে। আবার সকালেই ডুব দেয় জলে। ঝড়বৃষ্টি হলে অবশ্য আলাদা কথা। তখন বাতাসে বাড়তি আর্দ্রতার জন্যে অতক্ষণ জলে না কাটালেও চলে।

কটেজ প্যাটার্নের বাড়ীটা খুব বড় নয়। পরপর সবশুদ্ধ চারটে ঘর। সবশেষে রান্নাঘর। রান্নাঘরের পাশের ঘরটাতেই ডেরা নিয়েছে ক্রিষ্টো।

তারপরেই খাবার ঘর আর লাইব্রেরী ঘর। স্প্যানিশ আর ইংলিশ—দুটো ভাষাই পড়তে পারে ইক্‌থিয়ানডার। লাইব্রেরীর পরেই শোবার ঘর। মস্ত ঘর। ঘরের ঠিক কেন্দ্রে অনেকখানি জায়গা নিয়ে একটা চৌবাচ্চা। একপাশে দেওয়ালের গা ঘেঁসে বিছানা। কিন্তু বিছানার চাইতে চৌবাচ্চাটাই ইক্‌থিয়ানডারের বেশী পছন্দ। যাওয়ার আগে পই-পই করে বলে গেছেন স্যালভেটর, হপ্তায় অন্ততঃ তিনটে রাত যেন বিছানায় শুয়ে ঘুমোয় ইক্‌থিয়ানডার। তাই প্রতি রাতে ইক্‌থিয়ানডারকে বিছানায় শুইয়ে তবে ঘুমোতে যেত ক্রিষ্টো। অবাধ্য হলেই রাগারাগি করত।

অনুযোগ করত ইক্‌থিয়ানডার—'বারে, আমার চৌবাচ্চাতে ঘুমোতেই আরাম লাগে।'

'ডাক্তারবাবুর হুকুম তোমাকে বিছানায় ঘুমোতে হবে। বাবার অবাধ্য হয়ো না।'

স্যালভেটরকে যদিও ইক্‌থিয়ানডার বাবা বলেই ডাকত, ক্রিষ্টোর কিন্তু কেমন জানি সন্দেহ হত। রক্তের সম্পর্ক আদৌ আছে বলে বিশ্বাস করতে মন চাইত না। ইক্‌থিয়ানডারের গায়ের চামড়া অবশ্য ফ্যাকাশে—অন্তত যতটুকু দেখা যেত, ততটুকু তামাটে নয়। কিন্তু জলে দীর্ঘকাল ডুবে থাকলেও তো চামড়ার হাল এমনি হয়। লম্বাটে মাথা, সিধে নাক, পাতলা ঠোঁট আর বড় বড় উজ্জ্বল চোখজোড়া দেখে মন খুঁত খুঁত করত ক্রিষ্টোর। এমন চেহারা অ্যারোক্যানিয়ান ছাড়া আর কোনো জাতের হতে পারে না। ইক্‌থিয়ানডারের গায়ের রঙ কিরকম দেখার ইচ্ছে হত ক্রিষ্টোর। কিন্তু অজ্ঞাত বস্তু দিয়ে বানানো আঁটসাঁট বিচিত্র পোশাকটার জন্যে সে সুযোগ হত না।

একদিন রাতে জিজ্ঞেস করেছিল ক্রিষ্টো—'রাত্তির বেলাও কি পোশাকটা খুলতে নেই?'

'কেন খুলবো? আমার তো কোনো অসুবিধে হচ্ছে না? কাণকো দিয়ে দিব্যি শ্বাস নিতে পারি। গায়েও হাওয়া লাগে। তাছাড়া, এতো শুধু জামা প্যাণ্ট নয়, এযে আমার বর্ম। হাঙরের দাঁত তো বটেই, ধারালো ছুরীও ভোঁতা হয়ে যায় এ বর্মের কাছে।'

'গগল্‌স্‌ জুতো আর ঐ বিদঘুটে দস্তানাগুলো পরো কেন?' জিজ্ঞেস করেছে ক্রিষ্টো। বিছানার কাছেই পড়ে ছিল জিনিসগুলো নীলচে রাবারের তৈরী দস্তানা। আঙুলে আঙুলে পাতলা রাবার দিয়ে জোড়া। আঙুলে গ্রন্থির সংখ্যাও বেশী। পায়ের আঙুলগুলো তো আরো লম্বা।

'গগল্‌স্‌, জুতো আর দস্তানা পরি শুধু জোরে সাঁতার কাটবার জন্যে। চোখে বালি লাগে না গগল্‌স্‌ পরলে। তাছাড়াও জলের নিচে দৃষ্টিও চলে অনেক দূরে—তা না হলে তো সবই কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যেত,' বলে হাসতে থাকে ইক্‌থিয়ানডার। 'ছেলেবেলায় ওদিকের বাগানে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে

খেলতে যেতাম, বাবাই নিয়ে যেতেন। আশ্চর্য, দস্তানা না পরে যে কি করে ওরা সাঁতার কাটতো ভাবি। ওদের সামনে অবশ্য আমি কোনদিন সাঁতার কাটিনি।'

'এখনো উপসাগরে সাঁতার দিতে যাও নাকি,' জানতে চেয়েছে ক্রিষ্টো।

'নিশ্চয় যাই। তবে পাশের সুড়ঙ্গ দিয়ে যাই। একবার কতকগুলো বদলোক জাল দিয়ে আমাকে ধরে ফেলেছিল আর কি। সেই থেকে সাবধান হয়ে গেছি।'

'বটে, তাহলে সমুদ্রে যাওয়ার জন্যে আর একটা সুড়ঙ্গ আছে?'

'আছেই তো, অনেক আছে। হায় রে, আমার সঙ্গে যদি জলে জলে ঘুরতে পারতে, কত আশ্চর্য জিনিস দেখাতাম তোমায়, একসঙ্গে চেপে বসতাম আমার সাগর-ঘোড়ার পিঠে। আচ্ছা, সব মানুষ জলের তলায় থাকে না কেন?'

'সাগর-ঘোড়াটা আবার কি জিনিস?'

'ডলফিন মাছ। আমিই পোষ মানিয়েছি। ঝড়ের পর একদিন বালির তীরে বেচারীকে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। দারুণ চোট খেয়েছিল। জলে টেনে নামাতে হিমশিম খেয়েছিলাম আমি। জলের ডলফিন ডাঙায় উঠলে যে কত ভারী হয়, তা তো আর জানো না। জলে নামলে সব কিছুই হাল্কা হয়ে যায়। কত সহজভাবে বেঁচে থাকা যায় জলের মধ্যে তা যদি জানতে। যাই হোক, ডলফিনটাকে জলে তো নামালাম। ও মা, বেচারা আর সাঁতরাতে পারে না! তখন তাকে খাওয়ানোর ভারও পড়ল আমার ওপর। মাছ ধরে এনে খাওয়াতাম। একমাস খানা জোগাতে হয়েছে। একমাস পরে শুধু পোষ মানাই নয়, বেচারা দারুণ ন্যাওটা হয়ে পড়ল আমার। অন্যান্য ডলফিনেরাও চিনে গেছিল আমাকে। রোদের নিচে ডলফিনদের সঙ্গে ঢেউয়ের ওপর নাচানাচি করার মত মজা আর নেই। জলের নিচেও সমান মজা। মনে হয় যেন গাঢ় নীল বাতাস কেটে সাঁতার দিচ্ছি। শরীর পালকের মত হাল্কা হয়ে যায়। শরীর বলে যে একটা কিছু আছে, মনেই থাকে না। জলের মধ্যে আমার বন্ধুর শেষ নেই। তোমরা যেমন পাখীকে খেতে দাও, আমি তেমনি ছোট ছোট মাছদের নিজের হাতে খেতে দিই।'

'তোমার শত্রু নেই?'

'আছে। হাঙর আর অক্টোপাসরাই আমার শত্রু। কিন্তু ওদের ভয় করি না। ছুরী তো সঙ্গেই থাকে।'

'যদি চুপি চুপি ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে?' অবাক চোখে তাকায় ইকথিয়ানডার।

'তাও কি হয়, অনেক দূর থেকেই তো আমি শুনতে পাই।'

'শুনতে পাও?' এবার ক্রিষ্টোর অবাক হবার পালা। 'ঘাপটি মেরে এলেও শুনতে পাও?'

'সত্যি পাই। এতে অবাক হবার কি আছে বুঝি না। কান দিয়ে তো বটেই, সমস্ত শরীর দিয়ে শুনতে পাই ওদের এগিয়ে আসা। ওরা এলেই জলে

কাঁপন ওঠে—সে কাঁপন ছোটে আগে আগে। আমি সেই কাঁপন অনুভব করে হুঁশিয়ার হয়ে যাই।'

'ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও?'

'আলবৎ।'

'কিন্তু মাছেরা তো পার পায় না?'

'মাছেরা পেরে ওঠে না কারণ তারা দুর্বল। সবল মাছ দুর্বল মাছকে কাবু করে ফেলে। কিন্তু আমার শক্তি ওদের সবার ওপরে। শিকারী মাছরা তা জানে বলেই আমাকে ঘাঁটাতে সাহস করে না।'

জুরিটা ঠিকই বলেছে। এ ছোকরাকে পোষ মানাতে পারলে খরচ পুষিয়ে যাবে, ভাবে ক্রিস্টো। তাছাড়া, ছোঁড়া বলে কি? সমস্ত শরীর দিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও যে শুনতে পায়, তাকে কি জাল ফেলে ধরা যায়? নাঃ, খবরটা জুরিটাকে জানিয়ে রাখা দরকার।

ইক্‌থিয়ানডার বলছিল—'সাগরের নিচে আশ্চর্য দুনিয়া যে কত সুন্দর, তা আমি তোমায় বলে বোঝাতে পারব না। সাগরের তলা ছেড়ে তোমাদের এই ধুলোভরা দম আটকানো ডাঙায় আমি কখ্‌খনো আসবো না।'

'সে কি কথা! ডাঙাতেই যে তোমার জন্ম, তাই না? তোমার মা কই?'

'মা···ইয়ে···তা তো জানি না,' আমতা আমতা করে ইক্‌থিয়ানডার। 'বাবার মুখে শুনেছি আমি জন্মাবার পরেই মা মারা গেছেন।'

'কিন্তু তিনি নিশ্চয় ডাঙার মেয়ে ছিলেন, মাছ নয়। কেমন?'

'তা হবে,' সায় দেয় ইক্‌থিয়ানডার।

হেসে উঠলো ক্রিস্টো।

বলল—'এবার বলো দিকি, কেন জেলে বেচারীদের ওপর অত অত্যাচার করো? কেনই বা ওদের জাল কেটে দাও, আর কেনই বা বেচারীদের ধরা মাছ জলে ফেলে দাও?'

'কারণ, ওদের পেটে যা ধরে, তার চাইতেও বেশ মাছ ধরে বলে।'

'কিন্তু মাছ ধরে বেচবার জন্যে।'

বুঝতে পারে না ইক্‌থিয়ানডার।

বুঝিয়ে দেয় ক্রিস্টো—'বিক্রী না করলে ডাঙার বাকী লোকেরা মাছ খাবে কেমন করে?'

'ডাঙায় এত লোক থাকে কেন? থাকলেও সেই মত পশুপাখী নেই কেন? ডাঙা ছেড়ে সাগরে আসার কি দরকার শুনি?'

হাই তুলতে তুলতে বলে ক্রিস্টো—'সে বড় জটিল ব্যাপার। চট করে বোঝানো মুস্কিল। এখন ঘুমোও দিকি, রাত হল। চৌবাচ্চায় ঢুকলে কিন্তু বাবাকে বলে দেব।'

ভোরবেলা ক্রিস্টো এসেই দেখে ঘর ফাঁকা। ইক্‌থিয়ানডার নেই। চৌবাচ্চা

থেকে খানিকটা জল ছলকে পড়েছে মেঝের ওপর।

গজগজ করতে থাকে ক্রিস্টো। আবার অবাধ্যতা। বিছানায় না ঘুমিয়ে আবার চৌবাচ্চায় রাত কাটিয়েছে ইক্‌থিয়ানডার।

সেদিন প্রাতরাশ খেতে বেলা করেই ফিরল ইক্‌থিয়ানডার। প্লেটের ওপর অস্থির হাতে কাঁটা চামচ নাড়ানো দেখে মনে হল মন খুব চঞ্চল।

একবার শুধু মুখ গোঁজ করে বললে—'আবার মাংসের রোস্ট।' কঠিন কণ্ঠে ক্রিস্টো জবাব দিলে—'হ্যাঁ, মাংসের রোস্ট। ডাক্তারবাবুর যা হুকুম, তাই দেওয়া হয়েছে। আবার কাঁচা মাছ খাওয়া ধরেছ মনে হচ্ছে। এর পরে কিন্তু রোস্ট আর ছুঁতেও পারবে না, খাওয়া তো দূরের কথা। কাল রাতে আবার চৌবাচ্চায় ঘুমিয়েছ। আবার পাঁজরায় ব্যথা উঠবে। ব্রেকফাস্ট খেতেও এত দেরী। এত অনাচার সইবে না। ডাক্তারবাবু ফিরে এলেই সমস্ত বলব আমি। কোনো কথাই আজকাল কানে তুলছ না তুমি।'

'না না, ক্রিস্টো, বাবাকে বলো না। শুনলে উনি দুঃখ পাবেন, মন খারাপ হয়ে যাবে,' মাথা নাড়তে নাড়তে আবার চিন্তার গহনে তলিয়ে যাবে ইক্‌থিয়ানডার। তারপরেই আচমকা বড় বড় বিষণ্ণ দুই চোখ তুলে ধরে বললে—'জানো ক্রিস্টো, আজ ভোরে ভারী সুন্দর একটা মেয়ে দেখেছি। এমন সুন্দর যে কেউ হতে পারে, না দেখলে বোঝা যায় না। জলের মধ্যেও এমন রূপ কখনো দেখিনি।'

'তাহলে আমাদের ডাঙা খুব খারাপ নয় বলো ?'

'ডলফিনের পিঠে বসেছিলাম, এমন সময়ে বিউনোআয়ার্সের কাছে তীরের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম মেয়েটাকে। নীল-নীল চোখ তার, সোনার মত চুল। কিন্তু আমাকে দেখেই ভয়ে পাঙাসপানা হয়ে গেল······এক দৌড়ে পালিয়ে গেল। কেন যে ছাই তক্ষুনি গগল্‌স্‌ আর দস্তানা জোড়া খুলে নিইনি।' মুখ নিচু করে গুম হয়ে রইল ইক্‌থিয়ানডার। একটু পরে বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে—'একবার একটা মেয়েকে জল থেকে তুলে ডাঙায় রেখে এসেছিলাম, ভাল করে তখন লক্ষ্য করিনি কি রকম দেখতে তাকে। জানি না, এই মেয়েটাই সে কিনা। যদ্দুর মনে পড়ে, তারও সোনালী চুল ছিল। হ্যাঁ······ছিল······।' আবার উন্মনা হয়ে যায় ইক্‌থিয়ানডার। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ গিয়ে দাঁড়ায় আয়নার সামনে। জীবনে এই প্রথম খুঁটিয়ে দেখতে থাকে নিজেকে।

'মেয়েটা পালানোর পর কি করলে তুমি ?'

'আবার যদি ফিরে আসে, সেই আশায় অপেক্ষা করলাম। কিন্তু আর সে এল না। ক্রিস্টো, একদিনের জন্যও আর কি সে আসবে না ?'

চতুর চূড়ামণি ক্রিস্টো তখন নিজের চিন্তায় মশগুল। পাওয়া গেছে, জবর টোপের সন্ধান পাওয়া গেছে। মেয়েটাকে ইক্‌থিয়ানডারের যখন এতই মনে ধরেছে, তখন ভুলিয়ে-ভালিয়ে একবার বিউনোআয়ার্সে নিয়ে ফেলতে পারলে হল। জুরিটা তো সেখানে ওৎ পেতেই রয়েছে।

মুখে বললে—'তা আসতে পারে। আমিও চেষ্টা করব তোমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার। শহরের পোশাক পরে আমার সঙ্গে বিউনোআয়ার্সে যাবে—সেখানেই খোঁজ করা যাবে তার।'

'তার দেখা পাবো?' মুহূর্তে আনন্দে আটখানা হয়ে যায় ইক্‌থিয়ানডার।

'শহরে অনেক মেয়ে আছে তো। তোমার কপাল ভাল হলে তার দেখা নিশ্চয় পাবে।'

'তাহলে চলো, এইুনি বেরোনো যাক। আমি ডলফিনে যাচ্ছি, তুমি তীর বরাবর হেঁটে এসো।'

'এত বেলায়? না, না। তাছাড়া, বিউনোআয়ার্স জায়গাটা তো খুব কাছে নয়।'

'তাতে কি হয়েছে? ঠিক পৌঁছ যাব।'

'আজ আর না। কাল ভোরবেলা বেরুবো। তুমি সাঁতরে গিয়ে তীরের কাছে অপেক্ষা করবে, আমি জামা কাপড় নিয়ে যাবো। সে সব জোগাড় করতেই আজকের দিন ফুরোবে।' তাছাড়া ভায়াকেও খবর দিতে হবে তো, মনে মনে ভাবে ক্রিস্টো। 'কাল ভোরবেলা দেখা হবে, কেমন?'

## শহরে

পরের দিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই জলে ডুব দিল ইকথিয়ানডার। ক্রিস্টো আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল তীরে। হাতে সাদা স্যুট। বিরস নয়নে স্যুটটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল ইক্‌থিয়ানডার। ভাবসাব দেখে মনে হল, প্যান্টকোট তো নয়, যেন একটা সাপের খোলসই এনে হাজির করেছে ক্রিস্টো।

যাই হোক, ব্যাজার মুখে ধড়াচূড়ো এঁটে নিলে সে। ক্রিস্টো বুঝল, এই প্রথম নয়, এর আগেও বার কয়েক পোশাক পরার দুর্ভোগ তাকে পোহাতে হয়েছে। নেকটাইটা ঠিক করে বেঁধে দিলে ক্রিস্টো। তারপর আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে—'চলো, যাওয়া যাক।'

ইক্‌থিয়ানডারের বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্যে ইচ্ছে করেই ঘুরে ঘুরে চলল ক্রিস্টো। বড় বড় রাজপথ, টাউন হল, আর শহরের জনবহুল অঞ্চলে নিয়ে গেল তাকে।

কিন্তু এত করেও ভেস্তে গেল সব, রোদের তাপে, শহরের গোলমালে, গাড়ী-ঘোড়া পথচারীর হট্টগোলে, ধুলোয়, ধোঁয়ায় উদ্‌ভ্রান্তের মত হয়ে গেল ইক্‌থিয়ান-ডার। রাস্তায় মেয়ে দেখলেই লাফিয়ে উঠতে লাগল বারবার। 'ঐ যে, ক্রিস্টো; ঐ……ঐ!' কিন্তু পরমুহূর্তেই মুষড়ে পড়তে লাগল পথচারিণীর মুখ দেখে। আবার উদ্বেগাকুল চোখে খুঁজতে লাগল ভীড়ের মধ্যে।

দুপুরের দিকে রোদের হল্কা অসহ্য হয়ে উঠল। লাঞ্চ খাওয়ার জন্যে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল ক্রিষ্টো। অবস্থা আরো কাহিল হয়ে পড়ল ইক্‌থিয়ান-ডারের। একে ছোট ঘর, ভীড়ে ঠাসা। তার ওপর চুরুটের ধোঁয়ায় দম আটকে আসতে লাগল ইকথিয়ানডারের। খেতে বসে লোকগুলোর বকবকানির বিরাম নেই। খবরের কাগজ নিয়ে গলা ফাটিয়ে আলোচনার একবর্ণও বুঝতে পারছিল না ইক্‌থিয়ানডার। বেশ খানিকটা বরফ ঠাণ্ডা জল পান করল সে—কিন্তু খাবারে হাত দিল না।

বললে বিমর্ষ গলায়—'মানুষের এই ঘূর্ণিপাকে মেয়ে খোঁজার চাইতে সমুদ্রে মাছ খোঁজাও অনেক সহজ। কী নোংরা শহর তোমাদের। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে আমার। পাঁজর টনটন করছে ক্রিষ্টো, আমি বাড়ী যাবো।'

'বেশ তো। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে একবারটি দেখা করে বাড়ী যাবো।'

'আমি আর কারো সঙ্গে দেখা করতে চাই না।'

'ফেরার পথেই বন্ধুর বাড়ী। এক মিনিটও লাগবে না। এসো।'

বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল ক্রিষ্টো। গনগনে আগুনের মত রৌদ্রতপ্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে আধমরার মত ধুঁকতে লাগল ইকথিয়ানডার। মাথা ঝুলে পড়ল বুকের ওপর, অতি কষ্টে শ্বাস টেনে টেনে এগিয়ে চলল ক্রিষ্টোর পাশে। রাস্তার দুধারে ক্যাকটাসের সারি বসানো সাদা পাথরের বাড়ী আর পীচ-অলিভের বাগান ছাড়িয়ে নিউপোর্টে বালতাসারের আস্তানায় পেঁছোলো দুজনে।

সমুদ্রের তাজা লোনা বাতাস নাসারন্ধ্রে উগ্র হয়ে উঠতেই ইক্‌থিয়ানডারের প্রবল ইচ্ছা হল জামাকাপড় টান মেরে ফেলে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপ দেয় ঢেউয়ের মধ্যে।

শঙ্কিত চোখে ক্রিষ্টো বললে—'এসে গেছি।'

রেল লাইন পার হয়ে কয়েকটা ধাপ নেমে ছোট্ট একটা অন্ধকার দোকানে ঢুকে পড়ল দুজনে।

অন্ধকারে চোখ সয়ে গেলে চারপাশের জিনিসপত্র দেখে অবাক হয়ে গেল ইক্‌থিয়ানডার। দোকান তো নয়, যেন সমুদ্রেরই একটা কোণ। নানারকম ঝিনুক শামুক শাঁখে ভরা সব কটা তাক আর ঘরের মেঝে। কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে প্রবালের মালা, তারা মাছ, শুকনো কাঁকড়া, আর পেটে খড়পোড়া মাছ। কাউণ্টারের আকারে সাজানো কাঁচের শো-কেসে রকমারি মুক্তো। গোলাপী মুক্তোগুলোকে ডুবুরীরা বলে 'পরীর নরম গা।' এ হেন পরিবেশে এসে অনেকটা স্বস্তিবোধ করে ইক্‌থিয়ানডার।

পুরোনো মচমচে একটা চেয়ারে তাকে বসিয়ে ক্রিষ্টো বললে—'একটু জিরিয়ে নাও—ঠাণ্ডা ঘর, বাইরের গরম এখানে নেই।'

'বালতাসার! গুটিয়েরে!' হাঁক দেয় ক্রিষ্টো।

'ক্রিষ্টো নাকি?' দরজার ওপার থেকে আসে কার কণ্ঠ। 'ভেতরে এসো।'

মাথা নিচু করে পাশের ঘরে প্রবেশ করে ক্রিস্টো।

ঘরটা বালতাসারের ল্যাবরেটরী। এই ঘরেই ম্যাড়মেড়ে মুক্তোর লুপ্ত চাকচিক্য ফিরিয়ে আনে বালতাসার। সাগরের স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের জন্য ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে যায় মুক্তোর। জল মিশানো এ্যাসিডে ডুবিয়ে রাখলেই ফিরে আসে হারানো দ্যুতি। অনেক উঁচুতে একটি মাত্র জানলা দিয়ে ক্ষীণ আলো আসছে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে বহু ব্যবহৃত একটা সেকেলে টেবিলের ওপর সাজানো কাঁচের জলাধার আর ফ্লাস্ক।

'কি খবর ভায়া? গুটিয়েরে কোথায়?'

'লোহার খোঁজে পাশের বাড়ী গেছে। ফিতে আর লেস নিয়েই মলো মেয়েটা। এখুনি এসে পড়বে।'

'জুরিটার খবর কি?' অধীরভাবে জানতে চায় ক্রিস্টো।

'এখনো তো পাত্তা নেই। কাল খুব একচোট হয়ে গেছে আমার সঙ্গে।'

'গুটিয়েরে-কে নিয়ে?'

'হ্যাঁ। গুটিয়েরের জন্যে পাগল সে। গায়ে হাত-ফাত দিতে গেছিল বোধ হয়, চড়-চাপড় খেয়ে আমার কাছে এসে ঝাল ঝাড়ছে। আরে আমি কি করব? ওর ধারণা, ওর মত পাত্র নাকি হাজারে একটা মেলে। স্কুনারের মালিক, এতগুলো ডুবুরীর অন্নদাতা। সুতরাং রেড-ইণ্ডিয়ান মেয়ে মাত্রই তার বউ হওয়ার জন্যে পাগল। এদিকে গুটিয়েরে তো নাম শুনলেই তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে।' গজ গজ করতে করতে আরও কয়েকটা নতুন মুক্তো এ্যাসিডের মধ্যে ফেলল বালতাসার। 'আছে ধারে কাছে কোথাও। মদ গিলে মেজাজ ঠাণ্ডা করছে।'

'কিন্তু আমি এখন করি কি?'

'কেন, তাকে এনেছো নাকি?'

'ঐ তো সে, বাইরের ঘরে।'

এক লাফে উঠে এসে কোমর বেঁকিয়ে চাবীর গর্তে চোখ রাখল বালতাসার।

'কই? দেখছি না তো?'

'কাউণ্টারে বসে রয়েছে।'

'নেই। শুধু গুটিয়েরেকে দেখছি।'

এক ধাক্কায় দু'হাট করে দরজা খুলে ধরল বালতাসার—পেছন পেছন চৌকাঠ পেরিয়ে এল ক্রিস্টো।

ইক্‌থিয়ানডার ঘরে নেই। অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণে দাঁড়িয়ে গুটিয়েরে—বালতাসারের পালিতা কন্যা। শুধু নিউপোর্টে নয়, দূর অঞ্চলেও গুটিয়েরের রূপের খ্যাতি ছড়িয়েছে। লাজুক মেয়ে, কিন্তু বুদ্ধিমতী। প্রেমপাগল কোনো যুবককেই ধারে কাছে ঘেঁসতে দেয়না। কতজন যে তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব জানিয়েছে এবং কতজনকে পত্রপাঠ হাঁকিয়েছে, তার হিসেব নেই।

এই গুটিয়েরেকে একদিন দেখেই মজেছে পেড্রো জুরিটা। তারপর থেকেই

লেগে রয়েছে আঠার মত। বউ যদি করতে হয় তো এমনি মেয়েকেই করতে হবে—পণ করেছে সে। বালতাসারও নারাজ নয় তার মত পায়ের শ্বশুর হতে।

কিন্তু বাদ সেধেছে গুটিয়েরে, অনুরোধ উপরোধ তর্জন গর্জন সবই বিফলে গেছে। গুটিয়েরের 'না' আর টলেনি।

বাবা আর জ্যেঠা চৌকাঠ পেরিয়ে এল—কিন্তু তখনও এককোণে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল গুটিয়েরে। স্বচ্ছ ললাটে চিন্তার আবিলতা।

'গুটিয়েরে, খবর কি রে ?' শুধোয় ক্রিস্টো।

'সে ছোকরা গেল কোথায় ?' জানতে চায় বালতাসার।

'ছেলে ছোকরাদের ট্যাকে লুকিয়ে রাখাটা আমার স্বভাব নয়,' তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে গুটিয়েরে। ঠোঁটের কোণে পাতলা হাসি বিছিয়ে বললে—'ঘরে ঢুকেই দেখি আদেখলার মত ড্যাবড্যাব করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ছেলেটা। অদ্ভুত চাউনি। চোখ দেখে মনে হল যেন ভূত দেখেছে। তারপরেই আস্তে আস্তে দাঁড়িয়ে উঠে দুহাতে এমন ভাবে গলা আঁকড়ে ধরলে যেন দম আটকে আসছে। অতশত আমি বুঝিনি। বুঝতে যখন পারলাম, তখন সে সিঁড়ি টপকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।'

বটে, গুটিয়েরেই তাহলে সেই মেয়ে, মনে মনে হাসে ক্রিস্টো।

## আবার সমুদ্রে

উঃ, কি কষ্ট ! ফুসফুসটা যেন ফেটে পড়তে চাইছে। হাপরের মত হাঁপাতে হাঁপাতে তবু দৌড়োতে লাগল ইকথিয়ানডার। সমুদ্রের ধার বরাবর যে রাস্তাটা চলে গেছে শহরের বাইরে, ছুটতে ছুটতে সেই রাস্তা ধরে লোকালয় পেরিয়ে আসতেই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। নেমে এল বালুকাবেলায়। জামাকাপড় খুলে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রাখল। তারপর দৌড়োতে দৌড়োতে নেমে গেল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ জলরাশির মধ্যে।

শরীরে বুঝি আর এক বিন্দুও শক্তি নেই। তা সত্ত্বেও এমন বেগে কখনো সাঁতার কাটেনি ইক্‌থিয়ানডার। ওর দুরন্ত বেগের সামনে দারুণ ভয়ে পথ ছেড়ে ছিটকে সরে যেতে লাগল ছোটখাটো মাছগুলো।

শহর থেকে মাইল কয়েক দূরে আসার পর আবার কমে এল গতিবেগ। ধীরে ধীরে ভেসে এল উপকূলের দিকে। অচেনা জগৎ ছেড়ে আবার চেনা জগতে ফিরে এসেছে ইক্‌থিয়ানডার। এখানকার সব কিছুই তার নখদর্পণে। সমুদ্রের তলদেশে প্রতিটি পাথর, প্রতিটি খাঁজের সঙ্গে তার পরিচয় দীর্ঘদিনের। ঠিক নিচেই সমতলভূমির ওপর বালি বিছানো। বালির ওপর খেলা করছে প্রশান্ত সৌম্য চেহারার টারবট মাছের ঝাঁক—পায়রা-চাঁদার মত আকার—কিন্তু তার চাইতেও বড়। ওদিকে লাল প্রবালের ঘন ঝোপ—লাল পাখনাওলা

মাছগুলোর শুকোনোর জায়গা। মাছধরার যে নৌকোটা অনেকদিন ধরেই পড়ে রয়েছে সাগরতলে, অক্টোপাশের দু'দুটো পরিবার ডেরা নিয়েছে তার খোলে। সম্প্রতি তাদের কিছু বাচ্চাকাচ্ছাও হয়েছে। ঐ যে ধোঁয়াটে পাথর-গুলো, ওদের আড়ালে ঘাপটি মেরে রয়েছে কশেত রাক্ষুসে কাঁকড়া। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছে ইক্‌থিয়ানডার, কখনো ক্লান্তিবোধ করেনি। তারও ওদিকে অসংখ্য অগণিত শুক্তির জন্মভূমি।

উপসাগরের কাছাকাছি এসে জলের ওপর মাথা তুলল ইক্‌থিয়ানডার। কিছু দূরেই ঢেউয়ের তালে তালে নেচে খেলা করছে এক দঙ্গল ডলফিন মাছ। হাঁক দিল ইক্‌থিয়ানডার। একটা মস্ত ডলফিন ঘোঁৎ করে সারা দিলে। পরক্ষণেই জল তোলপাড় করে সিধে ছুটে আসতে লাগল ইক্‌থিয়ানডারকে লক্ষ্য করে। উত্তাল ঢেউয়ের আড়ালে মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল তার চকচকে কালো পিচ্ছিল পিঠ।

'চটপট, লীডিং, চটপট!' ইক্‌থিয়ানডারও জল কেটে এগিয়ে যেতে যেতে চেঁচিয়ে ওঠে সহর্ষে। কাছে গিয়ে ডলফিনের পিঠে এক হাত রাখে—গতি মন্থর না করেই বলে আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে—'চলো যাই বাইরে!'

হাতের ইসারা বুঝতে পারে ডলফিন, অনুগত সঙ্গীর মত তৎক্ষণাৎ ঘুরে যায় খোলা সাগরের দিকে। ল্যাজের ঘায়ে জল তোলপাড় হয়ে যায়—ফেনিল জল রেখা পেছনে রেখে অবিশ্বাস্য বেগে ছুটতে থাকে প্রতিকূল হাওয়া আর ঢেউ ছিন্নভিন্ন করে। কিন্তু মন ওঠে না ইক্‌থিয়ানডারের। সমানে পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে হাঁক দিতে থাকে—'লীডিং, আরো জোরে, আরো জোরে!'

এবার কামারশালার হাপরের মত উঠতে পড়তে থাকে ডলফিনের দুই পাঁজর। কিন্তু আচম্বিতে প্রতিযোগিতায় দাঁড়ি টেনে দেয় ইকথিয়ানডার। লীডিংয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েও, কই, মনের আগুন তো নিভছে না, বুকটা যে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। সুট করে ডলফিনের ওপর থেকে পিছলে নেমে পড়ে সে—পড়েই তলিয়ে যায়। হতভম্বের মত থমকে গিয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে লীডিং। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে মনিব-বন্ধুর জন্যে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে অসন্তোষ প্রকাশ করে, ডুব দেয়। আবার ভেসে ওঠে। আবার ঘোঁৎ করে ওঠে। পরমুহূর্তেই বোঁ করে ঘুরে গিয়ে ফিরে চলে তীরের দিকে। যেতে যেতে বার বার পেছন ফেরে, দেখে, আবার লেজের ঝাপটায় ঘুরে গিয়ে এগোয়। উভচর ইক্‌থিয়ান-ডারের টিকি দেখা যায় না ধারে কাছে। কাজেই আবার নিজের দলে ভিড়ে যায় লীডিং।

আর ক্রমাগত গোঁৎ খেয়ে নামতে থাকে ইক্‌থিয়ানডার। নিচে, নিচে, নিচে, আরো নিচে, অশান্ত উদ্বেল মনে সে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চায়। তাই বিদ্যুৎরেখার মতই নেমে যেতে থাকে সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে, সাগরের নিভৃত অঞ্চলে গিয়ে একলা হতে চায় ইক্‌থিয়ানডার। গভীরে ডুব দেওয়ার ভয়াবহ

বিপদাশংকাও উঁকি দেয় না মনের মধ্যে। বিপদ আসে আসুক। একলাটি বসে ইক্‌থিয়ানডার আজ ভেবে দেখবে কেন আর সবার চাইতে সে এত পৃথক, কেন সে ডাঙায় আর সমুদ্রে আজও অনাত্মীয়, অপরিচিত, আগন্তুক।

জল ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে। গতি মন্থর হয় ইক্‌থিয়ানডারের। সমস্ত শরীরের ওপর জলের চাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে শ্বাস নিতে। ধোঁয়াটে-সবুজ চাদরে ঢাকা যেন চারিদিক। এত নিচে সে জীবনে নামেনি। এ রাজ্যের সব কিছুই তার প্রায় অচেনা। পরিচিত সামুদ্রিক প্রাণীদের কাউকেই চোখে পড়ে না। নিস্তব্ধ ধূসর নিথর এই জগতের বিভীষিকা এই প্রথম ভয় পাইয়ে দেয় ইক্‌থিয়ানডারকে। নিদারুণ আতংকে চকিতে ঘুরে যায়। মাথা ওপরে তুলে ফিরে চলে তীরের দিকে। সূর্য ডুবছে। তির্যক লোহিত রশ্মি মিশেছে সাগরের নীল জলে—লাল আর নীলের মাঝে গোলাপী আর সবুজ আভা। অপূর্ব!

ইক্‌থিয়ানডারের চোখে আজ গগল্‌স্‌ নেই, তাই মাছের চোখে জলের উপরিভাগ যেমন দেখায়, ইক্‌থিয়ানডারের চোখেও তাই মনে হল। যেন একটা সুবিশাল ফানেলের নিচের ডগায় রয়েছে। চারপাশের জল শঙ্কুর মত উঠে গেছে ওপরে। ফানেলের পরিধিতে বিচিত্র রঙের বলয়, লাল, হলদে, সবুজ, নীল আর বেগুনি। বলয়ের ওপাশে সমুদ্রের ওপরিভাগ যেন চকচকে আয়না। নিচের জলজ গুল্ম, মাছ আর পাথরের প্রতিবিম্ব ভাসছে সেখানে। তীরের কাছে গলাজলে দাঁড়িয়ে একজন জেলে। কিন্তু জলের নিচ থেকে ইক্‌থিয়ানডার তার মাথা দেখতে পেল না। দেখল মস্তকহীন যমজ কবন্ধ—কাঁধের ওপর কাঁধ দিয়ে দাঁড়িয়ে। সমুদ্র-দর্পণের এই কারসাজি দেখে এর আগে ইক্‌থিয়ানডার কতই না হেসেছে। কিন্তু আজ আর সে মেজাজ নেই। বরং ঐ ভৌতিক দৃশ্য মনটাকে আরো বিষিয়ে তোলে। মনে পড়ে যায় নোংরা শহরটার কথা। কি বিশ্রী সিগারের ধোঁয়া! আর কি হট্টগোল! ছিঃ, ছিঃ, এর চাইতে ডলফিনেরা অনেক ভাল। পরিচ্ছন্ন। একটা কথা মনে পড়তে হাসি পায় ইক্‌থিয়ানডারের। একবার ডলফিলনের দুধ খেঁয়েছিল সে। ভারী মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেদিন।

দক্ষিণ অঞ্চলে সমুদ্রের তলায় খিলানের মত পাহাড়ের ছাদ আর নিচে বালির শয্যার মাঝে সুপরিসর অথচ ভারী নিরালা একটা গহ্বর আবিষ্কার করেছিল ইক্‌থিয়ানডার। একটা মাদী ডলফিন বাচ্ছাকাচ্ছা নিয়ে থাকত সেখানে। দুদিনেই ভাব জমিয়ে ফেলেছিল ইক্‌থিয়াডার। বাচ্ছাগুলোর সঙ্গে খেলা করত, মাছ খাওয়াত, দূর থেকে আসবার সময়ে খোকা-অক্টোপাসও ধরে নিয়ে আসত।

মা-ডলফিনের পেটের নিচে গিয়ে স্তনবৃন্তে মুখ রেখে দুধ খেত বাচ্ছাগুলো। রোজ দেখতে দেখতে একদিন ইক্‌য়িানডারেরও সখ হল দুধ খাওয়ার।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। তৎক্ষণাৎ মা-ডলফিনের তলায় গিয়ে দুহাতে তাকে আঁকড়ে ধরে স্তনবৃন্তে মুখ দিয়েছিল ইক্‌থিয়ানডার।

আর যায় কোথা ! এক সেকেণ্ড আগেও দিব্বি নিশ্চিন্ত মনে বাচ্ছাদের দুধ খাওয়াচ্ছিল যে ডলফিন, আচমকা আতংকে সে দিগবিদিকজ্ঞান হারিয়ে ছুটল আস্তানার বাইরে।

এক মুখ দুধ টেনে নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে সরে এসেছিল ইক্থিয়ানডার। বিশ্রী স্বাদ। আঁশটে মেছো গন্ধ।

ভয়ের চোটে বাচ্ছাগুলোও ছুটোছুটি করতে থাকে গহ্বরের মধ্যে। অনেকক্ষণ পরে মা ফিরে এসে তাদের নিয়ে রওনা হল পাশের একটা গহ্বরে। বেশ কিছুদিন পর্যন্ত এদের সঙ্গে আর বনিবনা হয়নি ইক্থিয়ানডারের। তারপরে অবশ্য অবার সব ঠিক হয়ে যায়।

এদিকে ভেবে ভেবে ক্রিস্টো পাগল হবার জোগাড়। উদ্বেগ হওয়া স্বাভাবিক। তিনদিন তিনরাত পাত্তা নেই ইক্থিয়ানডারের।

তারপরেই আচম্বিতে ধূমকেতুর মত এসে হাজির একদিন। শুকনো মুখ, ক্লান্ত, অবসন্ন, কিন্তু প্রসন্ন মুখচ্ছবি।

'কোথায় ছিলে অ্যাদ্দিন ?' কড়া গলায় ধমকে ওঠে ক্রিস্টো। কণ্ঠে রুক্ষতা আনলেও অন্তরে তার আনন্দের সীমা পরিসীমা নেই। সব উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে ফিরে এসেছে ইক্থিয়ানডার।

'সাগরের নিচে।'

'এত ফ্যাকাশে কেন ?'

আমি······ইয়ে······মরতে মরতে বেঁচে গেছি,' জীবনে এই প্রথম মিথ্যে বলে ইক্থিয়ানডার এবং কিছুদিন আগেকার একটা ঘটনাই সাড়ম্বরে শুনিয়ে দেয় ক্রিস্টোকে।

সাগরের নিচে একটা বিশাল গহ্বর আছে। অনেকটা অতিকায় জামবাটির মত। চারিদিকে উঁচু পাহাড়ের বেড়। ঠিক যেন ডুবো পাহাড়ের হ্রদ। গহ্বরটা গোল নয়, ডিম্বাকৃতি।

পাশ দিয়ে যাচ্ছিল ইক্থিয়ানডার। ওপর থেকে গহ্বরের আশ্চর্য হাল্কা ধূসর রঙ দেখে খটকা লাগে। আরও নিচে নেমে আসতেই অবাক হয়ে যায়। পাথরের কিনারার ওপর দিয়ে সাঁতরাতে সাঁতরাতে দেখে এক অদ্ভুত দৃশ্য। গহ্বরের ভেতরে রাশি রাশি হাড়। সামুদ্রিক প্রাণীদের কবরখানা। কল্পনাতীত সেই গোরস্থানে ছোট মাছ থেকে শুরু করে হাঙর ডলফিন পর্যন্ত আছে। কয়েকটি মাছ তো সদ্য মরেছে। সব চাইতে আশ্চর্য কাণ্ড, মাংসখেকো মাছরাও ধারে কাছে নেই। মৃত্যু-নিথর সেই অভিশপ্ত গহ্বরের সর্বত্র যেন মরণের হাতছানি। ভুর-ভুর করে এখানে সেখানে উঠছে ছোট ছোট বুদবুদ। হেলতে দুলতে পথ করে নিচ্ছে ওপর পানে।

কিনারা বরাবর সাঁতার কাটতে কাটতে আরও একটু নিচে নামতে ইচ্ছে

হয়েছিল ইক্‌থিয়ানডারের। নেমেও ছিল। পরমুহূর্তেই নিঃসীম যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে উঠেছিল—যেন তপ্ত লোহার শলাকার ছ্যাঁকা লেগেছে কানকোজোড়ায়। আচমকা যেন পক্ষাঘাতের আক্রমণে অবশ হয়ে গেছিল সর্বশরীর, শক্তিহীন হয়ে গেছিল মাংসপেশী, প্রায় হতচৈতন্যের মত নেতিয়ে পড়েছিল কিনারার ওপর। উত্তাল হয়ে ওঠে হৃৎপিণ্ড, অবিরাম হাতুড়ির ঘায়ের দপদপানি আরম্ভ হয় ব্রহ্মতালুতে। বেশ বুঝতে পারে ইক্‌থিয়ানডার, একটু একটু করে জ্ঞান লোপ পাচ্ছে তার, এর পরেই মৃত্যু। চোখের সামনে ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে উঠতে থাকে লাল কুয়াশা…রক্ত কুয়াশার মধ্যে দিয়ে চোখে পড়ে আরো এক অদ্ভুত দৃশ্য। মাত্র কয়েক ফুট দূরেই অসীম যাতনায় পাকসাট খেতে খেতে গহ্বরের মধ্যে গড়িয়ে পড়েছে একটা হাঙর। ইক্‌থিয়ানডারের পাছু নিয়েছিল নিশ্চয়। ডুবো-হ্রদের মারণজলের সংস্পর্শে আসতেই সংজ্ঞা হারিয়ে গড়িয়ে পড়ছে কবরখানায়। আতংক-বিস্ফারিত চোখে ইক্‌থিয়ানডার দেখতে পায়, হাপরের মত ওঠানামা করছে পাঁজরা, হাঁ করা চোয়ালে সাদা দাঁতের ঝকঝকে সারি।

চোখের সামনে এরকম অসহায় মৃত্যু দেখে শিউড়ে ওঠে ইক্‌থিয়ানডার। দাঁতে দাঁত চেপে কোনমতে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়, হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা আসতে না আসতেই মাথা ঘুরে যায়। মুখ থুবড়ে পড়ে পাহাড়ের ওপর। আবার ওঠে, পায়ের ঠেলায় এগিয়ে যায় বেশ খানিকটা। গহ্বরের কিনারা থেকে ফুট দশেক তফাতে এসেই মরিয়ার মত সাঁতরে সরে যেতে থাকে দূরে… আরো দূরে।

গল্পের শেষে ক্রিস্টোর অবগতির জন্যে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও জুড়ে দেয় ইক্‌থিয়ানডার। ব্যাখ্যাটা অবশ্য বাবার কাছে এই ঘটনার পরে শোনা।

'বুঝলে ক্রিস্টো, খুব সম্ভব বছরের পর বছর ধরে হাইড্রোজেন সালফাইড অথবা কার্বন অ্যান্‌হাইড্রাইডের মত বিষাক্ত কিছু গ্যাস জমা হয়েছে কবরখানার ওপর। জলের ওপরে এলেই গ্যাসগুলো অক্সিডাইজড হয়ে যাচ্ছে বলে কারও ক্ষতি হচ্ছে না। কিন্তু জলের নিচে গহ্বরের ঠিক ওপরেই তা এমন মারাত্মক গাঢ় যে সংস্পর্শে এলেই মৃত্যু অনিবার্য। চুলোয় যাক সে সব কথা। ভীষণ খিদে পেয়েছে, ব্রেকফাস্ট আনো।'

গবগব করে নাকে মুখে গিলে উঠে পড়ল ইক্‌থিয়ানডার। গগল্‌স্‌ আর দস্তানা একটানে কাঁধে চাপিয়ে পা বাড়াল দরজার দিকে।

'ব্যাপার কি? জিনিস কটা নেওয়ার জন্যেই আসা হয়েছে মনে হচ্ছে? কি হয়েছে তোমার বলো তো?'

কিন্তু ইক্‌থিয়ানডার আর সে ইক্‌থিয়ানডার নেই। প্রাণখোলা ইক্‌থিয়ানডার আর আজকের চাপা ইক্‌থিয়ানডারে তফাৎ অনেক।

'ওকথা আর নাই বা জিজ্ঞেস করলে, ক্রিস্টো! আমি নিজেই জানি না আমার কি হয়েছে।' বলে সে উধাও হয় পরমুহূর্তে।

# প্রতিহিংসা কত মধুর

যার আশায় এতদূর আসা, তাকেই আচমকা সামনে দেখে দিশেহারা হয়ে গেছিল ইক্‌থিয়ানডার। ঝড়ের মতই বেরিয়ে গেছিল বালতাসারের দোকান ছেড়ে। জলে ঝাঁপ দিয়েও থামেনি—কি এক অজানিত বেদনায় পাগলের মতই সাঁতার কেটেছে গভীর হতে গভীরতর সমুদ্রে।

কিন্তু কদিন যেতে না যেতেই আবার উন্মনা হল ইক্‌থিয়ানডার। আর একবারটি তার পদ্মমুখ দেখার জন্যে অস্থির হয়ে পড়ল। কিন্তু কি করে যে তা সম্ভব তা তো জানে না ইক্‌থিয়ানডার, ক্রিস্টোর দ্বারস্থ হলে অবশ্য মুস্কিল আসান হয়। কিন্তু তার সামনে মেয়েটির সঙ্গে কি কথা কইতে পারবে ইক্‌থিয়ানডার? উঁহু। মনের কথা বলার সময়ে আর কেউ থাকলে চলবে না।

কাজেই প্রতিদিন ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই জলে ডুব দিত ইক্‌থিয়ানডার। প্রথম দেখার স্থানটিতে আসত। পাথরের আনাচে কানাচে ঘাপটি মেরে বসে থাকত তীর্থের কাকের মত। সন্ধ্যে না হওয়া পর্যন্ত নড়ত না।

মাঝে মাঝে উঠে আসত তীরে। লুকোনো জায়গা থেকে সাদা সুট বার করে সেজেগুজে বসে থাকত। প্রথমবারের মত আবার যেন তাকে দেখে না আঁৎকে ওঠে ডানাকাটা পরীর মত রূপসী।

অধিকাংশ দিনই ব্যর্থ প্রতীক্ষার পর তিরিক্ষে হয়ে যেত মেজাজ। সারারাত আর বাড়ী ফিরত না। মাছ আর শুক্তি খেয়ে জলে জলে কাটাত—চোখে ঘুম আসত না। ফিরত সেই ভোরে।

একদিন সন্ধ্যায় ইক্‌থিয়ানডার ঠিক করলে বালতাসারের দোকানে যেতে হবে। দরজা খোলাই ছিল। কিন্তু কাউন্টারে বসে একা বালতাসার।

মুখ চূণ করে ফিরে আসছে ইক্‌থিয়ানডার, এমন সময়ে টিলার ওপর চ্যাটালো জমির ওপর চোখ পড়তেই দেখা গেল একটি মেয়েকে, ফুরফুরে হাল্কা সাদা পোশাক। মাথায় স্ট্র হ্যাট।

হ্যাঁ, সে-ই বটে। দাঁড়িয়ে আছে কারও প্রতীক্ষায়। মাঝে মাঝে অস্থির অধীরভাবে পায়চারী করছে। বার বার তাকাচ্ছে রাস্তার দিকে। কাছে যেতে সাহসে কুলোলো না ইক্‌থিয়ানডারের। মেয়েটিও দেখতে পেল না তাকে। পাথুরে টিলার গোড়ায় দুরু-দুরু বুকে চোরের মত দাঁড়িয়ে রইল ইক্‌থিয়ানডার।

তারপরেই কার দিকে যেন হাত নাড়তে লাগল মেয়েটা। ঘুরে দাঁড়িয়ে ইক্‌থিয়ানডার দেখল, দিব্বি স্বাস্থ্যবান একজন জোয়ান উঠছে রাস্তা বেয়ে। দীর্ঘকায়, চওড়া কাঁধ। এরকম আশ্চর্য হালকা চুল আর চোখ জীবনে দেখেনি ইক্‌থিয়ানডার। হন হন করে মেয়েটির কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল দৈত্যাকার যুবক।

'হ্যাল্লো, গুটিয়েরে।'

'হ্যাল্লো, ওলসেন।'

গুটিয়েরের হাত ধরে বেশ জোরে ঝাঁকিয়ে দেয় ওলসেন।

বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে ইকথিয়ানডার।

'এসেছো?' বলে ওলসেন।

নীরবে ঘাড় হেলিয়ে সায় দেয় গুটিয়েরে।

'বাবা টের পাবেন না তো?' জিজ্ঞাসা করে ওলসেন।

'না। তাছাড়া মুক্তোগুলো যখন আমার সম্পত্তি, যখন খুসী আমি বেহাত করতে পারি।'

নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে টিলার একদম কিনারায় গিয়ে দাঁড়ায় দুই মূর্তি। ঠিক নিচেই সমুদ্র, গলা থেকে নেকলেসটা খুলে ফ্যালে গুটিয়েরে। একহাতে ঝুলিয়ে তুলে ধরে বলে সপ্রশংস কণ্ঠে—'পড়ন্ত সূর্যের আলোয় মুক্তোর মধ্যে কত রোশনাই-ই না দেখা যায়। নাও, ধরো।'

ওলসেন নেওয়ার জন্য হাত বাড়ায়। কিন্তু হঠাৎ গুটিয়েরের হাত ফসকে খসে পড়ে নেকলেসটা—টুপ করে জলে পড়েই তলিয়ে যায়।

'একী করলাম!' আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে গুটিয়েরে।

দুজনেই নিঃসীম হতাশায় নিশ্চুপ হয়ে পাথরের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে টিলার ওপর।

ওলসেন বলে—'খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে।'

'অসম্ভব, জল এখানে অনেক গভীর,' ম্লান মুখে বলে গুটিয়েরে।

ইক্‌থিয়ানডারের বুকটা মুচড়ে ওঠে। যাকে ভালবাসা যায়, তার এতটুকু কষ্টও যে শেল হয়ে বুকে বেঁধে। ইক্‌থিয়ানডার সেই মুহূর্তে সব ভুলে গেল। ভুলে গেল যে কণ্ঠহারটা উপহারস্বরূপ ওলসেনের হাতে তুলে দিচ্ছিল গুটিয়েরে। চুপচাপ আর কাঁহাতক দাঁড়িয়ে থাকা যায়। লম্বা লম্বা পা ফেলে টিলার ওপর উঠে এল ইক্‌থিয়ানডার।

ভুরু কুঁচকে তাকায় ওলসেন। কিন্তু নিবিড় বিস্ময় আর কৌতূহল ভেসে ওঠে গুটিয়েরের দুই চোখে। ছেলেটিকে সে চেনে। সেদিন বাবার দোকানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে উন্মাদের মত এই ছোকরাই না ছুটে বেরিয়ে গেছিল?

ইক্‌থিয়ানডার গুটিয়েরের চোখে চোখ রেখে বলে—'তোমার নেকসেলটা জলে পড়ে গেল দেখলাম। যদি বলো তো আমি জল থেকে তুলে আনতে পারি।'

'একাজ আমার বাবাও পারবে না। এ তল্লাটে আমার বাবার চাইতে বড় মুক্তো-ডুবুরী আর নেই,' একটু ঝাঁঝালো সুরেই জবাব দেয় গুটিয়েরে।

বিনীত কণ্ঠে ইকথিয়ানডার বলে—'আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।' বলেই যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকেই সিধে নিচের সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় কোটপ্যাণ্ট পরেই। চমকে ওঠে গুটিয়েরে আর ওলসেন। ইক্‌থিয়ানডার ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে জলের নিচে।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ওলসেন।

'ছেলেটা কে? মাটি ফুঁড়ে উঠে এলো নাকি?'

ধীরে ধীরে কেটে যায় এক মিনিট। কিন্তু তবুও পাত্তা নেই গায়ে-পড়া ছোকরার।

উদ্বিগ্ন চোখে ঢেউয়ের দিকে চেয়ে বিড় বিড় করে বলে গুটিয়েরে—'আমার জন্যেই বোধ হয় মলো ছেলেটা।'

ইক্‌থিয়ানডার যে জলের নিচে থাকতে পারে, এ তথ্য ওলসেন বা গুটিয়েরেকে জানানোর ইচ্ছে না থাকলেও সেই মুহূর্তে মুক্তো খোঁজার উৎসাহে সময়জ্ঞান রইল না। সাধারণ ডুবুরীর দম যতক্ষণ থাকে তার চাইতেও বেশী সময় ডুব দিয়ে থাকার পর জলের ওপর মাথা তুলল ইক্‌থিয়ানডার। হাসিমুখে বললে—'আর একটু ধৈর্য ধরো। খোঁচা খোঁচা পাথরে বোঝাই বলে একটু সময় লাগছে। এক্ষুনি খুঁজে দিচ্ছি।' বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার ডুব।

সারা জীবনে অনেক মুক্তো ডুবুরীর কেরামতি দেখেছে গুটিয়েরে, কিন্তু পুরো দু'মিনিট গভীর জলে থাকার পর উঠে এসে এমন সহজভাবে শ্বাস নিতে কাউকে দেখেনি। হাঁপানো তো দূরের কথা, মুখে এতটুকুও ক্লান্তিও নেই।

আবার দু'মিনিট যায়। এবার যখন উঠে আসে ইক্‌থিয়ানডার, তখন তার একহাতে মুক্তোর মালা আর চোখে মুখে বিজয় উল্লাস।

আগের মতই সহজভাবে শ্বাস নিতে নিতে চেঁচিয়ে বলে ইক্‌থিয়ানডার—'খোঁচা পাথরে আটকে ছিল। ফাঁকে ঢুকে গেলে মুস্কিল হত।' স্বচ্ছন্দ স্বর শুনে মনে হল যেন পাশের ঘর থেকে তুলে আনা হয়েছে মুক্তোর মালা, তাই তেমন পরিশ্রম হয়নি।

চটপট টিলার ওপর উঠে এসে গুটিয়েরের হাতে নেকলেসটা তুলে দিলে ইক-থিয়ানডার। বৃষ্টির মত জল ঝড়তে লাগল সাদা স্যুট বেয়ে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই পোশাকের মালিকের।

ধন্যবাদ জানিয়ে দ্বিগুণ কৌতূহলী চোখে ইক্‌থিয়ানডারের দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে তাকায় গুটিয়েরে।

ওলসেনকে দেখিয়ে ইক্‌থিয়ানডার বলে—'নেকলেসটা তুমি ওকেই দিচ্ছিলে না?'

লাল হয়ে ওঠে ওলসেনের চোখমুখ।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ,' থতমত খেয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় গুটিয়েরে। ওলসেনও নিরু-ত্তরে নেকলেসটা নিয়ে পকেটস্থ করে।

ছোট্ট এই প্রতিহিংসার ফলে মনের মেঘ কেটে যায় ইক্‌থিয়ানডারের। আনন্দে নেচে ওঠে অন্তর। গুটিয়েরের হাত থেকে নিলে কি হবে, ও নেকলেস তো ইক্‌থিয়ানডারই পাইয়ে দিল ওলসেনকে।

অতঃপর বাতাসে মাথা ঠুকে বিজয়ী বীরের মত গুটিয়েরেকে অভিবাদন

জানায় ইক্‌থিয়ানডার এবং পরমুহূর্তেই দ্রুতপায়ে নেমে যায় রাস্তা বেয়ে।

কিন্তু এই সুখানুভূতি বেশীক্ষণ রইল না। অচিরেই নতুন দুশ্চিন্তা কুরে কুরে খেতে লাগল মনটা। কে এই সুদর্শন তরুণ? টিলার কিনারায় দাঁড়িয়ে এত কিসের ফিসফাস কথা?

সে-রাতে ঘুম এলো না ইক্‌থিয়ানডারের চোখে। সারারাত ডলফিনের পিঠে চেপে জল তোলপাড় করে বেড়াল। ভৌতিক শঙ্খধ্বনির শব্দে আঁৎকে উঠল জেলেরা।

পরের দিন গভীর জলে শুধু গগল্‌স্‌ পরে দস্তানা খুলে রেখে মুক্তো খুঁজল ইক্‌থিয়ানডার। সন্ধ্যের সময়ে ফিরল বাড়ীতে। ক্রিস্টোর গজগজানি কানে না তুলে এক ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে আবার ভোরবেলায় গেল সেই পাথুরে টিলার কাছে। গুটিয়েরে এল সেই সন্ধ্যায়, সূর্য তখন ডুবছে।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ইক্‌থিয়ানডার। মাথা হেলিয়ে স্বাগত জানাল গুটিয়েরে।

'আমার পাত্থ নিয়েছ মনে হচ্ছে?' হাসিমুখে বলে গুটিয়েরে।

'তা নিয়েছি,' সরলভাবেই বলে ইক্‌থিয়ানডার। 'যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছি, সেদিন থেকেই।' বলেই অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে কান লাল করে ফেলে। 'সেদিন নেকলেসটা ওলসেনকে দেওয়ার আগে মুক্তোগুলোর তারিফ করছিলে। তুমি বুঝি মুক্তো খুব ভালবাস?'

'হ্যাঁ, বাসি।'

'তবে এই নাও······আমি দিচ্ছি।' বলে একটা মুক্তো এগিয়ে ধরে ইক্‌থিয়ানডার।

গুটিয়েরে মুক্তো চেনে। পাকা জহুরীর মত প্রথম শ্রেণীর মুক্তো বেছে নিতে পারে নুড়ির পাহাড় থেকে। কিন্তু ইক্‌থিয়ানডারের হাতের তালুতে বিচিত্র আভা ছড়িয়ে যে মুক্তোটা গুটিয়েরেকে চমকে দিল, তেমনটি সে জীবনে দেখেনি, বাবার কাছেও শোনেনি। আকার বিরাট, গড়ন সুন্দর, রঙ শ্বেতশুভ্র, ওজন কম-সেকম দুশো ক্যারেট। দাম অন্ততপক্ষে দশ লাখ সোনার 'পিসোস'।

বিমূঢ়ভাবে পর্যায়ক্রমে মুক্তো এবং আগন্তুক তরুণের পানে তাকায় গুটিয়েরে। বিচিত্রবেশী যুবক। কোট প্যাণ্টে ইস্ত্রীর বালাই নেই, দোমড়ানো কোঁচকানো, মলিন। হঠাৎ একদিন মাটি ফুঁড়ে উঠে হাসতে হাসতে জল থেকে তুলে এনেছিল মুক্তোর মালা। আর আজ বলা নেই কওয়া নেই সাত-সাগর ছেঁচা অমূল্য রত্ন হেলায় তুলে দিতে চাইছে এমন একজনের হাতে যাকে সে চেনেই না। সত্যিই রহস্যজনক ব্যাপার।

'নাও, আমার অনুরোধ,' মিনতি করে রহস্যময় আগন্তুক।

'না।' সংক্ষিপ্ত জবাব গুটিয়েরের। 'এত দামী উপহার আমি তোমার কাছ থেকে নিতে পারি না।'

'দামী !' উষ্ণকণ্ঠে বলে ইক্‌থিয়ানডার। 'দামী হলে কি সাগরের নিচে এরকম হাজার হাজার মুক্তো গড়াগড়ি যায় ?'

হাসে গুটিয়েরে। আবার অপ্রস্তুতবোধ করে ইক্‌থিয়ানডার। চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর আবার,

'আমি বলছি নাও।'

'না।'

মুখ কালো হয়ে যায় ইক্‌থিয়ানডারের। এবার অপমানিত বোধ করে নিজেকে।

'নিজের জন্যে যদি নিতে না চাও তো ওলসেনের জন্যে নাও। সে না বলবে না।'

রেগে যায় গুটিয়েরে। কঠিন কণ্ঠে বলে—'নিজের জন্যে মুক্তোর মালা নেয়নি ওলসেন। কিচ্ছু জানো না তুমি।'

'তাহলে নেবে না, কেমন ?'

'না।'

ছুঁড়ে সমুদ্রের গভীর জলে মুক্তোটা ফেলে দ্যায় ইক্‌থিয়ানডার। ছোট্ট অভিবাদন জানিয়ে পেছন ফিরেই গটমট করে নেমে যায় টিলার নিচে।

স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে থাকে গুটিয়েরে। একী কাণ্ড! লাখ লাখ টাকা দামের মুক্তোকে নুড়ির মতই হেলায় জলে ফেলে দিয়ে গেল ছেলেটা! অনুতাপ হয় গুটিয়েরের। ধিক্কার দিতে থাকে নিজেকে। ছিঃ, ছিঃ, এমনভাবে ওর মনে আঘাত দেওয়া উচিত হয়নি। হলেই বা অচেনা, তাহলে বড় মুখ করে দিতে যখন এসেছে, তখন এতখানি রূঢ়তা অনুচিত হয়েছে।

'দাঁড়াও! কোথায় যাচ্ছো ?'

কিন্তু দাঁড়ালো না ইক্‌থিয়ানডার। নত মস্তকে হনহন করে এগিয়ে চলল সাগরের দিকে। পেছন পেছন ছুটে এসে নাগাল ধরে ফেলল গুটিয়েরে। দু'হাত দিয়ে ধরে ঘুরিয়ে দিয়ে মুখের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল।

ইক্‌থিয়ানডার কাঁদছে। দরদর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে গালের ওপর দিয়ে। এর আগে কখনো কাঁদেনি সে। তাই বুঝতে পারছিল না কেন হঠাৎ চারদিক এত ঝাপসা লাগছে! সাগরের নিচে গগল্‌স্‌ চোখে না এঁটে সাঁতার কাটলে চারপাশ এমনি দেখায়।

## জুরিটার অসহিষ্ণুতা

'ক্ষমা করো আমাকে। সত্যি বলছি, তোমার মনে কষ্ট দিতে আমি চাইনি,' বলে দু'হাতে ইক্‌থিয়ানডারের দু'হাত আঁকড়ে ধরে গুটিয়েরে।

এই ঘটনার পর থেকে প্রতি সন্ধ্যায় শহরের কাছে বালুকাবেলা পর্যন্ত সাঁতরে আসত ইক্‌থিয়ানডার। পাথরের আড়াল থেকে কোটপ্যান্ট বার করে পরত।

তারপর এসে দাঁড়াত টিলার কাছে। গ্যুটিয়েরেও আসত। আশ মিটিয়ে গল্প করত আর হাত ধরাধরি করে বালির ওপর বেড়াত দুজনে। অনেক প্রশ্নই ভীড় করে আসত গ্যুটিয়েরের মনে। কে এই রহস্যময় তরুণ? ছেলেটি মেধাবী। উপস্থিত বুদ্ধিও আছে। এমন অনেক জিনিস জানে, যা গ্যুটিয়েরেও আজ পর্যন্ত শোনেনি। অথচ স্কুলের ছেলেরা যে সব বিষয় নিয়ে দুবার প্রশ্নও করে না, তা তার জানা নেই। গ্যুটিয়েরে বুঝতে পারে না কারণটা। নিজের সম্বন্ধে বেশী বলতে চায় না ইক্‌থিয়ানডার। সত্যি বলতে সঙ্কোচ হয়। গ্যুটিয়েরে শুধু এটুকু বুঝেছে যে, ইক্‌থিয়ানডারের বাবা একজন ডাক্তার। অর্থের অভাব নেই তাঁর। জনপদ আর জনারণ্য থেকে অনেক দূরে ছেলেকে মানুষ করেছেন তিনি। ফলে, অদ্ভুত রকমের একতরফা শিক্ষা পেয়েছে ইক্‌থিয়ানডার।

মাঝে মাঝে ঘন্টার পর ঘন্টা দুজনে পাশাপাশি বসে থেকেছে নির্জন সৈকতে। চুপ করে তাকিয়ে থেকেছে নৃত্যশীল ঢেউয়ের মাথায় ফেণার মুকুটের দিকে। সন্ধ্যে হয়েছে। আকাশে তারা চিকমিক করছে, ফেনার মুকুটও আশ্চর্য রোশনাই বিকিরণ করেছে রাতের অন্ধকারে। ইক্‌থিয়ানডারের সমস্ত মন ভরে উঠেছে। মুখের কথা হারিয়ে গেছে।

তারপর ফিসফিস করে বলেছে গ্যুটিয়েরে—'এবার আমি উঠি।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও গা তুলেছে ইক্‌থিয়ানডার। অপলকে তাকিয়ে থেকেছে গ্যুটিয়েরের অপসৃয়মান মূর্তির দিকে। তারপর কোটপ্যান্ট খুলে ফেলে ডুব দিয়েছে জলে—সমস্ত পথ সাঁতার কেটে ফিরে এসেছে বাড়ীতে। ভোর হতেই ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে আবার বেরিয়েছে। এবার হাতে মস্ত একটা পাঁউরুটি। সাগরের নিচে বালুকাভূমির ওপর বেশ জাঁকিয়ে বসে মাছেদের পাঁউরুটির গুঁড়ো খাওয়াতে শুরু করেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে ঘিরে ধরেছে রকমারি মাছ। আঙুলের ফাঁক দিয়ে, বগলের তলা দিয়ে, কানের পাশ দিয়ে তারা ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে গেছে পাঁউরুটি। মাঝে মাঝে হানা দিয়েছে বড় মাছের দল—ছোট মাছেদের তাড়া করলেই উঠে পড়েছে ইকথিয়ানডার। হানাদারদের তাড়িয়ে নিয়ে গেছে অনেক দূর—পেছনে আশ্রয় নিয়ে রঙ্গ দেখেছে ছোট মাছের ঝাঁক।

বেশ কিছু মুক্তোও সংগ্রহ করেছে ইক্‌থিয়ানডার। মুক্তোক্ষেতের ওপর আগে ওর কোনো আকর্ষণই ছিল না। শুক্তির ভেতর থেকে মুক্তো লুঠ করার কায়দাও জানত না। কিন্তু দুদিন যেতে না যেতে বিদ্যেটা রপ্ত করে নিলে ইক্‌থিয়ানডার। শুধু তাই নয়। প্রথম শ্রেণীর এক কাঁড়ি মুক্তোর ছোটখাট একটা ঢিবি জমিয়ে ফেললে সাগরের নিচে তার ছোট্ট রত্নগুহায়।

এক একটা দিন ফুরিয়েছে, আর ফুলেফেঁপে উঠেছে রত্নভাণ্ডার। নিজের অজ্ঞাতসারেই আর্জেণ্টাইনের সেরা ধনী হয়ে গেল ইক্‌থিয়ানডার মাত্র কদিনের মধ্যেই। তামাম ল্যাটিন আমেরিকাতেও বুঝি তার সমকক্ষ ধনী আর রইল না। চেষ্টা করলে অক্লেশে দুনিয়ার সব সেরা বড়লোকও হতে পারত ইক্‌থিয়া-

নডার। কিন্তু সেরকম কোনো বাসনাই তার ছিল না।

কাজেই এমনি ঢিমে তালেই দিন কাটতে থাকে। ইক্‌থিয়ানডার সুখী। কিন্তু নিষ্কণ্টক সুখ তো কারো কপালে থাকে না। তাই গা ঘিন ঘিন করলেও গুটিয়েরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে যেতে হয় ধুলোভরা শহরে। কষ্ট হয় তার। প্রায়ই ভাবে, আহা রে, গুটিয়েরে যদি জলে থাকতে পারত, তাহলে কি মজাটাই না হতো। সাগরের নিচে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াত দুজনে। কত অদ্ভুত জিনিস দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিত গুটিয়েরেকে। কিন্তু গুটিয়েরে ডাঙার জীব, জল তার ঘর নয়। এদিকে দিনের বেশীর ভাগ সময় ডাঙায় কাটানোর কুফল ভোগ করতে হচ্ছে ইক্‌থিয়ানডারকে। পাঁজরায় সেই অসহ্য ব্যথাটা আবার চাগিয়ে উঠেছে। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। এক-এক সময়ে গুটিয়েরের সঙ্গে বসে থাকতে থাকতেই অপরিসীম বেদনায় শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। তবুও গুটিয়েরের আগে স্থানত্যাগ করেনি ইক্‌থিয়ানডার।

দেহের এই বেদনা ছাড়াও আছে মনের বেদনা। মাঝে মাঝে বুকটা টনটন করে একটা কথা ভেবে। সেদিন টিলার কিনারায় দাঁড়িয়ে ফিসফাস করে কি কথা হয়েছিল ওলসেন আর গুটিয়েরের মধ্যে, তা জানবার জন্যে আকুলিবিকুলি করে মনটা। কিন্তু বলি-বলি করেও কথাটা আর জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠে না।

একদিন সন্ধ্যেবেলা গুটিয়েরে জানালে, আগামীকাল সে আসবে না।

'কেন?' ভ্রূকুটি করে জানতে চায় ইক্‌থিয়ানডার।

'ব্যস্ত থাকব।'

'কি নিয়ে?'

'অত কৌতূহল ভাল নয়,' মৃদু হেসে বলেছে গুটিয়েরে।

জলে ফিরে গেছে ইক্‌থিয়ানডার। সমস্ত রাত শ্যাওলা ঢাকা একটা পাথরে শুয়ে কাটিয়েছে। অব্যক্ত বেদনায় সারারাত কষ্ট পেয়েছে। ভোরবেলা রওনা হয়েছে বাড়ীর দিকে।

উপসাগরের কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়েছে ডলফিন শিকার করছে একদল লোক। গুলী খেয়ে লাফিয়ে উঠল একটা মস্ত ডলফিন—জল থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠেই আবার ঝপাস করে আছড়ে পড়ল ঢেউয়ের ওপর।

আতংকঘন আর্তনাদ বেরিয়ে এসেছে ইক্‌থিয়ানডারের মুখ দিয়ে—'লীডিং!'

লীডিংই বটে। একজন জেলে তো এর মধ্যেই খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে। প্রায় আধ কেব্‌ল্‌ তফাতে ভেসে উঠেই খাবি খেয়ে আবার ডুব দিল গুলীবিদ্ধ লীডিং।

ঝপাঝপ সাঁতার কেটে এগিয়ে যায় জেলেরা। আবার ভেসে ওঠে লীডিং। এবার নাগাল ধরে ফেলে জেলেটা। পাখনা ধরে টানতে থাকে আগুয়ান নৌকাটার দিকে।

ঢেউয়ের ঠিক নিচে থেকে, বুলেটের মত বেগে সাঁতরে যায় ইক্‌থিয়ানডার। বন্ধু বিপন্ন! কাজেই হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে দাঁত বসিয়ে দেয় জেলের পায়ে।

নিশ্চয় হাঙরের কামড়। আর রক্ষে নেই। চোখে সর্ষেফুল দেখে সাঁতারু জেলে। প্রাণের দায়ে কোমর থেকে ছুরী বার করে এলোপাতারি চালাতে থাকে জলের মধ্যে।

ইক্‌থিয়ানডারের কাঁধের কাছে যেখানে বর্ম নেই, ঘ্যাঁচাৎ করে ছুরী বসে যায় সেখানে। পা ছেড়ে দিতেই পড়ি কি মরি করে নৌকার দিকে পালায় ভয়ার্ত জেলে।

ইক্‌থিয়ানডার আহত। ডলফিনও আহত। তবুও মানুষ বন্ধুর নির্দেশ মানে মাছ বন্ধু। একটা নিভৃত জায়গায় গিয়ে লীডিংয়ের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে ইক্‌থিয়ানডার। ভয়ের কোনো কারণ নেই। চর্বির স্তরেই আটকে রয়েছে বুলেটটা। আঙুল দিয়ে টেনে বার করে দ্যায় ইক্‌থিয়ানডার। আগাগোড়া আশ্চর্য রকমের শান্ত থাকে লীডিং।

বাড়ী ফিরে আসে ইক্‌থিয়ানডার। রক্ত দেখে ভয় পেয়ে যায় ক্রিস্টো।

ইক্‌থিয়ানডার বলে—'ডলফিন বাঁচাতে গিয়ে জেলের ছুরী পড়ল আমার ওপরেই।'

ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ করতে করতে সন্দিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে ক্রিস্টো, 'আবার শহরে গেছিল নিশ্চয়?'

চুপ করে থাকে ইক্‌থিয়ানডার।

'আঁশ-জামাটা একটু সরাও দিকি,' বলে নিজেই বিচিত্র ধাতুর জামাটা একটু সরিয়ে দেয় ক্রিস্টো। কাঁধের ওপর একটা লাল দাগ।

আরো ভয় পেয়ে যায় ক্রিস্টো।

'দাঁড় দিয়ে মেরেছে মনে হচ্ছে?' দাগটার ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বলে ক্রিস্টো। কিন্তু এতো কালসিটের দাগ নয়, জন্মসূত্রে পাওয়া বলেই মনে হয়।

নিজের ঘরে যায় ইক্‌থিয়ানডার, গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে থাকে ক্রিস্টো। ললাটে চিন্তার আবিলতা। বেশ কিছুক্ষণ পরে গাত্রোত্থান করে বেরিয়ে পড়ে বাইরে—শহর অভিমুখে।

বালতাসারের দোকানে কাউণ্টারে একা বসেছিল গুটিয়েরে। তীক্ষ্ণচোখে মুখপানে তাকায় ক্রিস্টো। শুধোয়—'বাবা কোথায়?'

চিবুকের ইঙ্গিতে ভেতরের ঘরটা দেখিয়ে বলে গুটিয়েরে—'ও ঘরে।'

বালতাসারের ল্যাবরেটরীতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ক্রিস্টো। কাজ করছিল বালতাসার। মেজাজ আগের মতই তিরিক্ষে।

ফোঁস করে উঠল ক্রিস্টোকে দেখেই—'সবাই মিলে আমাকে পাগল করে ছাড়বে তোমরা। কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়। সমুদ্র-শয়তান নিয়ে তানেনানা

করছ তুমি, আর ওদিকে আমাকে তো ছিঁড়ে খেতে পারলে বাঁচে জুরিটা। তার ওপর সারাদিন কোথায় যে থাকে গুটিয়েরে, কাউকে কিছু বলে না। জুরিটার কোনো কথাই কানে তোলে না। জুরিটাও কিছুতেই ওর 'না'কে 'হ্যাঁ' করতে না পেরে রেগেমেগে বলে গেছে, জোর করে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে। দুদিন কাঁদাকাটা করবে, তারপর পোষ মেনে যাবে।'

নীরবে ভাইয়ের দুঃখের কাহিনী শুনল ক্রিস্টো।

তারপর বলল—'ইক্‌থিয়ানডারকে শহরে আনতে পারছি না আমার সঙ্গে ও আসতে চায় না বলে। তাছাড়া সারাদিন যে কোথায় থাকে কিছু বলে না। দিনকে দিন অবাধ্য হয়ে উঠছে। বাগে রাখা যাচ্ছে না। ডাক্তার ফিরে এলে নির্ঘাত বকুনি খেতে হবে আমাকে।

'তবে কি স্যালভেটর অসোর আগেই গুম করবে ?'

'না, না। কথা শোনো আমার। হট করে ইক্‌থিয়ানডারকে নিয়ে কিছু করা উচিত হবে না।'

'কেন শুনি ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্রিস্টো। এতক্ষণ ধরে যা ভেবেছে, তা বলি বলি করেও বলতে পারে না।

'শোনো, বালতাসার—'অবশেষে মুখ খোলে ক্রিস্টো।

ঠিক এই মুহূর্তে ভারী ভারী পা ফেলে কে যেন দোকানে ঢুকল। শোনা গেল জুরিটার বাজখাঁই গলা।

একমুঠো মুক্তো জলপাত্রে ফেলে বিড়বিড় করে বলল বালতাসার—'আবার এসেছে।'

এক ঝটকায় দরজা খুলে ঘরে ঢুকল জুরিটা।

'বাঃ, এই তো মানিকজোড় হাজির ! আর কত ল্যাজে খেলাবে বাছাধনেরা ? মস্করা হচ্ছে আমার সঙ্গে ?'

ঠোঁটের কোণে বিনীত হাসি টেনে উঠতে উঠতে বলে ক্রিস্টো—'মস্করাই যদি হবে তো তাকে এখানে নিয়ে আসলাম কেন ? তখন যদি আপনি থাকতেন তাহলেই ল্যাটা চুকে যেত। এখন আর সে আমার সঙ্গে শহরে আসতে চায় না। শহর তার ভাল লাগে না।'

'গোল্লায় যাক সে। অনেক অপেক্ষা করেছি, আর নয়। এই সপ্তাহেই এক ঢিলেই দু-পাখী মারবো আমি। স্যালভেটর এখনো ফেরেনি তো ?'

'যে কোনো দিন ফিরতে পারেন।'

'তাহলে আর দেরী করা যায় না। দরজাটা খুলে রেখো। বাদবাকী যা করবার আমি করব। আর বালতাসার, কাল তোমার সঙ্গে আমি শেষবারের মত কথা বলব। মনে থাকে যেন, এই শেষ।'

নীরবে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানায় দুই ভাই। জুরিটা পেছন ফিরতে

না ফিরতেই মিলিয়ে যায় অধর প্রান্তের বিনয় নম্র হাসি। অস্ফুট কণ্ঠে গাল পাড়ে বালতাসার। কিন্তু আনত চোখে কি যেন ভাবতে থাকে ক্রিস্টো।

দোকান ঘর থেকে ভেসে আসে জুরিটার কণ্ঠ। নীচু গলায় গুটিয়েরেকে কি যেন বলছে।

'না!' জোর গলায় জবাব দেয় গুটিয়েরে।

হাল ছেড়ে দেওয়ার মত মুখভঙ্গী করে বালতাসার।

হেঁকে ওঠে জুরিটা—'ক্রিস্টো! এসো আমার সঙ্গে। দরকার আছে।'

বড় কষ্ট হচ্ছিল ইক্‌থিয়ানডারের। কাঁধের ক্ষতস্থান টাটিয়েছে, ফলে জ্বরও হয়েছে। ফুসফুস দিয়ে শ্বাস নিতে রীতিমত অসুবিধে হচ্ছে। এত কষ্ট সত্ত্বেও গুটিয়েরের সঙ্গে দেখা করার জন্যে বেরিয়েছে ইক্‌থিয়ানডার। সকাল বেলাই এসেছে টিলার কাছে। গুটিয়েরে এল দুপুরের দিকে। কাঠফাটা রোদ্দুরে, গরম বাতাসে, আর সূক্ষ্ম সাদা ধুলোয় প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় ইক্‌থিয়ানডারের। আঁকুপাঁকু করতে থাকে ভেতরটা। গুটিয়েরের সঙ্গে সমুদ্রতীরে বসলেও খানিকটা শান্তি পেত।

কিন্তু গুটিয়েরে বললে—'বাবা কাজে বেরুচ্ছে, আমাকে দোকানে বসতে হবে। চললাম।'

'চল তোমাকে ছেড়ে দিয়ে আসি,' বলে রৌদ্রতপ্ত ধুলোভরা রাস্তায় ধুঁকতে ধুঁকতে এগোয় ইক্‌থিয়ানডার।

মাথা নিচু করে এদিকেই আসছিল ওলসেন। চিন্তার বিভোর হয়ে থাকার ফলে এদেরকে না দেখেই হয়ত পাশ দিয়ে চলে যেত। গুটিয়েরে ডাকতেই চমক ভাঙল।

'তুমি একটু দাঁড়াও। ওর সঙ্গে কটা কথা বলে নিই,' বলে ইক্‌থিয়ানডারকে দাঁড় করিয়ে ওলসেনের কাছে গিয়ে নিম্ন কণ্ঠে কি বলতে থাকে গুটিয়েরে। কিছু শুনতে পায় না ইক্‌থিয়ানডার। কিন্তু মনে হয় যেন ওলসেনকে কোন একটা ব্যাপারে রাজী করাতে চাইছে গুটিয়েরে।

'তাহলে ঐ কথাই রইল, আজ মাঝরাতে আসব আমি,' শোনা যায় ওলসেনের কণ্ঠ। গুটিয়েরের হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে চলে যায় নিজের পথে।

ফিরে আসে গুটিয়েরে। রক্তিম মুখে ওলসেন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে চায় ইক্‌থিয়ানডার। কিন্তু কথা খুঁজে পায় না।

যেন বাতাসের অভাবে দমবন্ধ হয়ে আসছে, এমনিভাবে খাবি খেতে খেতে বলে ইক্‌থিয়ানডার—'জিনিসটা মোটেই ভাল লাগে না আমার······ওলসেন ······গোড়া থেকেই কিছু চেপে যাচ্ছ তুমি······ওলসেনের সঙ্গে আজ রাতে তোমার দেখা হচ্ছে ·····তুমি বুঝি ওকে ভালবাস?'

কোমল দৃষ্টি মেলে তাকায় গুটিয়েরে। দুহাতে ইক্‌থিয়ানডারের দুহাত

কোলে তুলে নিয়ে বলে—'আমাকে বিশ্বাস করো ?'

'করি……তুমি তো জানো, ভালবাসি তোমায়……' অবশেষে কথাটা খুঁজে পায় ইক্‌থিয়ানডার। 'কিন্তু……বড় কষ্ট হচ্ছে আমার……'

সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল ইক্‌থিয়ানডারের। ক্রুর যন্ত্রণায় পাঁজর যেন ফালাফালা হয়ে যাচ্ছিল। বাতাসের অভাবে হাপরের মত ওঠানামা করছিল বুকটা। অপরিসীম বেদনায় পাণ্ডুর হয়ে গেছিল মুখ।

উদ্বেগভরা গলায় গুটিয়েরে বলল—'তোমার শরীর খারাপ হয়নি তো ? খামোকা ভেবে ভেবে কেন কষ্ট পাচ্ছ বলতো ? অ্যাদ্দিন সব বলিনি। কিন্তু শুনলে যদি শান্তি পাও তো শোনো।'

ঠিক এই সময়ে টগবগিয়ে পাশ দিয়ে ছুটে গেল একটা ঘোড়া। কিছুদূর গিয়েই শিরপা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল—ফিরে এল কদম চালে। লাগাম হাতে বিদ্রূপ ভরা তীক্ষ্ন চোখে কপোত-কপোতীর দিকে তাকিয়ে রইল ঘোড়সওয়ার। নোংরা মলিন চেহারা। বয়স যৌবনের চৌকাঠ পেরিয়েছে। ছুঁচোলো গোঁফ আর ছাগলদাড়ি।

এ মুখ যেন কোথায় দেখেছে ইক্‌থিয়ানডার, কোথায় ? পরমুহূর্তেই মনে পড়ে গেল বিদ্যুৎ চমকের মত। বালুকাবেলায় সেই প্রথম দিনটিতে—যেদিন জল থেকে গুটিয়েরেকে সে তুলে এনেছিল ডাঙায়।

চকচকে বুটজোড়া দিয়ে পাদানিতে টোকা মারতে মারতে শক্ত চোখে ইক্‌থিয়ানডারের আপাদমস্তক দেখে নিলে ঘোড়সওয়ার।

তারপর গুটিয়েরেকে লক্ষ্য করে গর্জে উঠল সাপের মত হিসহিসিয়ে—'হাতে নাতে ধরেছি ! ছিঃ ছিঃ, আজ বাদে কাল যে বউ হতে চলেছে, পরপুরুষের সঙ্গে বেড়াতে তার লজ্জা করে না ? বিয়ের কনের একি কাণ্ড ?'

রাগে আরক্ত হয়ে ওঠে গুটিয়েরে। কিন্তু তাকে কথা বলবার সময় না দিয়েই বলল ছাগলদাড়ি—'বাবা বসে আছেন তোমার জন্যে। যাও তুমি। আমি আসছি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।'

শেষের কথাগুলো শুনতে পেল না ইক্‌থিয়ানডার। অকস্মাৎ যেন দিনের আলো নিভে গেল চোখের সামনে, গলার কাছে কি যেন দলা পাকিয়ে উঠল, শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে এল। দেহের সমস্ত অণুপরমাণুও যেন আচম্বিতে পাগল হয়ে গেল সমুদ্রের জন্যে—ডাঙায় আর নয়, ডাঙায় আর নয়, ডাঙায় আর নয় !

'তুমি……তুমি……আমাকে ঠকিয়েছ……' এর বেশী আর কিছু বলতে পারল না ইক্‌থিয়ানডার। থরথর করে না-বলার বেদনায় কাঁপতে লাগল যন্ত্রণা-নীল ঠোঁট। অন্তরের ঘৃণা মুখের শব্দে উপড়ে দেওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করল ইক্‌থিয়ানডার, কিন্তু পাঁজরের সেই ব্যথা হঠাৎ এমন তীব্র হয়ে উঠল যে তার সহ্য করা গেল না। অসহ্য সেই অকথ্য যন্ত্রণা—ইক্‌থিয়ানডার বুঝল ধীরে ধীরে জ্ঞানলোপ পাচ্ছে তার।

জ্যামুক্ত তীরের মতই ছিটকে গিয়ে উঁচু পাহাড়ের কিনারা থেকে বহু নিচে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইক্‌থিয়ানডার।

আর্ত চীৎকার বেরিয়ে এল গুটিয়েরের কণ্ঠ চিরে। মাথা ঘুরে পড়ে যেতে যেতে দৌড়ে গেল পেড্রো জুরিটার কাছে।

'বাঁচান, ওকে বাঁচান!'

কিন্তু একটুও নড়ল না জুরিটা।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে—'যে ডুবে মরতে চায়, তার কাজে ব্যাগড়া দেওয়া আমার স্বভাব নয়।'

সমুদ্রের দিকে ছুটে গেল গুটিয়েরে। ছোটার ধরন দেখে মনে হল জলে ঝাঁপ দেওয়াই তার লক্ষ্য। জুরিটা তা বুঝতে পেরে চকিতে গোড়ালীর গুঁতোয় ঘোড়া ছুটিয়ে নাগাল ধরে ফেললে এবং পরমুহূর্তেই হ্যাঁচকা টানে তুলে নিলে জিনের ওপর।

ঘোড়া ছুটল বালতাসারের দোকান অভিমুখে। গুটিয়েরের তখন আর জ্ঞান নেই। জ্ঞান ফিরল দোকানে এসে।

'ছোকরাটা কে?' জিজ্ঞেস করে পেড্রো।

দুই চোখে ঘৃণা বৃষ্টি করে গুটিয়েরে শুধু বললে—'ছেড়ে দিন আমাকে।'

বালতাসার ছুটে এল জুরিটার ডাক শুনে।

'কি ব্যাপার?'

'তোমার মেয়েকে আবার যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলাম। একটা চ্যাংড়া ছোকরার পেছন পেছন জলে ডুবে মরতে যাচ্ছিল। এই নিয়ে দুবার হল বাঁচালাম তোমার মেয়েকে। তার পুরস্কারের নমুনা তো দেখছিই। আজকেই এসপার কি ওসপার। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই ফিরে আসছি। যা বলেছি মনে আছে নিশ্চয়?'

একান্ত বশংবদের মত ঘাড় নেড়ে সায় দেয় বালতাসার।

ঘোড়া ছুটিয়ে অন্তর্হিত হয় জুরিটা।

দরজা বন্ধ করে ফিরে আসে বালতাসার। আপন মনেই বকে যেতে থাকে। ধাপে ধাপে বাড়তে থাকে উত্তেজনা, পায়চারী করতে থাকে ঘরময়।

কিন্তু নিশ্চল প্রতিমার মত দুহাতে মুখ লুকিয়ে টুলে বসে থাকে গুটিয়েরে। বাবার বকুনির একটা অক্ষরও প্রবেশ করে না কানে।

চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠতে থাকে ইক্‌থিয়ানডারের মুখ। সুন্দর, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, কিন্তু কি করুণ! আশ্চর্য, চোখের পলক ফেলার আগেই ঝাঁপ দিল জলে···মনে পড়ে ওলসেনকে······জুরিটাকে···বদমাস···কি স্পর্ধা। ইক্‌-থিয়ানডারের সামনেই কিনা বিয়ের কনে বলে বসল! সব শেষ হয়ে গেল! পেয়েও সব হারাল গুটিয়েরে।

নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে গুটিয়েরে। ইক্‌থিয়ানডারের না-বলে-যাওয়া বেদনা

সহস্র বৃশ্চিক দংশনে জ্বালিয়ে দিতে থাকে বুক। সরল, লাজুক ছেলে ইক্‌থিয়ানডার। মুখচোরা হলে কি হবে, আজ পর্যন্ত যত দাম্ভিক, পয়সাওলা, বখাটে ছেলে পাণিপ্রার্থী হয়েছে গুটিয়েরের, ইক্‌থিয়ানডারের পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা তাদের কারুর নেই।

কি করবে গুটিয়েরে? সাগরে ডুবে সব জ্বালা জুড়োবে? ইক্‌য়িথয়ানডার তো সেখানেই রয়েছে তার প্রতীক্ষায়?

বালতাসারের কথা ভেসে আসে কানে:

'সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার। এই দোকান, এই বাড়ী, এই ব্যবসা—এর দশ ভাগের ন ভাগই তো জুরিটার দেওয়া। মোটা কমিশনে মুক্তোও দিচ্ছে সে। আজ যদি তাকে চটাই, কাল আমাকে পথে বসতে হবে। লক্ষ্মী মা আমার, কথা শোন, রাজী হ।'

'না, না, না, ওকে আমি বিয়ে করব না, করব না,' ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে গুটিয়েরে।

'তবে মর্,' নিমেষে মাথায় রক্ত উঠে যায় বালতাসারের। 'সোজা আঙুলে যখন ঘি উঠবে না, তখন আসুক জুরিটা।' বলে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঢুকে যায় ল্যাবরেটারী ঘরে।

## অক্টোপাসের সঙ্গে লড়াই

জলে ফিরে এসে ডাঙার সব কষ্টই মন থেকে মুছে ফেলতে চাইল ইক্‌থিয়ানডার। বেদনাময় স্মৃতি ভুলে যাওয়াই ভাল। ঠাণ্ডা জলের ছোঁয়ায় পাঁজরের যন্ত্রণাটা অবশ্য আর নেই। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও সরল হয়ে এসেছে এখন। দেহ জুড়িয়েছে। এবার মনটাকে হাল্কা করতে হবে। ভুলে যেতে হবে ডাঙার দুর্দৈব।

কিন্তু আলসেমি জিনিসটা একেবারেই ধাতে আসে না ইক্‌থিয়ানডারের। চুপচাপ শুয়ে বসে থেকে মন লাঘব করা যায় না……অসীম দুঃখের উৎস ডাঙাকেও ভোলা যায় না। কিছু একটা করতে হবে। রাত্তির হলে উঁচু পাহাড়ের চুড়ো থেকে জলে লাফিয়ে একদম সাগরের তলায় পেঁৗছে যেত ইক্‌থিয়ানডার। কিন্তু এই ভরদুপুরে তা সম্ভব নয়। মাথার ওপর জেলে-ডিঙ্গিগুলোর সঞ্চরমান কালো ছায়া দেখা যাচ্ছে।

'এক কাজ করলে হয়,' ভাবে ইক্‌থিয়ানডার। 'গুহোটাকে মনের মত করে সাজানো যাক।'

গুহো মানে জলে ডোবা গুহো! উপসাগরে বেজায় খাড়া একটা পাহাড় আছে। পাহাড়ের পাদদেশে জলের মধ্যে বিশাল একটা খিলান, খিলানের সামনে থেকেই জমি ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গেছে গভীর সাগরে।

সুদৃশ্য তোরণের ওপাশে বিশাল গহ্বরটা অনেকদিন থেকেই মন টেনেছে

ইক্‌থিয়ানডারের। সব মিলিয়ে জায়গাটা ভারী পছন্দ তার। কিন্তু গুহা সাজাতে হলে বাসিন্দাদের তাড়ানো দরকার। অনেক দিনের পুরোনো বাসিন্দা তারা। একদল ভীষণ অক্টোপাস।

গহ্বরের ভেতরে ঢুকে অক্টোপাস বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করা সমীচীন হবে না। ভুলিয়ে ভালিয়ে একবার বাইরে আনতে পারলেই কেল্লা ফতে।

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। কিছুদূরে একবার একটা নৌকা ডুবে গেছিল। নিমজ্জিত নৌকার পাশেই একটা হারপুনও দেখেছে ইক্‌থিয়ানডার। মহাউৎসাহে সেই হারপুনটাই তুলে নিয়ে এল সে। বেশ করে বাগিয়ে ধরে খোঁচাতে লাগলো গুহার ভেতরে।

অক্টোপাসমহলে বিরক্তির সঞ্চার ঘটে। দু-একটা শুঁড়ও কিলবিল করে ধরতে আসে হারপুন। কিন্তু ছুঁতে দেয় না ইক্‌থিয়ানডার।

অবশেষে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে এক বুড়ো অক্টোপাসের। বিপুল শরীর তার। স্পর্ধিত আগন্তুককে উচিত শাস্তি দেওয়ার জন্যে বেরিয়ে আসে বাইরে। আটটা শুঁড় খেলিয়ে ঘন ঘন রঙ পালটে ছুটে আসে ইক্‌থিয়ানডারের দিকে।

হারপুন ফেলে দীর্ঘ ঈষৎ বক্র ছুরীটা হাতে নেয় ইক্‌থিয়ানডার। দুহাত দিয়ে কোনো মানুষের পক্ষে অক্টোপাসের আট হাতের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়।

কিন্তু সমুদ্রের এই বিভীষিকাকে কিভাবে ঘায়েল করতে হয়, তা ইক্‌থিয়ানডার জানে। তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পরেই আচম্বিতে বন্দুকের গুলীর মত বেগে ধেয়ে যায় মেরুদণ্ডবিহীন সমুদ্র-রাক্ষসের মাথা লক্ষ্য করে। টিয়া-চন্দনার মত ঠোঁটের কাছে গিয়েই ছুরী তোলে। অতর্কিত এই আক্রমণে হকচকিয়ে গেলেও মাত্র চার সেকেণ্ডের মধ্যে আটটা শুঁড়ের অগ্রভাগ ঢুকে আসে ভেতর দিকে আততায়ীকে লক্ষ্য করে। কিন্তু তৎক্ষণে ছুরীর মোক্ষম এক ঘায়ে দেহ কেটে দু-টুকরো করে দিয়েছে ইক্‌থিয়ানডার, আদেশবহা স্নায়ু-মণ্ডলীও ছিন্ন হয়ে গেছে। যে কটা শুঁড় জাপটে ধরেছিল ইক্‌থিয়ানডারকে, ধীরে ধীরে তা শিথিল হয়ে পড়ে যায় সাদাবালির ওপর।

'একটা গেল।'

হারপুনটা আবার তুলে নেয় ইক্‌থিয়ানডার। এবার একসঙ্গে দুটো অক্টো-পাস তেড়ে আসছে। একজন আক্রমণ করল সামনে থেকে। অপর জন পাশ কাটিয়ে গেল পেছন থেকে হানা দেওয়ার জন্যে। খুবই বিপজ্জনক অবস্থা। কিন্তু একটুও বুক কাঁপল না ইক্‌থিয়ানডারের। ছুরী নিয়ে ধেয়ে গেল সামনেরটাকে লক্ষ্য করে। তাকে শেষ করবার আগেই পেছন থেকে শুঁড়ের ফাঁস পড়ল গলায়, কোমরে। নির্ভুল কয়েকটা কোপেই গলা আর কোমর থেকে খসে পড়ল শুঁড়। সামনের শত্রুকে এবার খতম করে ফেলে ইকথিয়ানডার। সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আহত দানবটার ওপর। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই রক্ত-রাঙা জলের মধ্যে এলিয়ে পড়ে আরও দুটো ছিন্ন দেহ অক্টোপাস।

'তিন,' মনে মনে গোনে ইক্‌থিয়ানডার।

এবার সাময়িকভাবে পিছিয়ে যাওয়া দরকার। পালে পালে অক্টোপাস বেরিয়ে আসছে গুহার ভেতর থেকে। নিহত তিনজনের রক্তে জল এমন ঘুলিয়ে গেছে যে দৃষ্টি চলে না। এরকম অবস্থায় লড়াই করা গোঁয়ারতুমি। কারণ, ইকথিয়ানডার কিছু দেখতে না পেলেও অসংখ্য শুঁড়ের ছোঁয়ায় ওকে শেষ করে ফেলবে অষ্টভুজ রাক্ষসেরা। কাজেই পরিষ্কার জলে এসে দাঁড়ায় ইক্‌থিয়ানডার। আহাম্মুকের মত একটা দানব ঘোলা জল থেকে বেরিয়ে এসেছিল বাহাদুরি দেখাতে—ছুরীর কোপে তাকে অক্কা পেতে হল।

ঘণ্টাখানেক চলল লড়াই।

শেষ অক্টোপাসটাকে নিকেশ করার পর আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ইক্‌থিয়ানডার। জল পরিষ্কার হয়ে যেতেই দেখা গেল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। অগুন্তি ছিন্ন শুঁড় তখনো রুষ্ট নাগের মতই ফুঁসে ফুঁসে উঠছে চারপাশে। বিজয়ী বীরের মত খিলেন পেরিয়ে গুহায় প্রবেশ করে ইকথিয়ানডার। কয়েকটা বাচ্ছা অক্টোপাস তখনো রয়েছে। মুঠো মত বড়। মায়া হয় ইকথিয়ানডারের। কি হবে এদের মেরে? বরং পোষ মানানোর চেষ্টা করা যাবে। অক্টোপাস-রক্ষী দিয়েই পাহারা দেওয়া যাবে গুহার মুখ।

যাক্‌, গুহা অধিকার হল। গুহার পাহারাদারের সমস্যাও মিটল, এবার আসবাবপত্র দিয়ে সাজানোর পালা, কটেজ থেকে মার্বেলপাথরের একটা টেবিল আর দুটো চৈনিক ফুলদানী নিয়ে এল ইক্‌থিয়ানডার। টেবিলের লোহার চারটে পা বালির ওপর বসিয়ে ফুলদানিটা রাখল তার ওপর। মাটি ভরে কিছু সামুদ্রিক ফুল গুঁজে দিল। কিছুক্ষণ ধরে ধোঁয়া ওঠার মত মাটি ঘোলা জল উঠতে লাগল স্তম্ভের আকারে ফুলদানির মুখ দিয়ে, গুহার গায়ে বেঞ্চির মত একটা পাথরের খাঁজে কনুইয়ে ভর দিয়ে আড় হয়ে শুয়ে শুয়ে দেখতে লাগল ইক্‌থিয়ানডার। কিছুক্ষণ পর ঘোলাটে জল পরিষ্কার হয়ে যেতে মন্দ লাগল না দৃশ্যটা। একটা কাঁকড়া হেলতে দুলতে ভেতরে ঢুকে জাঁকিয়ে বসল টেবিলের নিচে। ছোট ছোট মাছগুলো নির্ভয়ে ইক্‌থিয়ানডারের হাতের ফাঁক দিয়ে টেবিলের তলা দিয়ে লুকোচুরি খেলা জুড়ে দিলে। ছোট্ট দেহে মস্ত মাথা নিয়ে একটা মাছ গুহামুখে উঁকি দিয়েই সভয়ে ল্যাজ নেড়ে চম্পট দিল। বেশ মজা লাগে ইক্‌থিয়ানডারের।

নতুন নতুন পরিকল্পনা মাথায় খেলে। বাড়ী হল, এবার বাগান চাই। সামুদ্রিক ফুল পুঁততে হবে। টেবিলের ওপর ছড়ানো থাকবে মুক্তো। দেওয়ালের ধারে ধারে সাজানো থাকবে শাঁখ আর শামুক। সাগর তলের এমন ঘর দেখলে তাক লেগে যেত গুটিয়েরের, কিন্তু সে প্রবঞ্চক। ছলনাময়ী। কিন্তু সত্যিই কি তাই? ওলসেন সম্পর্কে কি যেন বলতে গিয়েও সময় পায়নি গুটিয়েরে।

জায়গাটার নৈঃশব্দ্য আবার মনের ওপর চেপে বসে। আবার নিজেকে বড় একাকী, বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। কেন অন্যান্য মানুষ জলের মধ্যে থাকতে পারে না ? কেন ? কেন ? বাবার জন্যে মন কেমন করতে থাকে ইক্‌থিয়ানডারের। বাবা ফিরে এলেই জানতে হবে।

এমন সুন্দর নতুন বাড়ীটা সবাইকে দেখাতে ইচ্ছে যায়। কিন্তু কাকে ? মনে পড়ে লীডিংকে। হ্যাঁ, লীডিংই ভাল ! প্রিয় বন্ধু লীডিং।

শাঁখ বার করে জলের ওপর ভেসে ওঠে ইক্‌থিয়ানডার, কম্বুনিনাদ দূর হতে দূরে ভেসে যায়। পরমুহূর্তে ভেসে আসে প্রত্যুত্তর। লীডিং আসছে।

বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে ইক্‌থিয়ানডার—'চলো নিচে যাই। আমার নতুন বাড়ী দেখবে চলো, জীবনে টেবিলে আর চীনে ফুলদানীও তো দেখনি—দেখে জন্ম সার্থক করবে চলো।'

কিন্তু নতুন ঘরে মহা উৎপাত শুরু করে দ্যায় লীডিং। অতবড় শরীর নিয়ে গুহার মধ্যে শান্ত থাকা তার পক্ষের অসম্ভব। টেবিলের পায়ায় নাক ঘসতেই উল্টে গেল টেবিল—দারুণ ভয়ে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রবেগে উধাও হয়ে গেল কাঁকড়াটা। ফুলদানী দুটো ঠিকরে পড়লো মেঝের ওপর। ডাঙার ওপর হলে ফুলদানীর দফারফা হয়ে যেত এখুনি, জল বলে রক্ষে। ত্রস্তে উঠে পড়ে ইক্‌থিয়ানডার। টেবিল আর ফুলদানী দেওয়ালের ধারে সরিয়ে রাখে। কিন্তু বেশীক্ষণ জলের নিচে থাকা সম্ভব নয় ডলফিনের পক্ষে। বাতাস চাই তার ! তাই বাতাসের জন্যে শক্তিশালী পাখনার এক ঝটকায় গুহা থেকে বেরিয়ে ওঠে যায় ওপরে।

বিষণ্ণ মনে ভাবে ইক্‌থিয়ানডার—'লীডিংও আমার সঙ্গে জলের মধ্যে থাকতে পারে না। মাছ হলে কি হবে, ডাঙার মানুষের মত অসহায়।'

আবার এলিয়ে পড়ে পাথরের কৌচে। সূর্য অস্ত গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে গুহার মধ্যে।

সারাদিনের উত্তেজনার পর শ্রান্তিতে দুই চোখ মুদে আসে। ঘুমিয়ে পড়ে ইক্‌থিয়ানডার।

## নতুন বন্ধু

বড়সড় একটা লঞ্চে দাঁড়িয়ে ছিল ওলসেন। রেলিংয়ে ভর দিয়ে তাকিয়ে ছিল জলের দিকে। সূর্যের তির্যক রশ্মি নীলাভ সার্চলাইটের মত সমুদ্রের তল পর্যন্ত পেঁচেছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সাদা বালির ওপর হামাগুড়ি দিচ্ছে কয়েকজন ডুবুরী। মুক্তো খুঁজছে আর উঠে আসছে জলের ওপরে বাতাসের জন্যে।

চাঁদি-ফাটা রোদ্দুরে ওলসেনেরও ইচ্ছে যায় ডুব দেওয়ার, যেমন ভাবা তেমনি কাজ, পোশাক খুলে রেখে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ দেয় জলে।

মুক্তো খোঁজার কাজে হাতেখড়ি হয় ওলসেনের। জীবনে এই প্রথম। কিন্তু অবাক কাণ্ড! পেশাদার ডুবুরীদের চাইতেও দম তার বেশী, মহাউৎসাহে লম্বা লম্বা ডুব দিতে থাকে ওলসেন। রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

তৃতীয়বার সমুদ্রতলে পৌঁছায় ওলসেন। দুজন রেডইণ্ডিয়ান হেঁট হয়ে শুক্তি তুলছিল। আচমকা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দুজনেই তীরবেগে উঠে যেতে থাকে ওপরে। হাঙর নাকি? ফিরে তাকায় ওলসেন। অদ্ভুত একটা প্রাণী এগিয়ে আসছে তার দিকে। ব্যাঙের মত জল কাটার কায়দায় দেখতে দেখতে কাছে এসে যায় ভয়াবহ জানোয়ারটা। সারা গায়ে রুপালী আঁশ। আধা-মানুষ আর আধা-ব্যাঙের মত বিদঘুটে চেহারা!

হাঁসের মত পাতা পা, ঝিল্লী দিয়ে জোড়া। প্রকাণ্ড দুই চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। সূর্যরশ্মিতে জ্বলছে নীল আগুনের মত।

ওলসেন পায়ের ঠেলায় ওপরে ওঠার আগেই ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে সমুদ্রের সেই বিভীষিকা। ব্যাঙের মত থাবা দিয়ে চেপে ধরে। শিউরে ওঠে ওলসেন। তবুও এত কাছে পেয়ে সিধে তাকায় সমুদ্র-দানোর দিকে। আশ্চর্য! মুখটা অনেকটা মানুষের মত। চাউনিও অমানুষিক নয়—জ্বলজ্বলে উদ্গত দুই চোখের জন্যই দূর থেকে অত বিকট মনে হয়। মানুষ-দানোর ঠোঁট নড়ছে। অনেকটা কথাবলার ভঙ্গীতেই ঠোঁট নড়ছে। কি যেন বলতে চায় ওলসেনকে। কিন্তু জলের মধ্যে যে ওলসেন কিছুই শুনতে পাবে না, সে-খেয়াল নেই সমুদ্র-দানোর। দুহাতে ওকে আঁকড়ে ধরে বকে যেতে থাকে একনাগাড়ে। বালির ওপর জোরালো লাথি মেরে ওপরে ঠেলে ওঠে ওলসেন। ব্যাঙ-মানুষটাও ওর হাত ধরে উঠে আসে। জলের ওপর এসে নৌকার গলুই চেপে ধরে ওলসেন, হাঁচর-পাঁচর করে নৌকার মধ্যে উঠেই প্রাণপণে ধাক্কা দিয়ে জলচর আগন্তুককে ছিটকে ফেলে দেয় জলে। নৌকার রেড-ইণ্ডিয়ানরা ততক্ষণে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরাচ্ছে তীর লক্ষ্য করে।

ইক্‌থিয়ানডার আবার সাঁতরে ফিরে আসে নৌকায়।

বলে স্প্যানিশ ভাষায়—'ওলসেন, শোনো। গুটিয়েরে সম্পর্কে তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

পিলে চমকে ওঠে ওলসেনের। পরমুহূর্তেই বোঝে, সমুদ্র-রাক্ষসের মত দেখতে হলেও অদ্ভুত প্রাণীটা আসলে মানুষ।

মুখে বলে—'কান খোলা আছে।'

নৌকার মধ্যে উঠে আসে ইক্‌থিয়ানডার। পা মুড়ে বসে গলুইয়ের ওপর। ব্যাঙের মত হাত-জোড়া রাখে কোলের ওপর।

ভাল করে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় ওলসেন। ভাঁটার মত যে চোখ দেখে এত ভয়, আসলে তা অদ্ভুত আকারের একজোড়া গগল্‌স্‌।

আগন্তুক বলে—'আমার নাম ইকথিয়ানডার! একদিন জল থেকে একটা

নেকলেস এনে দিয়েছিলাম তোমাকে ।'

'কিন্তু তখন তোমার চোখ আর হাত মানুষের মতই ছিল ।'

হাসে ইক্‌থিয়ানডার । ব্যাঙের মত হাতজোড়া ঝাঁকিয়ে বলে—'দস্তানা ।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম ।'

ডাঙার ওপর তখন পাহাড়ের আনাচেকানাচে উদ্বিগ্ন চোখের হাট বসে গেছে । সবারই আতংকিত দৃষ্টি নৌকার ওপর । অত দূর থেকে কিছু শোনা না গেলেও বোঝা গেল সমুদ্র-রাক্ষসের সঙ্গে খোশ-গল্প জুড়ে দিয়েছে ওলসেন ।

একটু থেমে বলে ইক্‌থিয়ানডার—'গুটিয়েরেকে তুমি ভালবাস ?'

'বাসি ।'

পাঁজর খালি-করা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইক্‌থিয়ানডার ।

'গুটিয়েরে তোমাকে ভালবাসে ?'

'বাসে ।'

'আমাকে বাসে না ?'

'সেটা সে-ই জানে ।'

'সে কি কথা ? গুটিয়েরে তোমার বউ, আর তুমি জানো না' কথা শুনে আশ্চর্য হলেও চোখমুখ প্রশান্ত রাখে ওলসেন । বলে—'না, গুটিয়েরে আমার বউ নয় !

'মিথ্যুক !' দপ করে জ্বলে ওঠে ইক্‌থিয়ানডার । 'নিজের কানে শুনেছি, ছুঁচোলো গোঁফওয়ালা একজন ঘোড়সওয়ার বলছিল, গুটিয়েরে বিয়ের কনে ।'

'আমার সঙ্গে বিয়ের ?'

সব গোলমাল হয়ে যায় ইক্‌থিয়ানডারের, গুটিয়েরে যে ওলসেনের বিয়ের কনে, এমন কথা তো ঘোড়সওয়ার লোকটা বলেনি । ওরকম নোংরা চেহারার আধ বুড়ো লোকও গুটিয়েরের বর হতে পারে না । নিশ্চয় আত্মীয় । অন্য কথা পাড়ে ইক্‌থিয়ানডার ।

'কি করছ ? মুক্তো খুঁজছ বুঝি ?'

'দেখো ইক্‌থিয়ানডার, না বলে পারলাম না । তোমার প্রশ্নের ধরনগুলো আমার ভাল লাগছে না । গুটিয়েরের মুখে তোমার কথা শুনেছি বলেই এখনো দাঁড়ের এক ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছি না, কিন্তু আমি মুক্তো খুঁজছি কি জলের মধ্যে হাওয়া খাচ্ছি, সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দিতে যাবো কেন ?'

'সেই বড় মুক্তোটা খুঁজছ নিশ্চয় ? যেটা আমি জলে ফেলে দিয়েছিলাম ?'

ঘাড় কাৎ করে সায় দেয় ওলসেন ।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ইক্‌থিয়ানডার—'দেখলে তো ! আমি তখনি গুটিয়েরেকে বলেছিলাম মুক্তোটা তোমাকে দিতে । ও তখন নিল না । এখন তুমি এসেছ তার খোঁজে ।'

'এসেছিই তো । ও মুক্তো এখন তোমার সম্পত্তি নয় সমুদ্রের সম্পত্তি ।

যে প্যাবে'সে নেবে।'

'তোমার বুঝি মুক্তো খুব ভাল লাগে?

'আমি কি মেয়েছেলে? গয়না নিয়ে অত মাথাব্যথা আমার নেই।'

'কিন্তু……ঐ যে কি বলে……হ্যাঁ, বিক্রী……মুক্তো বিক্রী করে তো অনেক টাকা পাওয়া যায়? তুমি বুঝি সেইজন্যেই মুক্তোটা খুঁজছ?'

আবার নীরবে সায় দেয় ওলসেন।

'তাহলে টাকা তুমি ভালবাস? কেমন?'

বিরক্ত কণ্ঠে ওলসেন বলে—'কি বলতে চাও তুমি?'

'মুক্তোর মালাটা গুটিয়েরে তোমাকে কেন দিয়েছিল, তা জানতে চাই। ওকে তো বিয়ে করবে ঠিক করেছিলে?'

'না, ওর বিয়ে হয়ে গেছে।'

নিমেষে সমস্ত রক্ত নেমে যায় ইক্‌থিয়ানডারের মুখ থেকে।

'কার সঙ্গে? নোংরা লোকটার সঙ্গে নয় তো?'

'তার সঙ্গেই। পেড্রো জুরিটাকে বিয়ে করেছে গুটিয়েরে।'

'কিন্তু……কিন্তু……আমি তো জানতাম গুটিয়েরে আমাকে ভালবাসে।'

সহানুভূতির চোখে তাকায় ওলসেন। পাইপটা ধরাতে ধরাতে বলে—'তা বাসে।' কিন্তু তুমি তো ওর চোখের সামনেই জলে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করলে ……মানে গুটিয়েরে এখনও জানে তুমি জলে ডুবে মারা গেছ।'

সবিস্ময়ে ওলসেনের পানে তাকায় ইক্‌থিয়ানডার। সত্যিই তো, গুটিয়েরেকে তো সে কোনদিন বলেনি যে জলের মধ্যে বাস করার ক্ষমতা তার আছে। অসহ্য যন্ত্রণায় জলে ঝাঁপ দিয়েছিল ইক্‌থিয়ানডার। কিন্তু সামান্য এই ঝাঁপ দেওয়াটাই যে গুটিয়েরের চোখে আত্মহত্যা বলে মনে হতে পারে, এমন ধারণা তো ঘুণাক্ষরেও মাথায় আসেনি।

ওলসেন বলল—'কাল রাত্রে গুটিয়েরের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। তোমার আত্মহত্যা ওর মন ভেঙ্গে দিয়েছে। ওর বিশ্বাস, এজন্যে দায়ী ও নিজেই।'

'কিন্তু সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে করার দরকারটা কি ছিল? জানো, আমি ওর জীবন বাঁচিয়েছি? জল থেকে ডাঙায় তুলে জ্ঞান ফিরিয়ে এনেছি, এমন সময়ে পায়ের শব্দে পাথরের আড়ালে লুকিয়েছিলাম। ছাগলদাড়ি সেই নোংরা লোকটা এসে এমন ন্যাকামো শুরু করল যেন সমস্ত বাহাদুরি তারই।'

'গুটিয়েরের কাছে আমি তা শুনেছি। কিন্তু জল থেকে কে ওকে ডাঙায় এনেছিল, তা গুটিয়েরে বলতে পারে নি। অদ্ভুত চেহারার একটা জানোয়ারকে নাকি পলকের জন্যে দেখেছিল। তারপরেই চোখ খুলে জুরিটাকে দেখতে পায়। কিন্তু তুমি ওকে বলোনি কেন?'

'নিজের ঢাক পিটতে ভাল লাগে না আমার। কিন্তু এ বিয়েতে গুটিয়েরে রাজী হল কি করে বলো তো?'

'আমি নিজেও তা জানি না,' বললে ওলসেন।

'তোমার সব কথা আমাকে বলবে ?

'বলব। আমি কাজ করি বোতামের কারখানায়। হামেশাই গুটিয়েরে আসত শামুক আর ঝিনুক নিয়ে। দুদিনেই বন্ধু হয়ে যাই আমরা। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে একদিন গুটিয়েরের মুখে শুনি বেচারীর মন্দভাগ্যের কথা। টাকার কুমীর এক স্প্যানিয়ার্ড নাকি ওকে বিয়ে করার জন্যে জ্বালিয়ে মারছে।'

'জুরিটা ?'

'হ্যাঁ। গুটিয়েরের বাবার অমত নেই তাতে। এরকম পাত্র পেলে মেয়ের বাপরা নাকি লুফে নেয়।'

'ছাই। ভালটা কোথায় শুনি ? নোংরা, আধবুড়ো, কদাকার, গায়ে গন্ধ…' ইক্‌থিয়ানডার আর সামলাতে পারে না নিজেকে। 'গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে পার না হতভাগাকে ? চেহারাটা তো দিব্যি বাগিয়েছ, দুচারটে রন্দা দিতে পার নি ?'

হেসে ফেলে ওলসেন। ইক্‌থিয়ানডার তো নির্বোধ নয়, কিন্তু কথাবার্তা একেবারেই ছেলেমানুষের মত।

বলে—'বলা সোজা, কিন্তু বালতাসার আর জুরিটা পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দিলে তো আমার দফারফা। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলব কি ?'

কৈফিয়ৎটা মনঃপুত হয় ইক্‌থিয়ানডারের।

বলে—'পালিয়ে গেলেই তো পারত গুটিয়েরে ?'

'তা পারত, সত্যি কথা বলতে কি, সেই চেষ্টাই করেছিলাম আমরা। বেশ কিছুদিনের জন্যে উত্তর আমেরিকায় থাকার মতলব ছিল আমার। গুটি-য়েরেকে আমার সঙ্গে আসতে বলেছিলাম।

'তারপর বুঝি তাকে বিয়ে করতে ?'

আবার হেসে ফেলে ওলসেন—'কি বোকা তুমি! বললাম না, আমরা বন্ধুর মত ছিলাম। পরে অবশ্য কি হত, তা কি করে বলি বলো ?'

'গেলে না কেন ?'

'টাকা ছিল না বলে।'

'হরক্‌স্‌-য়ে যেতে কি এত টাকা লাগে ?'

'তুমি কি আকাশ থেকে পড়ছ না, চাঁদ থেকে আসছ ? লাখোপতি না হলে হরক্‌স্‌-য়ে যাওয়ার কপাল কারো থাকে ?'

অপ্রস্তুত মুখে চুপ করে যায় ইক্‌থিয়ানডার। বোকার মত আর প্রশ্ন না।

'বড় জাহাজ কেন, ছোট ডিঙ্গিতেও যাওয়ার টাকা আমাদের ছিল না। মহা মুশকিলে পড়লাম। গুটিয়েরে ঠিক করলে মুক্তোর মালাটা বেচে দেবে।'

'হায়রে, আগে যদি জানতাম!' অস্ফুটকণ্ঠে বলে ইক্‌থিয়ানডার, মনে পড়ে

যায় জলতলের রত্নভাণ্ডারে সঞ্চিত মুক্তোর স্তুপ।

মুখে বলে—'কিছু না, বলো তুমি।'

'বাড়ী থেকে পালানোর সব ঠিকঠাক, এমন সময়ে—'

'আমাকে ফেলে রেখেই পালানোর মতলব হয়েছিল বুঝি ?'

'এসব ঘটেছে তুমি আসার আগে। পরে অবশ্য গুটিয়েরের ইচ্ছে হয়েছিল তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার।'

'কিন্তু তোমার সঙ্গে যাওয়া কেন ? সবসময়েই তোমাকে দরকার ? কথা বলার সময়ে, বেড়ানোর সময়ে, নেকলেস দেওয়ার সময়ে, আমি যেন বানের জলে ভেসে এসেছি……'

'তোমার সঙ্গে আলাপ মাত্র কদিনের। আমার সঙ্গে অনেকদিনের। তাই।'

'যাকগে সেকথা। তারপর বলো।'

'সব ঠিকঠাক। এমন সময়ে ওর নাকের ডগাতেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব ভেস্তে দিলে তুমি। জুরিটাও হাজির ছিল সেখানে। পরের দিন ভোরে কারখানায় যাওয়ার আগে সুসংবাদটা দিতে গেলাম গুটিয়েরেকে। পাথেয় জোগাড় হয়ে গেছে। সেই দিনই রাত দশটায় রওনা হতে হবে।'

'কিন্তু দারুণ উত্তেজিতভাবে বালতাসার জানালে, গুটিয়েরে বাড়ী নেই। এ তল্লাটে নেই। সেদিন সকালেই জুরিটা এসেছিল মস্ত ঝকঝকে মোটর গাড়ী নিয়ে। গুটিয়েরেকে হাওয়া খাইয়ে আনার জন্যে ডেকেছিল। গুটিয়েরে মুখের ওপরেই না বলে দ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে জুরিটা ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে দ্যায়। গুটিয়েরে আর আসবে না। জুরিটার বউ হয়ে সুখেই ঘরকন্না করবে।'

'দেখলাম, বালতাসার বিলক্ষণ খুশী। আমি রেগে গেছিলাম। বালতাসার তখন বললে, এতে দুঃখ করার কি আছে ? জুরিটার মত পাত্র কটা মেয়ের জোটে ? নিজের জাহাজ আছে, গাড়ী আছে, পারানায় নিজের বাড়ী আছে। এতক্ষণে নিশ্চয় বাড়ীতেই পেঁৗছে গেছে।'

'এক ঘুসিতে বালতাসারের দাঁতগুলো গুঁড়িয়ে দিতে পারলে না ?' দাঁত কিড়মিড় করে বলে ইক্‌থিয়ানডার।

'তোমার কথা শুনে খালি মারপিট করে বেড়াই আর কি। যাইহোক, সংক্ষেপে বলি শোনো। কায়দা করে জেনে নিলাম, জুরিটার বাড়ীর নাম 'ডোলোরেস।' বাড়ীতে আছেন বুড়িমা। তারপরেই দেখা করলাম গুটিয়েরের সঙ্গে।'

'ডোলোরেসে ?'

'হ্যাঁ।'

'জুরিটাকে খুন করে গুটিয়েরেকে নিয়ে পালিয়ে এলে না কেন ?'

'বটে, এবার দেখছি খুন জখমও এসে গেল। ভাল রে ভাল ! তুমি যে এত দাঙ্গাবাজ তা তো দেখে মনে হয় না।'

'দাঙ্গাবাজ আমি নই' বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে বলে ইক্‌থিয়ানডার। 'কিন্তু এসব শুনলে গায়ের রক্ত ফুটতে থাকে।'

'তা ঠিক,' সহানুভূতি-কোমল চোখে সায় দেয় ওলসেন। 'জুরিটা আর বালতাসার দুটোই পাকা বদমাসের ধাড়ি। দুটোকেই আচ্ছা করে চাবুক মারলে তবে রাগ যায়। কিন্তু পরিস্থিতি আরো ঘোরালো হয়ে দাঁড়িয়েছে গুটিয়েরের জন্যে। জুরিটাকে ছেড়ে যেতে সে নারাজ।'

'কি ? কি বললে ? রাজী নয় ?' ইক্‌থিয়ানডার যেন নিজের কানকেও আর বিশ্বাস করতে পারে না।

'সত্যিই, রাজী নয়।'

'কিন্তু কেন ? কেন ?'

'গুটিয়েরে জীবনে ভুলতে পারবে না তার জন্যে আত্মহত্যা করেছো তুমি। এখন বুঝেছি, ও তোমাকে ভালবাসত, সত্যিই ভালবাসত। তাই বললে, আমার যা হবার তা তো হয়েই গেল। আর কিছু চাই না। বিয়ের সময়ে আঙুলে আংটি পরিয়ে দিতে দিতে পুরুৎ বলেছিলেন ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন। এ বিয়ে ভগবানের ইচ্ছাতেই যখন হয়েছে তখন মানুষের ইচ্ছায় আর আমাদের বিচ্ছেদ ঘটবে না জানি, জুরিটার সান্নিধ্যে আমি কোনোদিনই সুখী হব না। কিন্তু তাই বলে ওকে ত্যাগ করে ঈশ্বরের শাস্তি আর মাথা পেতে নিতে পারব না।'

'ননসেন্স। বাবা বলেন, ভগবান-ফগবান ছেলেভুলোনো গল্প!' রেগে যায় ইক্‌থিয়ানডার।

'দুর্ভাগ্যক্রমে এই ছেলেভুলোনো গল্পই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে গুটিয়েরে। মিশনারীরা ওকে গোঁড়া ক্যাথোলিক বানিয়ে দিয়ে গেছে। আমি পীড়াপীড়ি করতে গেছিলাম, কিন্তু গুটিয়েরে সাফ বলে দিলে, ভগবান নিয়ে ইয়ার্কি নয়। এ সম্বন্ধে আর একটি কথা বললে আমার সঙ্গেই দেখা করা বন্ধ করে দেবে। কাজেই আমি চেপে গেলাম। তা ছাড়া ডোলোরেসে প্রাণ খুলে কথা বলার মত সুযোগও ছিল না। তা সত্ত্বেও শুনলাম আরো একটা নতুন খবর। জুরিটা নাকি বলেছে, পাখীটাকে খাঁচায় পুরেছি, এবার মাছটার পালা। মাছ বলতে নাকি বিউনোআয়ার্সের সমুদ্র-শয়তানকে বুঝিয়েছে জুরিটা। সমুদ্র-শয়তানকে একবার পাকড়াও করতে পারলেই নাকি রাজারাণী হয়ে যাবে গুটিয়েরে। তুমিই সেই সমুদ্র-শয়তান নও তো ? জলের তলায় ঘন্টার পর ঘন্টা থাকো তুমি, মুক্তো-ডুবুরীদের ভয় দেখাও ......'

হুঁশিয়ার হয়ে যায় ইক্‌থিয়ানডার। হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে লাভ নেই। প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে—'সমুদ্র-শয়তানকে ধরে ওর লাভ কি ?'

'মুক্তো তোলাবে। তুমি যদি সমুদ্র-শয়তান হও তো, সাধু সাবধান!'

'ধন্যবাদ।'

তখনও পর্যন্ত ইক্‌থিয়ানডার জানতো না খবরে কাগজে ওর কীর্তিকলাপ সম্বন্ধে বড় বড় শিরোনামা কি পরিণাম আতংকের সঞ্চার করেছে দেশময়।

'গুটিয়েরের সঙ্গে দেখা আমাকে করতেই হবে,' আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ইক্‌থিয়ানডার। 'এ দেখা যদি শেষ দেখাও হয়, তবুও আমাকে যেতে হবে। পারানা শহর আমি চিনি। পারানা নদীর ধারেই, কিন্তু ডোলোরেস-কে খুঁজে পাব কি করে?'

হদিশ বলে দিলে ওলসেন।

শক্তমুঠিতে ওলসেনের হাত ঝাঁকিয়ে বললে ইক্‌থিয়ানডার—'আমাকে ক্ষমা করো। এসেছিলাম শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে, পেলাম সত্যিকারের একজন বন্ধু। বিদায়। চললাম গুটিয়েরের কাছে।'

'এক্ষুনি নাকি?'

'হ্যাঁ, এক্ষুনি। শুভকাজে দেরী করে লাভ নেই,' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইক্‌থিয়ানডার। ঝপঝপ শব্দে সাঁতরে চলল তীরের দিকে।

গভীর সমবেদনায় কোমল হয়ে আসে ওলসেনের দুই চোখ।

# দ্বিতীয় খণ্ড

## পথ চলতে

সঙ্গে বেশী সরঞ্জাম নিল না ইক্‌থিয়ানডার। বেল্টের সঙ্গে রইল ছুরী। একই বেল্ট দিয়ে গায়ের সঙ্গে বেঁধে নিল জুতো আর কোটপ্যাণ্টের পুঁটলি। চোখে গগল্‌স্‌ আর হাতে-পায়ে দস্তানা পরে ঝাঁপ দিল জলে।

রায়ো ডি লা-প্লাটায় এসে হকচকিয়ে গেল ইক্‌থিয়ানডার। জলের মধ্যে নোঙরের শেকলের অরণ্য। পথ ঠিক রাখা যায় না। তার ওপর মোহানার মুখ বলে নদী বাহিত রাজ্যের জঞ্জাল এসে জমেছে সাগরের তলায়। কি নেই সেখানে! ডেয়োঢাকনা, টুকরোটাকরা, হোসপাইপ, পোড়া কয়লা, ছেঁাড়া পাল, টিন, ইঁট, দড়িদড়া, ভাঙা বোতল, মরা কুকুর আর বেড়াল। গা ঘিন ঘিন করতে থাকে ইক্‌থিয়ানডারের। কি নোংরা ডাঙার মানুষগুলো! নোঙরের শেকল আর বয়ার দড়ির জঙ্গলে পথ হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমুদ্র স্রোত ধরে নদীর মধ্যে ঢুকে পড়ে ইক্‌থিয়ানডার।

পলি-মাটি গোলা জলে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। খোলা মাঠে যার থাকা অভ্যাস, বদ্ধ ঘরে থাকলে তার অস্বস্তি হবেই। তফাৎটা ইক্‌থিয়ানডারও উপলব্ধি করে—উদার সমুদ্র আর সংকীর্ণ নদীর প্রভেদ হাড়ে হাড়ে টের পায়।

জল ঠেলে যেতে বিরক্ত লাগে ইক্‌থিয়ানডারের। তাই চলন্ত জাহাজের তলা আঁকড়ে ধরে। গেঁড়ি আর গুগলিতে ছাওয়া তলদেশে মস্ত মাছের মতই সাপটে থাকে। কিছুক্ষণ পরে হাত টন টন করে। জাহাজ ছেড়ে দিয়ে তলিয়ে যায়। নদীর মাছ ধরে ক্ষিদে মেটায়। সমুদ্রের মাছের মত স্বাদ নয়, কেমন জানি পলি মাটির গন্ধ। তাছাড়া ধরতে বেগ পেতে হয়। সমুদ্রের মাছের চাইতে অনেক বেশী ধূর্ত এরা। তিনটে পাথরের ফাঁকে একটু ঘুমিয়েও নেয়। ঘুম ভাঙে আগুয়ান জাহাজের শব্দে। উঠে পড়ে ইক্‌থিয়ানডার। এ জাহাজ সে জাহাজ ধরে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে পেঁাছোয় পারানা শহরে।

প্রথম পর্বটা ভালভাবেই উত্তীর্ণ হয়। এবার সবচাইতে কঠিন পর্ব—ডাঙায় যাত্রা।

পরের দিন ভোরবেলা হট্টগোলে-ভরা বন্দর থেকে খানিকটা দূরে জল ছেড়ে উঠে পড়ে ইক্‌থিয়ানডার। গগল্‌স্‌ আর দস্তানা বালির তলায় পুঁতে রেখে রোদে শুকিয়ে নেয় কোটপ্যাণ্ট। শুকনো হলে কি হবে, ইস্ত্রিবিহীন তালগোল পাকানো সুট পরে অবিকল হাঘরের মতই দেখতে হয় ওকে। কিন্তু উপায় কি?

তাছাড়া পোশাক-আশাক সম্বন্ধে তেমন সচেতনও নয় ইক্‌থিয়ানডার।

জেলেদের জিজ্ঞেস করে 'ডোলোরেস' কোথায়। কেউ কেউ ভালোভাবেই উত্তর দেয়। আবার কেউ সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে বিচিত্র পোশাকের দিকে।

কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই ইক্‌থিয়ানডারের। হাঁটছে তো হাঁটছেই। রোদের তাতে আর পথপরিশ্রমে দারুণ কষ্ট হতে থাকে। ঠিক পথেও যাচ্ছে কিনা বুঝতে পারে না। কষ্ট লাঘব করার জন্যে মধ্যে মধ্যে নদীতে ডুব দেয়। শরীর ঠাণ্ডা হলে আবার যাত্রা করে।

বেলা চারটের সময়ে দেখা হয় এক বুড়ো চাষীর সঙ্গে। ইক্‌থিয়ানডারের ক্লান্ত মুখচ্ছবি দেখে করুণা হয় তার। বলে—'এই রাস্তা ধরে সিধে যাও। দুপাশে মাঠ পড়বে। তার পরেই একটা বড় পুকুর। সাঁকো পেরিয়ে ছোট একটা পাহাড়ে উঠলেই গুঁফো ডোলোরেসের বাড়ী।'

'গুঁফো ডোলোরেস আবার কি?' অবাক হয়ে যায় ইক্‌থিয়ানডার।

'ও বাড়ীর গিন্নীর নামও ডোলোরেস। বুড়ীর মোটা মোটা এক জোড়া গোঁফ আছে—তাই গুঁফো ডোলোরেস। বড় খিটখিটে বুড়ী। তার ওপর ছেলে কোত্থেকে এক ডানাকাটা পরীকে বিয়ে করে আনার পর থেকে সব সময়েই খেপে আছে।'

বটে! গুটিয়েরের শ্বাশুড়ি-ভাগ্য তাহলে নেহাতই মন্দ। মনে মনে ভাবে ইক্‌থিয়ানডার।

'আর কত হাঁটতে হবে?'

'সন্ধ্যের আগেই পৌঁছে যাবে।'

গমভুট্টার ক্ষেতে নেমে পড়ে ইক্‌থিয়ানডার। সারাদিন পেটে দানাপানি পড়েনি। ক্ষিদের চোটে সর্ষেফুল দেখতে থাকে বেচারী। অথচ চারদিকে অঢেল খাবার সাজানো। মাঠে ভেড়া চরছে, কিন্তু টহল দিচ্ছে কুকুর, নজর রেখেছে কজন ছোকরা। পাঁচিলের ওপাশে ঝুলছে থোকা থোকা পীচ আর আঙুর। লোভনীয় রসাল খাদ্য, কিন্তু ক্ষিদে পেলেও খাওয়ার উপায় নেই। কারণ এ তো আর সমুদ্র নয়। সেখানে দু-চোখে যা দেখা যায়, দু-হাতে যা ধরা যায়, তাই নিজের সম্পত্তি। কিন্তু এখানে তা নয়। এখানে প্রতিটি জিনিস কারো না কারোর সম্পত্তি। কড়া পাহারা আর উঁচু পাঁচিলের বেড়াজালে দুর্গম। মাথার ওপর উড়ছে পাখী। ধরলে হয়। কিন্তু কে জানে, এরাও হয়ত কারো সম্পত্তি। হাঁ-হাঁ করে তেড়ে আসবে দাবীদার। আজব জায়গা বটে। ফলভরা বাগান, মাছ ভরা পুকুর, পশু আর পাখীদের মধ্যে বাস করেও মানুষ ডাঙার ওপর ক্ষিদে তেষ্টায় মরবে—তবু কিছু ছুঁতে পারবে না, নিজের বলে দাবী করতে পারবে না।

কে যেন আসছে এদিকে। ফুটবলের মত ইয়া মোটা বপু, মাথায় ধবধবে সাদা টুপী, পরনে সাদা ইউনিফর্ম, ঝকঝকে বোতাম, কোমরের বেল্টে হোলস্টার, হোলস্টারে রিভলবার, দু-হাত পেছনে মুষ্টিবদ্ধ।

কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করে ইক্‌থিয়ানডার—'ডোলোরেস আর কদ্দুর বলুন তো ?'

সন্দিগ্ধ চোখে ইক্‌থিয়ানডারের পা থেকে মাথা পর্যন্ত বার কয়েক চোখ বুলিয়ে নেয় সচল ফুটবলের মত লোকটা।

জিজ্ঞেস করে হেঁড়ে গলায়—'কি দরকারে যাওয়া হচ্ছে সেখানে ? আসাই বা হচ্ছে কোত্থেকে ?'

'আসছি বিউনোআয়ার্স থেকে।'

বিদ্যুৎ খেলে যায় বিশাল বপুর দুই চোখে।

'যাচ্ছি একজনের সঙ্গে দেখা করতে।'

'দাও দিকি, হাত দুটো একটু বাড়িয়ে দাও।' বলে সচল ফুটবল।

ডোলোরেসের হদিশ জিজ্ঞেস করার সঙ্গে হাত বাড়ানোর কি সম্পর্ক, তা ভেবে পায় না ইক্‌থিয়ানডার। তবুও সরল ভাবেই বাড়িয়ে দেয় দু-হাত।

চকিতে পকেট থেকে একজোড়া হাত কড়া বার করে ফুটবল পুরুষ। পর-মুহূর্তেই ক্লিক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ইক্‌থিয়ানডারের মণিবন্ধ ঘিরে এঁটে যায় লোহার বালা।

দু-হাত তুলে তখনো বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকে আসামী।

ঠেলা দিয়ে হেঁকে ওঠে রিভলবারধারী—'ওহে চন্দ্রবদন, এসো ডোলোরেসে যাওয়া যাক।'

'কিন্তু এটা কি ? এটা লাগালেন কেন ?' অবাক কণ্ঠে জানতে চায় ইক্‌-থিয়ানডার।

'আর ডেঁপোমো করতে হবে না, চলো,' খেঁকিয়ে ওঠে বর্তুলাকার পুরুষ।

নতমস্তকে পা বাড়ায় ইক্‌থিয়ানডার। বোঝে না কি তার অপরাধ। কেনই বা এই অকস্মাৎ দুর্ব্যবহার। গত রাত্তিরের ঘটনা জানলে অবশ্য হুঁশিয়ার হওয়া যেত। পাশের গ্রামেই ডাকাত পড়েছিল কালরাত্রে। একজন খুনও হয়েছে।

ফলে, আজ সকাল থেকেই আদাজল খেয়ে পুলিশ লেগেছে। ডাকাত ধরতেই হবে। বেচারী ইক্‌থিয়ানডার ! হাঘরের মত কোটপ্যান্ট আর ছন্নছাড়া চেহারা দেখেই খটকা লেগেছে পুলিশের।

পূর্ব-ঘটনা না জানলেও ইক্‌থিয়ানডার এটুকু বোঝে যে, সে বন্দী। স্বাধীন-ভাবে ডোলোরেসে যাওয়ার পথ বন্ধ। কুছ পরোয়া নেহি। সুযোগ পেলেই চম্পট দিতে হবে। চোখ কান খোলা রেখে পথ চলে ইক্‌থিয়ানডার।

এত সহজে ডাকাত পাকড়াও করার আনন্দে মশগুল হয়ে ধূমপান শুরু করে দ্যায় স্ফীতোদর পুলিশ। ইয়া লম্বা চুরুট থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে থাকে ইক্‌থিয়ানডার ঠিক পেছনেই। অবস্থা কারো কাহিল হয়ে আসে বেচারীর।

'শেষকালে আর থাকতে না পেরে বলেই ফ্যালে—'চুরুট টানাটা একটু বন্ধ করলে ভালো হয় না? ধোঁয়ায় দম আটকে আসছে আমার।'

'বটে! বটে! দম আটকে আসছে!' কয়েদীর স্পর্ধায় রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়ে পুলিশ প্রবর। রেগে মেগে এক মুখ ধোঁয়া ইক্‌থিয়ানডারের নাকের ওপরেই ছেড়ে দিয়ে হুংকার দ্যায়—'এখন কি রকম লাগছে? পাজী বদমাস কোথাকার! চল্‌ এগিয়ে।'

গুঁতো খেয়ে আবার পা বাড়ায় ইক্‌থিয়ানডার। অচিরেই চোখে পড়ে পুকুরটা। নিজের অজান্তেই পদক্ষেপ দ্রুত হয়ে ওঠে ইক্‌থিয়ানডারের। আবার পেছন থেকে গাল পাড়তে থাকে রিভলবারধারী। ততক্ষণে সাঁকোর ওপর উঠে পড়েছে দুজনে। সাঁকোর মাঝামাঝি আসতেই ঘটে যায় সেই অভাবনীয় ঘটনা।

আচম্বিতে রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে ইক্‌থিয়ানডার। পর মুহূর্তেই রেলিং টপকে টুপ করে গিয়ে টুপ করে গিয়ে পড়ে জলে।

এরকম একটা ঘটনার জন্যে মোটেই তৈরী ছিল না পুলিশম্যান। কয়েদীরা অনেক রকম ভাবেই পালানোর চেষ্টা করে কিন্তু হাতকড়িবদ্ধ অবস্থায় জলে ঝাঁপিয়ে পড়া···নাঃ, কালে কালে হলো কি?

এর পরেই অবাক হবার পালা ইক্‌থিয়ানডারের। সাঁকোয় দাঁড়িয়ে খামোকা না চেঁচামেচি করে ইক্‌থিয়ানডারের পিছু পিছু তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশম্যান। হাত কড়ি লাগানো অবস্থায় কয়েদী জলে ডুবে মরলে ওপর-ওলার কাছে জবাবদিহি করার ঝক্কি তো কম নয়। তার চাইতে বরং চুলের মুঠি ধরে ব্যাটাকে ডাঙায় তোলা যাক।

সত্যি সত্যিই ইক্‌থিয়ানডারের লম্বা চুল মুঠি পাকিয়ে ধরে হেঁৎকা পুলিশ-পুঙ্গব। ইক্‌থিয়ানডার দেখলে, ভারী বিপদ। জোর করে চুল ছাড়ানোর চেষ্টা না করে সে একডুবে পেঁাছে গেল পুকুরের একদম তলায়, টানের চোটে পুলিশ বেচারীকেও নামতে হল। তারপর বেগতিক দেখে চুল ছেড়ে ভেসে উঠল ফুটবল বপু। সাঁতরে এসে উঠল তীরে।

খানিক দূরে গিয়ে মাথা তোলে ইক্‌থিয়ানডার। মাথা দেখেই গাঁক-গাঁক করে চেঁচিয়ে ওঠে পুলিশম্যান—'মরবি তুই, জল খেয়েই মরবি! উঠে আয় বলছি, আয় উঠে।'

ইক্‌থিয়ানডার দেখলে মজা মন্দ নয়। তক্ষুনি 'বাঁচাও, বাঁচাও ডুবে গেলাম,' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে আবার ডুব দেয়।

জলের তলা থেকেই দ্যাখে ইক্‌য়িনডার, বার কয়েক জলে ঝাঁপ দিল পুলিশ-ম্যান। বৃথা খোঁজাখুঁজি করে উঠে এল তীরে। এতক্ষণে অক্কা পেয়েছে আসামী। পুকুরের তলায় কোথাও আটকে রয়েছে লাশটা। এখন লাশ না ভেসে ওঠা পর্যন্ত এখানেই পাহারা দেওয়া তার কর্তব্য।

পাশ দিয়ে অশ্বতরের পিঠে চেপে যাচ্ছিল একজন চাষী। পেট মোটা পুলিশ-

ম্যান তার হাত দিয়ে একটা চিরকুট পাঠিয়ে দিলে স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে।

অবস্থা ক্রমশ ঘোরালো হতে থাকে। বেচারী ইক্‌থিয়ানডার। গোদের ওপর বিষফোড়ার মত জোটে নতুন উৎপাত। ঝাঁকে ঝাঁকে জোঁক রক্তের গন্ধ পেয়ে ছেঁকে ধরে তাকে। এক হাতে আর কত লড়াই করবে ইক্‌থিয়ানডার। বেশী লাফালাফিও করা চলে না। জল তোলপাড় হলেই ঝাঁপ দেবে পুলিশ হতচ্ছড়া।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই অশ্বতর হাঁকিয়ে ফিরে এল পত্রবাহক চাষী। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পোঁছে গেল তিনজন পুলিশ। দুজনের মাথায় একটা হাল্কা নৌকা। তৃতীয় জনের কাঁধে দাঁড় আর জাল।

নৌকো জলে ভাসিয়ে জাল ফেলে পুলিশপুঙ্গবেরা। লুকোচুরি খেলতে থাকে ইক্‌থিয়ানডার। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেদম হয়ে পড়ে পুলিশ। ফুটবলের মত চেহারা নিয়ে আশ্চর্য লাফ দিতে দিতে চেঁচাতে থাকে যত নষ্টের গোড়া প্রথমজন। এরকম কাণ্ড সে বাপের জন্মে দেখেনি। বেমালুম লাশ উধাও!

লাফঝাঁপ দেখে মজা লাগে ইক্‌থিয়ানডারের। কিন্তু মজা বেশীক্ষণ থাকে না। জাল টানা টানি করে জল ঘুলিয়ে দিয়েছে পুলিশ। মেঘের মত কাদাগোলা জল ছড়িয়ে পড়ছে পুকুরময়। অন্ধকার হয়ে যায় জলতল। হাতখানেক দূরেও আর দৃষ্টি চলে না। অবস্থা ক্রমশ সঙীন হয়ে ওঠে।

এর পরেই সহ্য শক্তির শেষ সীমায় পোঁছায় ইক্‌থিয়ানডার। নিঃশ্বাসের কষ্ট উপস্থিত হয়। কাদাগোলা জলে দম আটকে আসতে থাকে।

অসহ্য! অসম্ভব! আর পারে না ইক্‌থিয়ানডার। বুকটা বুঝি এবার ফেটে যাবে। মাথা ঘুরছে। চোখ অন্ধকার। গুঙিয়ে ওঠে ইক্‌থিয়ানডার। কয়েকটা বুদবুদ মুখ থেকে উঠে যায় ওপরে। কি করবে ইক্‌থিয়ানডার? ভেসে উঠবে? তাছাড়া আর উপায় কি? জলের নিচে দম বন্ধ হয়ে মরার চাইতে পুলিশের হাতে কয়েদ হওয়াও ভাল। যা থাকে কপালে, হুড়মুড় করে জলের ওপর ভেসে ওঠে ইক্‌থিয়ানডার।

বিকট চীৎকার করে ওঠে নৌকোর পুলিশরা। ঝপাঝপ জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে ওঠে তীরে। একজন মুখ থুবড়ে পড়ে কাদার ওপর এবং সেই আবস্থাতেই তারস্বরে ভগবান যিশুকে ডাকতে থাকে।

ডাঙার ওপর দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে দুজন পুলিশম্যান।

ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে মুখে একে অপরের পেছনে লুকোবার চেষ্টা করে। আর সমানে 'রামনাম' জপার মত ভগবানকে ডাকতে থাকে।

এরকম দৃশ্যের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিল না ইক্‌থিয়ানডার। তাই হকচকিয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্যে। পরক্ষণেই মনে পড়ে স্প্যানিয়ার্ডদের কুসংস্কার বৃত্তান্ত। বলির পাঠার মত কাঁপতে কাঁপতে হতভাগারা ভাবছে নিশ্চয়, ইক্‌থিয়ানডারের প্রেতাত্মা রাগ করে জল ছেড়ে উঠে আসছে তাদের ঘাড় মটকাবার জন্যে!

এত দুঃখেও হাসি পায় ইক্‌থিয়ানডারের। কিন্তু হাসলে চলবে না।

সুযোগ যখন এসেছে, তখন তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। দাঁত খিঁচিয়ে চোখ ঘুরিয়ে ভাঙা গলায় পিলে চমকানো হুংকার ছাড়ে ইক্‌থিয়ানডার। গায়ের রক্ত জল করা সেই চীৎকার শুনে দাঁত কপাটি লাগার উপক্রম হয় পুলিশপুঙ্গবের। জল ছেড়ে ডাঙায় ওঠে ইক্‌থিয়ানডার। একটুও তাড়াহুড়ো না করে পায়ে পায়ে রাস্তার দিকে এগোয় এবং রাস্তা ধরেই হাঁটতে থাকে ডোলোরেস অভিমুখে।

পিছু নেবে কি, ভূতের চেঁচানি শুনে পুলিশপুঙ্গবদের কর্তব্যজ্ঞান তখন মাথায় উঠেছে।

## আহত ইক্‌থিয়ানডার

ছেলের বউ দেখে মুখ বেঁকিয়েছে বুড়ী ডোলোরেস। ঈগল-পাখীর মত নাক আর স্পষ্ট গোঁফ-জোড়ার নিচে রক্তিম ঠোঁটে তাচ্ছিল্যই প্রকাশ পেয়েছে। শুধু রূপ থাকলেই তো হল না, গুণ কত তা দুদিন হেঁসেল ঠেললেই মালুম হবে।

চাঁদের আলোয় বাগানে এই সব কথাই ভাবছিল ডোলোরেস। এমন সময়ে ভয়ে সিঁটিয়ে উঠল একটা মাথা দেখে।

বেড়ার ওদিকে প্রথম উঁকি দিল মাথাটা। তারপর বেড়া টপকে ভেতরে ঢুকল একটা ছায়ামূর্তি। চাঁদের আলোয় এবার স্পষ্ট দেখা গেল তার উঞ্জু চেহারা আর হাত কড়া। পা টিপে টিপে চোরের মত একটা জানলার নিচে এসে দাঁড়াল আগন্তুক। তারপর চাপা কণ্ঠে ডাকলে—'গুটিয়েরে।'

নিমেষে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল ডোলোরেস। বটে! জেল পালিয়ে এসেছো আমার বাড়ী পিরীত করতে! আর বলিহারি যাই পেড্রোর। এমন মেয়ে ঘরে আনলি যাকে ডাকতে চোর ছ্যাঁচোর রাত বিরেতে হানা দেয় বাড়ীতে! ছিঃ ছিঃ বংশের নাম ডোবোলি!

চুপি চুপি বাড়ীর ভেতরে ডোলোরেস। জুরিটাকে ডেকে বলে ফিসফিস করে—'শিগগির আয়। জেল পালানো কয়েদী বাগানে ঢুকে তোর বউকে ডাকছে।'

আর যায় কোথা! এমনভাবে তাড়াক করে লাফিয়ে উঠে বন্দুকের গুলীর মত ছুটে বেরিয়ে এল জুরিটা, যেন বাড়ীতে আগুন লেগেছে। ছুটতে ছুটতে পায়ের কাছে একটা শাবল পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিলে হাতে।

দেওয়ালের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে এক ছায়ামূর্তি। চাঁদের আলোয় চকচক করছে হাতের হাতকড়া, দৃষ্টি জানলার দিকে।

'তবে রে!' বলে দমাস করে মাথায় ওপর শাবলের এক ঘা বসিয়ে দিলে জুরিটা। আগন্তুকের মুখ দিয়ে সামান্য কাতরোক্তিও বেরোলো না, নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়ল মাটির ওপর।

'খতম!' বললে জুরিটা।

'আপদ গেল,' এমন তৃপ্তির সঙ্গে বললে বুড়ী ডোলোরেস যেন এইমাত্র একটা কাঁকড়া বিছে মারল গুণধর ছেলে।

'লাশটাকে ফেলি কোথায় ?' মাকে জিজ্ঞেস করে ছেলে।

'পুকুরে,' পথ বাতলে দেয় মা। 'জল খুব গভীর।'

'ভেসে উঠবে।'

'পাথর বেঁধে দিলেই হবে। দাঁড়া, আসছি।'

দৌড়ে বাড়ীর মধ্যে গেল ডোলোরেস। কি মুস্কিল ! একটাও থলি নেই। সমস্ত থলি আজ সকালেই গম ভর্তি করে আটাকলে পাঠানো হয়েছে। খুঁজে পেতে বালিশের একটা ওয়াড় নিয়ে আসে ডোলোরেস।

'থলি নেই। ওয়াড়ে পাথর ভরে হাত কড়ায় বেঁধে দে।'

নীরবে লাশটা পিঠে নিয়ে পুকুরের ধারে আসে জুরিটা।

'রক্তের দাগ না থাকে,' হুঁশিয়ার করে দেয় মা।

'জল ঢেলে ধুয়ে দিও,' জবাব দেয় ছেলে।

দ্রুত হাত চালায় জুরিটা। ওয়াড়ে পাথর ভরে বেশ করে বেঁধে দ্যায় হাত-কড়ায়। তারপর সব সমেত ছুঁড়ে ফেলে দ্যায় গভীর জলে।

'জামা কাপড়গুলো পালটে নিই,' আকাশের দিকে চোখ তুলে বলে জুরিটা। 'মেঘ করছে। এখুনি বৃষ্টি হবে—রক্তের দাগ আপনা থেকেই ধুয়ে যাবে।'

গরমে আর মশার কামড়ে ঘুম আসছিল না গুটিয়েরের। তার ওপর দুর্বিষহ সেই চিন্তা—ইকথিয়ানডারের হত্যাকারী সে। শান্ত-নয়ন একান্ত সরল সেই ছেলেটিকে আত্মহত্যা করিয়েছে গুটিয়েরে।

শ্বশুর বাড়ীর কাউকে ভালবাসতে পারেনি সে। না স্বামীকে না শাশুড়ীকে। অথচ একই বাড়ীতে ঘরকন্না করতে হচ্ছে দুজনকে, করতে হবে আমৃত্যু।

ঠিক এমনি সময়ে মনে হল যেন ইকথিয়ানডার তার নাম ধরে ডাকছে। তারপরেই শোনা গেল নতুন শব্দ। কারা যেন ফিস ফিস করে কথা বলছে। তারপর সব চুপ। কান খাড়া করে রইল গুটিয়েরে। কিন্তু আর কিছুই শোনা গেল না। ভুল, মনের ভুল !

তবুও সমস্ত রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না গুটিয়েরে। ভোরের দিকে মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য এলো বাগানে। বড়ো হাওয়ার মেঘ উড়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি হয়নি। ঘাসের ওপর শিশিরবিন্দু মাড়িয়ে খালি পায়ে হাঁটে গুটিয়েরে।

তারপরেই পা-দুটো যেন স্ক্রু-আঁটা হয়ে যায় মাটির সঙ্গে। জানলার সামনেই বালির ওপর চাপচাপ রক্ত। শুকনো, জমাট।

খুন। কাল রাতেই কেউ খুন হয়েছে এখানে। তাছাড়া রক্তের দাগের আর কোনো মানে থাকতে পারে না।

যন্ত্র-চালিতের মত রক্তের দাগ অনুসরণ করে পুকুর পাড়ে এসে দাঁড়ায়। খুনের প্রমাণ-টমাণ পুকুরের মধ্যে লুকানো নেই তো?

এই ভেবেই সবুজ-সবুজ জলের দিকে তাকিয়ে ছিল গুটিয়েরে। তাকিয়ে আর দৃষ্টি ফেরাতে পারেনি।

সবুজ জলে ভাসছে একটা মুণ্ডু। নিষ্পলক দৃষ্টি গুটিয়েরের ওপর নিবদ্ধ। ইক্‌থিয়ানডারের মুখ। মাথার ওপর দগদগে ক্ষত। বেদনায় আনন্দে বিচিত্র মুখচ্ছবি।

ভেবে ভেবে গুটিয়েরে কি শেষে পাগল হয়ে গেল? ছুটে পালিয়ে যেতে চাইল গুটিয়েরে, কিন্তু নড়তে পারল না। দৃষ্টিও সরাতে পারল না ভাসমান মুণ্ডুর ওপর থেকে।

ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে জলের ওপরে উঠে আসছিল ইক্‌থিয়ানডার। বলয়াকারে জল তরঙ্গ ছড়িয়ে অবশেষে অর্ধেক উঠে আসে সে—হাত বাড়িয়ে দেয় গুটিয়েরের দিকে। ম্লান হেসে বলে—'গুটিয়েরে! গুটিয়েরে!' কিন্তু কথা শেষ হয় না।

দু হাতে গলা আঁকড়ে ধরে ভয় বিকৃত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে গুটিয়েরে—'চলে যাও! চলে যাও! মরেও কেন ভুলতে পারছো না আমাকে। ভূত হয়ে কেন এসেছো আমার কাছে?'

'গুটিয়েরে! গুটিয়েরে! আমি মরিনি। আমি ভূত নই,' ঝটিতি জবাব দেয় প্রেতমূর্তি, 'আমি ডুবে মরিনি। আমার সব কথা তুমি জানো না বলেই ভেবেছিলে আমি মরে গেছি···আমি তোমাকে বলিনি···যেও না, লক্ষীটি, কথা শোনো···আমি বেঁচে আছি···ছুঁয়ে দ্যাখো, আমি ভূত নই······'

দুহাত সামনে বাড়িয়ে দ্যায় ইক্‌থিয়ানডার। আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে গুটিয়েরে।

'ভয় পেও না······আমি বেঁচে আছি···আমি জলের মধ্যে থাকতে পারি। আমি আর সবাইয়ের মত নই। মরবার জন্যে আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিই নি। ডাঙার ওপরে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল বলেই জলে ফিরে গেছিলাম।'

দম নিয়ে আবার অসংলগ্ন ভাবে বলে চলে ইক্‌থিয়ানডার—'তোমার কাছেই এসেছিলাম আমি। কাল রাতে তোমার স্বামী আমার মাথায় ডাণ্ডা মেরে জলে ফেলে দ্যায়। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকছিলাম—এই আমার অপরাধ। জলের মধ্যে জ্ঞান ফিরে আসে আমার। পাথর ভর্তি থলির দড়ি দাঁত দিয়ে কেটেছি। কিন্তু হাতের এই লোহা কিছুতেই খুলতে পারছি না।'

আস্তে আস্তে ভয় কেটে যায় গুটিয়েরের, বিশ্বাস করে ইক্‌থিয়ানডারের কথা।

বলে—'হাতকড়া পরেছ কেন?'

'সে অনেক কথা, পরে বলব। চলো আমরা পালাই। বাবার কাছে তোমাকে লুকিয়ে রাখব, কেউ টের পাবে না। দুজনে এক সঙ্গে থাকব। আমার হাত

ধরে দ্যাখো গ্যুটিয়েরে···আমি মানুষ ···সমুদ্র-দানব নই···ওলসেন বললে আমি নাকি সমুদ্র-দানব, তোমরা আমাকে ভয় পাও···কিন্তু আমি মানুষ···'

আপাদমস্তক কাদা মেখে পাড়ে উঠে আসে ইক্‌থিয়ানডার। ধপ করে বসে পড়ে ঘাসের ওপর।

ঈষৎ ঝুঁকে ইক্‌থিয়ানডারের দুহাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নেয় গ্যুটিয়েরে।

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বলে—'বেচারা!'

'বাঃ! বাঃ! কি চমৎকার মিলন!' আচম্বিতে শ্লেষ তীক্ষ্ম স্বর ভেসে আসে পেছন থেকে।

সচমকে দুজনেই ফিরে তাকায়। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে জুরিটা··· কদাকার হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ।

গ্যুটিয়েরের মত জুরিটাও সারা রাত ঘুমোতে পারেনি। ভোরের দিকে হঠাৎ গ্যুটিয়েরের চীৎকার শুনে ছুটে আসে বাগানে। এসেই দ্যাখে এই দৃশ্য। আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখেছে সে, সব শুনেছে। সমুদ্র-দানব দোরগোড়ায় হাজির—এ যে ভাবাও যায় না। তক্ষুনি ইক্‌থিয়ানডারকে চ্যাংদোলা করে জেলীফিশে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হয় পেড্রো জুরিটার।

মুখে বলে—'বাপু হে, উদ্দেশ্য তোমার খুবই মহৎ। কিন্তু গ্যুটিয়েরেকে তো ডক্টর স্যালভেটরের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া চলবে না। সে যে আমার বিয়ে করা বউ। তাছাড়া তোমাকে পুলিশ খুঁজছে।'

'কিন্তু আমি তো কিছুই করিনি।'

'কিছু না করলে কি আর পুলিশ মিছিমিছি কাউকে হাতকড়া পরায়? আমার হাতে যখন পড়েছো, তখন পুলিশের জিম্মায় তোমাকে না দেওয়া পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই।'

'কখ্‌খনো না,' কণ্ঠে ঘৃণার গরল উগরে বলে গ্যুটিয়েরে।

'আমার যা কর্তব্য, তা আমি করবই।' যেন নেহাতই নাচার, এমনি ভাবে কাঁধ ঝাঁকায় জুরিটা।

এবার ঘটনাস্থলে নাটকীয় আবির্ভাব ঘটে বুড়ী ডোলোরেসের। কাংস কণ্ঠে বলে—'ছিঃ ছিঃ ছিঃ, জেল পালিয়ে এসে ঘরের বউ নিয়ে ভাগবার মতলব?'

গ্যুটিয়েরে স্বামীর দুহাত তুলে নিয়ে মিনতি মাখানো কণ্ঠে বলে—'আমার একটা কথা রাখো। ওকে ছেড়ে দাও। আমি তো তোমার ক্ষতি করিনি ...'

পাছে সুন্দর মুখ দেখে ভুলে যায়, তাই ছেলের উদ্দেশ্যে অকস্মাৎ তীব্র কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে ডোলোরেস—'না, না, পেড্রো। ওসব ছেনালীতে ভুলিসনি।'

'কিন্তু মেয়ে মানুষের কথা যে আমি ঠেলতে পারি না,' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জুরিটা। 'বেশ তোমার যা ইচ্ছে তাই হবে।'

'আরে স্ত্রৈণ কোথাকার ! কাল বিয়ে করেই আজ আঁচল ধরা হয়ে গেলি ।' প্রায় লাফাতে থাকে বুড়ী ডোলোরেস ।

'তুমি থামো, মা । শোনো হে ছোকরা, তোমার হাতকড়া আমি উকো দিয়ে কেটে দিচ্ছি । আমার জাহাজে রায়ো ডি-প্লাটায় গিয়ে তোমাকে ছেড়েও দেবো । কিন্তু একটা সর্ত । গুটিয়েরেকে ভুলে যেতে হবে । গুটিয়েরে, তুমি আমার ঘরেই থাকবে । অনেক সুখে থাকবে ।'

'তুমি এত ভালো,' ছলছল চোখে বলে গুটিয়েরে ।

গোঁফে মোচড় দিয়ে বউয়ের দিকে তাকিয়ে নীরবে মিটিমিটি হাসতে থাকে জুরিটা ।

এ হাসি ডোলারেস চেনে । ছেলের নাড়ী-নক্ষত্র সে জানে । তাই বোঝে, কপট দাক্ষিণ্যের তলে নয়া মতলব ভাঁজছে গুণধর পুত্র । বাইরে নিজের ভূমিকাটুকু সুচারুভাবেই অভিনয় করে যায় । গজগজ করতে করতে বলে—'আঁচল ধরেই থাক্ তুই । আর তোর চোখের সামনেই গোল্লায় যাক তোর ডানাকাটা বউ ।'

## পুরোদমে চালাও !

ক্রিস্টো বলল—'আগামীকাল স্যালভেটর আসছেন । জ্বরে পড়েছিলাম বলে অনেকদিন আসতে পারিনি । অনেক কথাও বলা হয়নি, কথার মধ্যে কথা বলো না, সব ভুলে যাব ।'

জ্বর ছেড়ে গেলেও তখনো দুর্বলতা যায়নি ক্রিস্টোর । তাই দম নিয়ে আবার আরম্ভ করে :

'জুরিটার জন্যে কম করিনি আমরা । দুজনেরই নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরোচ্ছে সে । সমুদ্র-শয়তানকে ও জালে ফেলতে চায় অনেক কারণে—'

কথা বলতে উদ্যত হয় বালতাসার । কিন্তু হাতের ইঙ্গিতে থামিয়ে দেয় ক্রিস্টো ।

'সবুর সবুর, বললাম যে কথার মাঝে কথা বললে যা বলতে এসেছি ভুলে যাব । জুরিটা সমুদ্র-শয়তানকে গোলাম বানাতে চায় । কিন্তু জানো কি, সমুদ্র-শয়তান একাই আমাদের টাকার পাহাড়ে বসিয়ে দিতে পারে ? সমুদ্রের তলা থেকে এন্তার মণিমুক্তো তো বটেই, ডুবো ধনরত্নও তুলে আনতে পারে আমাদের জন্য । আমাদের বলতে আমার আর তোমার জন্যে । জুরিটার জন্য নয় । আরো একটা খবর শুনে রাখো । ইক্‌থিয়ানডার গুটিয়েরেকে ভালবাসে ।'

আবার কথা বলতে যায় বালতাসার । আবার থামিয়ে দেয় ক্রিস্টো ।

'যা বলি মুখ বন্ধ করে শোনো । ইক্‌থিয়ানডার গুটিয়েরেকে ভালবাসে । গুটিয়েরেও ইক্‌থিয়ানডারকে ভালবাসে । আমি সব জেনেও কিছু বলি না । লুকিয়ে চুরিয়ে ওরা দেখা সাক্ষাৎ করুক । জামাই হিসেবে ইক্‌থিয়ানডারকে পাওয়া ভাগ্যের কথা ।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বালতাসার। যেন তারও কিছু বলার আছে।

ক্রিস্টো বলে—'শুধু এই নয়। অনেক দিনের একটা ঘটনা তোমাকে বলছি। বিশ বছর আগে তোমার স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ী ফিরছিলাম। তোমার শ্বাশুড়ীকে গোর দিতে পাহাড়ে গেছিলাম আমরা। ফেরবার পথে তোমার স্ত্রী মারা যায় একটা মরা ছেলে প্রসব করে। তখন আমি তোমাকে এর বেশী কিছু বলিনি মনে কষ্ট পাবে বলে। এখন বলি শোনো। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও বেঁচে ছিল ছেলেটা। কিন্তু এমন রুগ্ন, এমন কাহিল যে বলবার নয়। একজন বুড়ী বললে, গ্রামের কাছেই নাকি একজন মানুষ-দেবতা আছে। যাদুকরের মতই মানুষের রোগ সারাতে পারে সে। শুনে ছেলেকে নিয়ে গেলাম সেখানে।'

কান খাড়া করে শুনতে থাকে বালতাসার।

'ছেলেকে কোলে তুলে স্যালভেটর মাথা নেড়ে বললেন—বাঁচানো কঠিন। তা সত্ত্বেও ছেলে কোলে ভেতরে গেলেন। রাত পর্যন্ত বসে রইলাম আমি। তারপর একজন নিগ্রো বেরিয়ে এসে বললে, ছেলে মারা গেছে। আমিও চলে এলাম বাড়ীতে।

'ছেলে কোলে স্যালভেটরের কাছে যাওয়ার সময়ে বাচ্ছার ঘাড়ের কাছে একটা জরুল চিহ্ন দেখেছিলাম। মামুলি চিহ্ন নয়, বিশেষ আকারের। তাই দাগটা মনে ছিল আমার।'

দম নেয় ক্রিস্টো। বলে—'কিছুদিন আগে জখম হয়ে বাড়ী ফেরে ইক্‌থিয়ানডার। ঘাড়ের কাছে ব্যাণ্ডেজ করার সময় হুবহু সেই রকমই জরুল চিহ্ন দেখতে পাই আমি।'

উত্তেজনায় বড় বড় চোখে বালতাসার বলে—'তার মানে ইক্‌থিয়ানডার আমার ছেলে?'

'চেঁচিও না। আমার তাই বিশ্বাস। স্যালভেটর মিথ্যে বলেছিলেন। তোমার ছেলে মরেনি। রোগা ছেলেটাকেই উনি সমুদ্র-দানব করেছেন।'

'খুন করব! খুন করব স্যালভটরকে!' তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে বালতাসার।

'আঃ, স্যালভেটরের ক্ষমতা তোমার চাইতে ঢের বেশী। খুন করা অত সোজা নয়। ভুল আমারও হতে পারে! বিশ বছর আগের ঘটনা। একই রকম জরুল চিহ্ন অন্য কারুর থাকবে না, এমনও হতে পারে না। মোট কথা ইক্‌থিয়ানডার তোমার ছেলে হতেও পারে, নাও হতে পারে। কাজেই যা বলি মাথা ঠাণ্ডা করে শোনো। স্যালভেটরের কাছে ছেলেকে ফেরৎ চাও। ইক্‌থিয়ানডার যে তোমার ছেলে, আমি তার সাক্ষী। যদি সোজা আঙুলে ঘি না ওঠে, বেঁকা পথ ধরবে। হুমকি দেবে, ছেলের ওপর ছুরী চালিয়ে তাকে পঙ্গু করার অপরাধে তুমি মামলা করবে। দরকার হলে কোর্টেও যাবে। কোর্ট থেকে যদি ছেলে ফিরিয়ে না দেয়, তাহলে গুটিয়েরের সঙ্গে ইক্‌থিয়ানডারের বিয়ে দিয়ে

দিলেই ল্যাটা চুকে যাবে। গুটিয়েরে তো আর তোমার নিজের মেয়ে নয়, পরের মেয়েকে নিজের মত মানুষ করেছ……'

ঘরময় পায়চারী শুরু করে দিয়েছিল বালতাসার।

'আমার ছেলে! আমার ছেলে! ওঃ কি কপাল আমার!'

'কেন তোমার কপালটা খারাপ কিসের?'

'তোমার সব কথাই শুনলাম। এবার আমার কথা শোনো। জ্বরে পড়েছিলে তাই জানো না। পেড্রো জুরিটার সঙ্গে গুটিয়েরের বিয়ে হয়ে গেছে।'

মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়লেও বুঝি অতটা অবাক হত না ক্রিস্টো।

বালতাসার বলে—'শুধু তাই নয়। ইক্‌থিয়ানডার এখন জুরিটার হাতে।'

'অসম্ভব। হতেই পারে না।'

'তাই হয়েছে। এই মুহূর্তে ইক্‌থিয়ানডার রয়েছে জেলীফিশে। আজ সকালেই এসেছিল জুরিটা। টিটকিরি দিয়ে বলে গেল, আমরা নাকি তাকে বোকা বানাবার মতলবে ছিলাম। সমুদ্র-দানব তাই বাড়ী গিয়ে ধরা দিয়েছে। কাজেই আমাদের এক পয়সাও দেবে না। চাইও না। আমার ছেলেকে আমি বিক্রি করব না।'

ঘরময় খ্যাপা ষাঁড়ের মত ছুটোছুটি করতে লাগল বালতাসার।

ক্রিস্টো বললে—'যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন শোনো। কাল ভোরেই পেঁৗছে যাচ্ছেন স্যালভেটর। তুমি তীরে দাঁড়িয়ে থাকবে। সবাই মিলে ইক্‌থিয়ানডারকে ফিরিয়ে আনবই। তবে দোহাই তোমার। স্যালভেটরের সামনে নিজেকে ইক্‌থিয়ানডারের বাপ বলে জাহির কর না। কোন দিকে গেছে জুরিটা?

'তা বলেনি, তবে আমার মনে হয় উত্তর দিকে। পানামার উপকূলে মুক্তো তোলার ইচ্ছে ওর অনেক দিনের।'

'ঠিক আছে। কাল ভোর থেকেই তীরে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

ফিরে আসে ক্রিস্টো। সমস্ত রাত ভেবে ভেবে একটা গল্প বানিয়ে রাখে। স্যালভেটরের চোখে ধুলো দেয়া খুবই কঠিন। কিন্তু এছাড়া আর তো উপায়ও নেই।

ভোরবেলা আস্তানায় ফেরেন স্যালভেটর। কাঁচুমাচু মুখে সামনে দাঁড়ায় ক্রিস্টো।

বলে—'একটা খারাপ খবর আছে। ইক্‌থিয়ানডারকে পই পই করে বারণ করেছিলাম উপসাগরের মধ্যে না যেতে…'

'কি হয়েছে তার?' চকিতে প্রশ্ন করেন স্যালভেটর।

'ইক্‌থিয়ানডার ধরা পড়েছে। স্কুনারে তুলে ওকে—'

নিমেষে দপ করে জ্বলে ওঠে স্যালভেটরের দু'চোখ। খপ ধরে ক্রিস্টোর কলার খামচে ধরে পলকহীন সন্ধানী চোখে তাকান ওর চোখের পানে। কত-

ক্ষণই বা, কিন্তু তার মধ্যেই ব্রিষ্টোর মনে হয় অন্তরের ভেতর পর্যন্ত দেখে নিলেন স্যালভেটর। গ্রন্থিল ললাটে বিড় বিড় করলেন। তারপর মুঠি আলগা করে বললেন—'সব কথা পরে শুনবো।'

হাঁক শুনেই দৌড়ে আসে একজন নিগ্রো। অজানা ভাষায় দুচারটে কথা বলেই ফিরে তাকাল ক্রিষ্টোর দিকে—'এস আমার সঙ্গে!'

এতটা পথ এসে বিশ্রাম নেওয়ার ধার দিয়েও গেলেন না স্যালভেটর। এমন কি জামাকাপড়ও পালটালেন না। বাড়ী থেকে বেরিয়ে হন হন করে এগোলেন বাগানের দিকে। পায়ে পায়ে চলতে গিয়ে প্রায় ছুটতে হল ক্রিষ্টোকে। তিন নম্বর পাঁচিলের কাছে সঙ্গ নিল দুজন নিগ্রো।

হাঁপাতে হাঁপাতে ব্রিষ্টো বললে—'দিন রাত চোখ রেখেছিলাম ইকথিয়ান-ডারের ওপরে। একবারও কাছ ছাড়া হইনি...' কিন্তু কথায় কান ছিল না স্যালভেটরের। সুইমিং পুলের পাড়ে দাঁড়িয়ে অধীর ভাবে পা ঠুকতে লাগলেন জল নেমে না যাওয়া পর্যন্ত। অচিরেই বেরিয়ে পড়ল ফোকরের হাঁ-মুখ।

'এস,' আবার হুকুম দেন স্যালভেটর। সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে যান পাতাল গহ্বরে। পিছু পিছু প্রায় দৌড়োতে থাকে ক্রিষ্টো আর নিগ্রো দুজন। এক এক লাফে দুটো তিনটে ধাপ টপকে অন্ধকারের মধ্যে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে যান স্যালভেটর, পাতাল পুরীর গোলক ধাঁধা যেন তাঁর নখদর্পণে।

শেষ ধাপ পেরিয়ে চাতালে নামেন স্যালভেটর। কিন্তু আগের মত আলো না জেলে অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে ডানদিকের একটা দরজা খোলেন। চৌকাঠের পর আর সিঁড়ি নেই বটে, কিন্তু অমাবস্যার মত নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। অবলীলা-ক্রমে আঁধারের মধ্যেই একটা সরু গলি পথে দ্রুত পদক্ষেপে প্রায় ছুটে চলেন স্যালভেটর।

রাস্তার ওপর ফাঁদ-টাদ পাতা নেই? মনে মনেই ভাবে ব্রিষ্টো। বেশ কিছুক্ষণ পর পায়ের তলার জমি আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে নেমে যেতে থাকে। ছলাৎ ছলাৎ শব্দও ভেসে আসে কানে। অনেকটা এগিয়ে ছিলেন স্যালভেটর। সুড়ঙ্গের শেষে পেঁছেই আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

ঝলমলে আলোয় দেখা গেল সুপরিসর একটা গুহা। পায়ের তলায় একখানি মাত্র বিশাল চ্যাটালো পাথর। ঢালু হয়ে তা মিশেছে জলের কিনারায়। গুহার ছাদ বেশ খানিকটা দূরে নেমে এসেছে জলের ওপর। অর্থাৎ চ্যাটালো পাথর আর গুহার দেওয়ালের মাঝে যেন একটা ছোট্ট বদ্ধ জলাশয়। জলা-শয়ের ওপর ঢালু পাথরের কিনারায় ভাসছে একটা ক্ষুদে সাবমেরিন।

দলবল নিয়ে সাবমেরিনে প্রবেশ করলেন স্যালভেটর। কেবিনের আলো জেলে দিলেন। একজন নিগ্রো ওপরের হ্যাচ বন্ধ করে দিলে, আর একজন ইঞ্জিন চালিয়ে দিলে। থরথর করে কেঁপে উঠেই অর্ধচন্দ্রাকারে ঘুরে এসে ডুব দিল

ডুবোজাহাজ। মিনিট দুয়েক পরেই ভেসে উঠল উন্মুক্ত সাগরে। ডেকের ওপর এসে দাঁড়ালেন স্যালভেটর আর ক্রিস্টো।

'ইক্‌থিয়ানডার কোন্ স্কুনারে আছে ?' জিজ্ঞেস করলেন স্যালভেটর।

'উপকূল বরাবর উত্তর দিকে গেছে স্কুনারটা। যাওয়ার সময়ে আমার ভাইকে তুলে নিলে ভাল হয়। তীরে দাঁড়িয়ে আছে ও।'

'কেন ?'

'ইক্‌থিয়ানডারকে জাহাজে তুলছে জুরিটা...মুক্তোর কারবারী জুরিটা...'

'এত কথা তুমি কোথেকে জানলে ?'

'ভাইয়ের কাছে স্কুনারের বর্ণনা দিতেই ও চিনতে পারে। ওর মুখেই শুনলাম পেড্রো জুরিটা 'জেলীফিশে' তুলে নিয়ে গেছে ইক্‌থিয়ানডারকে মুক্তো তোলানোর জন্য। এ তল্লাটের সমস্ত মুক্তোক্ষেতের সন্ধান রাখে আমার ভাই বালতাসার। তাই বলছিলাম ওকে তুলে নিলে সুবিধে হত।'

ক্ষণেক ভাবলেন স্যালভেটর।

'ঠিক আছে। কোথায় সে ?'

তীরের দিকে এগিয়ে যায় সাবমেরিন। বালতাসার অসহিষ্ণুভাবে পায়চারী করছিল সেখানে। কটমট করে চেয়ে রইল সন্তান-অপহারক স্যালভেটরের দিকে। কিন্তু ডেকে উঠেই চোখ মুখের ভাব একদম পালটে ফেলে বিনয়ে গলে গিয়ে অভিবাদন জানালে স্যালভেটরকে।

'পুরোদমে চালাও !' হুকুম দিয়ে পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল দেহে ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে রইলেন ডক্টর স্যালভেটর।

## মুক্তোর খোঁজে ইক্‌থিয়ানডার

জুরিটা তার প্রতিশ্রুতি রেখেছিল। উকো ঘষে ইক্‌থিয়ানডারের হাতকড়া খসিয়েছে। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে নদীর ধার থেকে গগল্‌স্ আর দস্তানাও এনে দিয়েছে।

কিন্তু জেলীফিশে চড়তে না চড়তেই নিজ মূর্তি ধারণ করেছে জুরিটা। জাহাজের খোলে বন্দী হয়েছে ইক্‌থিয়ানডার।

বিউনোআয়ার্সে এসে কিছু কেনাকাটা করে বালতাসারকে শাসিয়ে এল জুরিটা। অতঃপর নোঙর তুলে রওনা হল রায়ো ডি জ্যানেরিওর দিকে। গন্তব্যস্থান, ক্যারিবিয়ান সাগর। উদ্দেশ্য, মুক্তো তোলা।

গুটিয়েরেও জাহাজে এসেছে। গুটিয়েরেকে জুরিটা বুঝিয়েছিল রায়ো ডি প্লাটাতে নামিয়ে দেওয়া হবে ইক্‌থিয়ানডারকে। কিন্তু জুরিটা যে কতবড় মিথ্যাবাদী তা ফাঁস হতে বেশী সময় গেল না। নিজের কেবিন বসেই ইক্‌থিয়ানডারের অস্পষ্ট চীৎকার শুনতে পেয়েছে গুটিয়েরে। কেবিন থেকে বেরোতে গিয়ে দেখেছে দরজা

বন্ধ। দরজা ঠেঙিয়ে গলা ফাটিয়েও কারো সাড়া পায়নি।

ইক্‌থিয়ানডারের চীৎকার জুরিটাও শুনেছিল। একজন রেড-ইণ্ডিয়ানকে নিয়ে গিল সে নিচের ভ্যাপসা অন্ধকার ভরা খোলে।

'এত চেঁচামেচি কিসের?'

'আমার যে দম আটকে আসছে। জল ছাড়া আমি থাকতে পারি না। এখানে কি বিচ্ছিরি গরম। আমাকে জলে নামিয়ে দাও। তা নাহলে কাল সকাল পর্যন্ত বাঁচব না।'

হ্যাচটা যথাস্থানে নামিয়ে দিয়ে ডেকে উঠে এল জুরিটা। ভাবনার ব্যাপার বটে। সত্যিই যদি দম আটকে মারা যায় তাহলে তো ঘাটে এসে তরী ডুববে।

একটা পিপে খোলের মধ্যে নামিয়ে জল ভরে দেওয়ার হুকুম দেয় জুরিটা। ইক্‌থিয়ানডারকে বললে—'নাও, আপাতত এখানেই সাঁতার কাটো। কাল সমুদ্রে নামবে।'

তাড়াতাড়ি পিপের মধ্যে সেঁধোয় ইক্‌থিয়ানডার। হায় রে, সাঁতার তো দূরের কথা, মাথা পর্যন্ত ডুবে থাকার জন্যে হাঁটু ভেঙ্গে অতি কষ্টে বসতে হয়।

কাণ্ড দেখে গোল গোল চোখে মাল্লারা তাকিয়ে থাকে নিচে। সমুদ্র-শয়তান যে জাহাজে বন্দী, এ খবর তখনও তারা জানত না।

'হাঁ করে দেখছো কি? যাও, ভাগো এখান থেকে।' তাড়া করে জুরিটা। হ্যাচ বন্ধ করে আসে ডেকে।

সমস্ত রাত অতিকষ্টে কাটে ইক্‌থিয়ানডারের। নুন মাখানো শুওরের মাংস রাখা হত পিপেটায়। দুর্গন্ধে অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। নড়চড়াও করতে পারে না। জলের ওপরেও মাথা তুলতে পারে না। সেকী কষ্ট।

ভোরের আলো ফুটতে তখনও অনেক দেরী। গুটিয়েরের কেবিনে পা দেয় জুরিটা। ভেবেছিল, নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে গুটিয়েরে। কিন্তু এ অবস্থায় চোখে ঘুম আসে কি করে? টেবিলের ওপর মাথায় হাত রেখে চুপটি করে বসে ছিল গুটিয়েরে।

স্বামীর পায়ের শব্দে মুখ তুললে। তারপর স্থির দৃষ্টি মেলে কঠিন কণ্ঠে বললে—'তুমি মিথ্যাবাদী।'

থতমত খেয়ে যায় জুরিটা। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বলে—'কি করি বল? তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই ফিরে যেতে চাইল না ইক্‌থিয়ানডার।'

'মিথ্যে কথা! তোমার সমস্ত মিথ্যে! সমস্ত! সমস্ত!' বলতে বলতে দেওয়ালে ঝোলানো খাপ থেকে ফস করে ছোরাটা টেনে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গুটিয়েরে।

খপ করে ছোরাশুদ্ধ উদ্যত হাতটা ধরে ফেলে নির্মমভাবে মোচড় দিতেই ছোরা খসে পড়ল মেঝেতে, বুটের এক ঠোক্করে ছিটকে গেল কেবিনের বাইরে।

হাত ছেড়ে দিয়ে বললে জুরিটা—'বরফ জল খাও। মাথা ঠাণ্ডা হবে।' বলে বেরিয়ে এসে তালা দিয়ে দিলে দরজায়।

ভোরের আলো তখন সবে ফুটছে পূর্বদিগন্তে। ফুরফুরে হাওয়ায় ফুলে উঠেছে পাল। নোনা আর তাজা বাতাসে ভর দিয়ে মাছের সন্ধানে উড়ছে গাংচিল।

ধীরে ধীরে সূর্য উঠে আসে দিগ্‌রেখা ছাড়িয়ে। জুরিটার আদেশে নোঙর ফেলে জেলীফিশ।

'যাও, শেকল আনো। খোল থেকে কয়েদীকেও নিয়ে এস।' হুকুম দেয় জুরিটা। দীর্ঘ উৎকণ্ঠার অবসান ঘটবে আজ। কতদিন কতরাত স্বপ্ন দেখেছে সে আজকের দিনটির। ইক্‌থিয়ানডারের বাহাদুরি চোখের সামনেই দেখা যাবে। মুক্তোও তোলা হবে। ইক্‌থিয়ানডারকেও জলের মধ্যে খানিকক্ষণ রাখা যাবে।

দুজন রেড-ইণ্ডিয়ানের মাঝে টলতে টলতে উঠে আসে ইক্‌থিয়ানডার। ডেকের ওপর এসেই থমকে দাঁড়ায়। চারদিকে দেখে নিয়েই আচমকা তীরবেগে দৌড়ে যায় রেলিংয়ের কাছে এবং পরের মুহূর্তেই গিয়ে পড়ত জলে।

কিন্তু তার আগেই জুরিটার বজ্রমুষ্টি লোহার মুদগরের মত এসে পড়ে রগের ওপর। একবার মাত্র গুঙিয়ে উঠেই ধড়াস্ করে আছড়ে পড়ে জ্ঞান হারাল ইক্‌থিয়ানডার।

ঝনঝন শব্দে একরাশ শেকল নিয়ে এল একজন অনুচর। শেকলের এক প্রান্তে লোহার চ্যাপ্টা কোমর-বন্ধনী। হতচেতন ইক্‌থিয়ানডারের কোমরে বেল্ট লাগিয়ে তালা দিয়ে দিল জুরিটা।

বললে—'এক বালতি জল এনে ঢালো মাথায়।'

জলের ঝাপটায় জ্ঞান ফিরে এল ইক্‌থিয়ানডারের। হতভম্ব হয়ে গেল লোহার বেল্ট আর লোহার শেকল দেখে।

জুরিটা বললে—'আবার যাতে পালাবার চেষ্টা না করো, তাই এই ব্যবস্থা। জলে তোমায় নামিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আমাকে মুক্তো খুঁজে এনে দিতে হবে। যত মুক্তো আনবে, তত জলে থাকবে। চালাকি করলেই পিপেয় থাকতে হবে। রাজী?'

সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেল ইক্‌থিয়ানডার। নির্মল জলে ফিরে যাওয়ার জন্য যে কোন সর্তে সে রাজী।

ইক্‌থিয়ানডারকে নিয়ে রেলিংয়ের ধারে এসে দাঁড়ায় জুরিটা আর একজন রেড-ইণ্ডিয়ান। গুটিয়েরের কেবিন জাহাজের অপর দিকে। কজেই আর চোখে পড়ার কোন ভয় নেই। ইক্‌থিয়ানডারকে শেকল বাঁধা দেখলেই তো কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাঁধিয়ে ছাড়বে মেয়েটা।

ধরাধরি করে ইক্‌থিয়ানডারকে নামিয়ে দেওয়া হলো জলে। এক ডুবে নিচে পেঁৗছে গেল ইক্‌থিয়ানডার। সারা রাত ঐ বোঁটকা গন্ধওলা নোংরা জলে আটক থাকার পর এতো জল নয়, এ যে অমৃত! কি আরাম! কি আনন্দ। আহা রে, এখন যদি লোহার বাঁধনটা খসিয়ে ফেলা যেত! কিন্তু এ শেকল কাটবার ক্ষমতা তার নেই।

মুক্তো খোঁজা শুরু করে ইক্‌থিয়ানডার। বেছে বেছে ভাল মুক্তো তুলে সংগ্রহ করে কোমরে বাঁধা থলির মধ্যে। মিনিটের পর মিনিট কেটে যেতে থাকে। ওঠার নামও করে না। ডেকের ওপর মাল্লাদের চোখ কপালে ওঠার উপক্রম হয়। একী কাণ্ড! প্রথম-প্রথম দুচারটে বুদবুদ উঠেছিল। এখন তো তাও উঠছে না।

একজন তো বলেই ফ্যালে—'একি মানুষ, না, মাছ? জলের মধ্যে এমন বেড়াচ্ছে যেন মাঠে হাওয়া খাচ্ছে।' সত্যিই তাই, পরিষ্কার টলটলে জলের মধ্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে হামাগুড়ি দিয়ে মুক্তো বাছাই করছে ইক্‌থিয়ানডার।

'ছোকরা সমুদ্র-শয়তান নয় তো?' বলে একজন।

'শয়তান হোক, দেবতা হোক, মালিক চালাক লোক বটে। এমন ডুবুরী জোগাড় করেছে, একাই একশ জনের কাজ করবে।'

সূর্য যখন মাথার ওপরে, তখন ওপরে উঠে এলে ইক্‌থিয়ানডার। থলি ভর্তি হয়ে গেছে, মুক্তো রাখার আর জায়গা নেই। নতুন থলি চাই।

আশ্চর্য ডুবুরীকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরল রেড-ইণ্ডিয়ানরা। কি রকম মুক্তো উঠল দেখবার জন্য সবাই উদগ্রীব।

সাধারণত দিন কয়েক রোদে শুকোনোর পর মুক্তো বার করা হয়। কিন্তু প্রত্যেকের আগ্রহ তখন এমনি চরমে উঠেছে যে, আর সবুর সইছে না। কাজেই তৎক্ষণাৎ ছুরী বের করে শুক্তি কাটতে বসে যায় মাল্লারা।

সব কটা মুক্তো জড়ো করার পর চক্ষুস্থির হয়ে যায়। এত মুক্তো একবার ডুব দিবে আনা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়। মুক্তোর স্তূপের মধ্যে গোটা কুড়ি মুক্তো এত বড় এবং এমন রকমারি রঙের যে, তার একটা বিক্রি করেই নতুন স্কুনার কেনা যায়। কুবের হতে আর বেশী দেরী নেই পেড্রো জুরিটার। স্বপ্ন সফল হতে চলেছে তার।

অভিভূত ভাবটা কেটে গেল মাল্লাদের মুখ দেখে। লোভে চকচক করছে প্রত্যেকের চোখ। চাউনিটা ভাল লাগেনি জুরিটার। মুক্তোগুলো টুপীর মধ্যে তুলতে তুলতে হাঁকিয়ে দেয় সবাইকে—'যাও, যাও, ব্রেকফাস্ট খেয়ে এস।'

ইক্‌থিয়ানডারকে বলে—'ডুবুরী হিসেবে মন্দ নও তুমি। একটা বাড়তি কেবিন আছে। আজ থেকে সেখানেই তোমার তোমার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। পিপের বদলে দস্তার ট্যাঙ্কের বন্দোবস্তও করে দেবো। জলে রোজই নামবে, কিন্তু শেকল খুলতে পারব না। খুললেই তুমি কলা দেখাবে। কাজেই আমি নাচার।'

ইক্‌থিয়ানডার বললে—'পিপের চাইতে ট্যাঙ্ক ভাল। কিন্তু জল পাল-টানোর ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে নিঃশ্বেস নিতে কষ্ট হবে।'

'কতক্ষণ অন্তর পালটাতে হবে?'

'আধঘণ্টা অন্তর।'

'বটে। একটু তারিফ করতেই মাথা ঘুরে গেছে দেখছি। আধঘণ্টা অন্তর পাম্প করে জল পালটাতে কত খরচ হয় খেয়াল আছে? ফতুর করবার মতলব।

যা মুক্তো তুলবে, তার বেশী খরচ করিয়ে দেওয়ার ফন্দী ?'

'আমার কোনো ফন্দী নেই।' আহত কণ্ঠে বলে ইক্‌থিয়ানডার। 'দেখনি গামলার জলে বড় মাছ রাখলে ঘুমিয়ে পড়ে। জল থেকেই নিঃশ্বেসের অক্সিজেন সংগ্রহ করে মাছ। আমি···আমিও তো একটা বড় মাছ···আমারও অক্সিজেন দরকার।' ম্লান হেসে বলে ইক্‌থিয়ানডার।

'অক্সিজেন-ফক্সিজেন বুঝি না। জল না পালটালে যে মাছ টেঁসে যায়, তা আমার জানা আছে। কিন্তু ঐ যে বললাম দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার জল পালটানোর খরচ আমার পোষাবে না।'

'খরচ' শব্দটা ইক্‌থিয়ানডারের কাছে একেবারেই নতুন। তাই কিছু না বুঝেই বলে—'না পোষায় আমাকে নামিয়ে দাও, সাঁতার কাটি।'

'বটে, বড় ধড়িবাজ দেখছি! সটকান দেওয়ার খাসা মতলব।'

'সত্যি বলছি আমি পালাব না। আমি মরে যাচ্ছি, আমাকে বাঁচতে দাও। তার বদলে তুমি যা চাও এনে দেব। মুক্তো ভালবাস? কত মুক্তো চাই তোমার? জলের মধ্যে একটা গুহায় আমি এই এত মুক্তো জমিয়ে রেখেছি,' হাঁটু পর্যন্ত উঁচু করে দেখায় ইক্‌থিয়ানডার। 'প্রত্যেকটা এই অ্যাত্তো বড়। সব এনে দেব তোমাকে, কিন্তু আমাকে জলে থাকতে দাও।'

শুনে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায় জুরিটার। বলে কি ছোকরা? মুখে নির্বিকার থাকার চেষ্টা করে—'ধাপ্পা, স্রেফ ধাপ্পা।'

'জীবনে কাউকে ধাপ্পা মারিনি আমি,' গরম হয়ে বলে ইক্‌থিয়ানডার।

'অত মুক্তো আছে কোথায়?' আর উত্তেজনা দাবিয়ে রাখতে পারে না জুরিটা।

'বললাম তো জলের নিচের একটা গুহার মধ্যে। আমি আর লীডিং ছাড়া আর কেউ ঠিকানা জানে না।'

'লীডিং কে?'

'আমার ডলফিন বন্ধু।'

'তাই নাকি?'

সব গুলিয়ে যায় জুরিটার। ইক্‌থিয়ানডার যা বলছে, তা অবিশ্বাস্য। কিন্তু যদি সত্যি হয়, তাহলে পৃথিবীর সেরা ধনীরাও লুটিয়ে পড়বে জুরিটার পায়ের তলায়। রথ্‌স্‌চাইল্ড আর রকফেলারের মিলিত ধনবৈভবও কানাকড়ি হয়ে দাঁড়াবে জুরিটার কুবের সম্পদের সামনে। চিরকাল টাকার স্বপ্ন দেখেছে পেড্রো জুরিটা। কিন্তু এযে স্বপ্নেরও অতীত। মাথা ঘুরতে থাকে জুরিটার।

ইক্‌থিয়ানডারের সরল নিষ্পাপ মুখে কপটতার ছায়া মাত্র নেই। বিশ্বাস করা চলে তাকে। কিন্তু সন্দেহপ্রবণ জুরিটা অন্য ধাতের মানুষ। মুখের কথাই তার কাছে বড় জামীন নয়। তাই তক্ষুনি নয়া ফন্দী আঁটে। গুটিয়েরে যদি ইক্‌থিয়ানডারকে বলে সমুদ্রের এই অতুলনীয় সম্পদ তুলে আনতে, ইক্-

থিয়ানডার কথা রাখবেই।

মুখে বলে জুরিটা—'ঠিক আছে। তোমার প্রস্তাব পরে ভাবা যাবে'খন। আপাতত তুমি আমার অতিথি। কাজেই তোমার ভালমন্দ আমাকে দেখতে হবে বইকি। তোমাকে বরং লোহার খাঁচায় পুরে জলে নামিয়ে দেবো। তাতে আরো একটা সুবিধে থাকবে। হাঙর কাছে আসতে পারবে না। দস্তার ট্যাঙ্কের চাইতে এ ব্যবস্থা অনেক ভাল।'

'মাঝে মাঝে খোলা হাওয়া দরকার আমার।'

'সেজন্যে খাঁচাশুদ্ধ টেনে তুললেই হল। তাতে আর খরচ কি?' আনন্দে আটখানা হয়ে তক্ষুনি মাল্লাদের এক টন 'র‍্যাম' পরিবেশন করার হুকুম দিলে জুরিটা। জীবনে এরকম উদারতা সে কখনো দেখায়নি।

ইক্‌থিয়ানডারকে জাহাজের খোলে পাঠিয়ে গুটিয়েরের কেবিনের সামনে এসে দাড়াঁয় জুরিটা। দরজা খুলে চৌকাঠ না পেরিয়েই টুপীভর্তি মুক্তো এগিয়ে ধরে গুটিয়েরের দিকে।

'কথা রাখতে এলাম। আমি জানি আমার বউ মুক্তো ভালবাসে। কিন্তু ভাল মুক্তো জোগাড় করতে হলে ভাল ডুবুরী চাই। ইক্‌থিয়ানডারকে আটকেছি সেই জন্যেই। হাঁ করে দেখছ কি? সকাল বেলা একটু ডুবেই এত মুক্তো এনেছে ইক্‌থিয়ানডার।'

চোখ মুখ যথাসাধ্য ভাবলেশহীন রাখার চেষ্টা করে গুটিয়েরে। অন্য সময় হলে বিপুল বিস্ময়ে হই হই করে উঠত। জুরিটা তা উপলব্ধি করে।

কান এঁটো করা হাসি হেসে বলে—'আর্জেন্টাইনের সেরা বড়লোকও তোমাকে হিংসে করবে আজ থেকে। তাক লেগে যাবে আমেরিকার বড়লোকেদের। যা মন চায় তাই কিনতে পারবে, দুহাতে টাকা ওড়াতে পারবে। শুধু তোমার জন্যে এমন একটা প্রাসাদ বানিয়ে দেব যা দেখলে রাজা রাজরাদেরও মুণ্ডু ঘুরে যাবে। কথা দিয়েছিলাম, তাই এলাম। নাও, আধাআধি বখরা—আদ্ধেক মুক্তো তোমার।'

'একটাও চাই না। একলা থাকতে দাও আমাকে। ও পাপের মুক্তো যেন আমাকে ছুঁতে না হয়।'

এরকম জবাব আশা করেনি জুরিটা। নৈরাশ্যের সঙ্গে সঙ্গে মেজাজটা খিঁচড়ে যায়। বলে—'তোমাকে আর একটা কথা বলতে এসেছি। তুমি কি চাও ইক্‌থিয়ানডারকে আমি ছেড়ে দিই?' দুই চোখে ঘৃণা আর অবিশ্বাস ছড়িয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে গুটিয়েরে শুধু বললে—'এবার কি মতলব?'

'ইক্‌থিয়ানডারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তোমার ওপর। সাগরের কোন একটা গুহায় নাকি বিস্তর মুক্তো জমিয়ে রেখেছে ও। তুমি বললেই সমস্ত এনে দেবে তোমাকে। তাহলেই মুক্তি পাবে ইক্‌থিয়ানডার।'

'জুরিটা, তোমার মত মিথ্যাবাদী ভণ্ড আমি আর দেখিনি। ইক্‌থিয়ানডার

আর তার মুক্তো, সবই এখন তোমার চাই। তোমার মত খল, তোমার মত জোচ্চোরের স্ত্রী হয়ে গত জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি। আর না। তোমার শয়তানিতে আর আমি ভুলছি না। বেরোও আমার সামনে থেকে, বেরোও। একলা থাকতে দাও আমাকে।'

এরপর আর আর কিছু বলার থাকতে পারে না। কাজেই নিজের কেবিনে ফিরে এল জুরিটা। মুক্তোগুলো একটা থলিতে ঢেলে সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করে রাখল। তারপর দিব্যি হাল্কা মনে উঠে এলো ডেকে। স্ত্রীর কথায় মোটেই বিচলিত হয়নি জুরিটা, মুক্তোই তার স্বপ্ন, মুক্তোই তার সাধনা। মানসচক্ষে পেড্রো জুরিটা দেখতে পেল, বিশ্বের ধনীরা তাকে ঘিরে ধরেছে তার ছিটেফোঁটা কৃপালাভের আশায়।

ব্রীজে উঠে চুরুট ধরায় জুরিটা। বিপুল বৈভবের সুখস্বপ্নে আছন্ন হয়ে পড়ে ধীরে ধীরে। তাই সদা সতর্কতা সত্ত্বেও দেখতে পায় না, মাল্লারা ইতিউতি জড়ো হয়ে জটলা করছে নিজেদের মধ্যে।

## পরিত্যক্ত 'জেলীফিশ'

সামনের মাস্তুলের ঠিক বিপরীত দিকের রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে ছিল জুরিটা। হঠাৎ হাতের ইসারা করল ফার্স্টমেট, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন মাল্লা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল জুরিটার ওপর।

অতর্কিত আক্রমণে হকচকিয়ে যায় পেড্রো জুরিটা। মাল্লারা প্রত্যেকেই নিরস্ত্র। কিন্তু সংখ্যায় অনেক। তা সত্ত্বেও বাগমানানো কঠিন হয় জুরিটাকে। পেছন থেকে জাপটে ধরেছিল দুজন মাল্লা। কিলচড় লাথি ঘুসি মেরে অন্যান্য মাল্লাদের কাছে ঘেঁসতে না দিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে আসে জুরিটা। পরক্ষণেই ভীমবেগে মাল্লা দুজন সমেত আছড়ে পড়ে রেলিংয়ের ওপর। প্রচণ্ড সংঘর্ষে কোঁক করে ওঠে দুজনে এবং জ্ঞান হারিয়ে পড়ে ডেকের ওপর।

সিধে হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে আরো কয়েকজন। সমানে ডাইনে বাঁয়ে ঘুসি চালিয়ে আত্মরক্ষা করতে থাকে জুরিটা। চব্বিশ ঘণ্টা কোমরে রিভলবার ঝুললে কি হবে, হোলস্টার থেকে রিভলবারটা বার করতে অবসর পায় না। প্রাণপণে যুঝতে যুঝতে সামনের মাস্তুলের গোড়ায় পেঁছে যায় জুরিটা এবং পরমুহূর্তেই অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় সর সর করে অবিকল বানরের মতই মাস্তুল বেয়ে উঠতে থাকে ওপরে।

একজন মাল্লা খপাৎ করে এক পায়ের বুট চেপে ধরেছিল। তৎক্ষণাৎ অপর পায়ের গোড়ালী দিয়ে ব্রহ্মতালুর ওপর প্রচণ্ড লাথি মারতেই সর্ষেফুল দেখতে দেখতে অজ্ঞান হয়ে যায় সে। একদম ডগায় উঠে গিয়ে রিভলবারটা বার করে জুরিটা।

'মাস্তুলে যে আগে উঠবে তাকেই যমের বাড়ী যেতে হবে,' তাগ করতে করতে হেঁকে উঠে জুরিটা।

সোরগোল পড়ে যায় মাল্লাদের মধ্যে।

একজন বললে—'অত ভাবনা কিসের ? ক্যাপ্টেনের কেবিনে বন্দুক আছে। চলো, দরজা ভেঙ্গে নিয়ে আসি।'

হ্যাচের দিকে ছুটল কয়েকজন।

জুরিটা দেখলে মহা বেগতিক। মাস্তুলের ডগায় সঙের মত বসে বেঘোরে গুলী খেয়ে মরা ছাড়া উপায় নেই।

মানুষ যখন মরতে বসে, তখন খড় কুটোকেও আঁকড়ে ধরে প্রাণের মায়ায়। এই বিশাল সমুদ্রে কোন সাহায্যই পাওয়া যাবে না জেনেও ব্যাকুল ভাবে খোলা সাগরের ওপর চোখ বোলায় জুরিটা।

এবং পরক্ষণেই দারুণ চমকে ওঠে। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারে না।

ভয়ংকর বেগে একটা সাবমেরিন ধেয়ে আসছে জেলীফিশ লক্ষ্য করে। ঢেউয়ের তালে তালে উঠছে নামছে। কিন্তু তীক্ষ্ম নাসার সামনে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে জলরাশি।

রীতিমত ভড়কে যায় জুরিটা। ব্যাপার কি ? 'জেলীফিশ'-কে ডুবিয়ে দেওয়ার মতলব নেই তো ? এরই মধ্যে অনেকটা কাছে এগিয়ে এসেছিল সাবমেরিনটা। টাওয়ারে কয়েকজন পুরুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

'বাঁচাও ! বাঁচাও ! খুন ! খুন ! বাঁচাও !' চিলের মত আকাশফাটা স্বরে চেঁচাতে থাকে পেড্রো জুরিটা।

সাবমেরিনের স্পীড কিন্তু একটুও কমে না। সমান গতিতে জল তোলপাড় করে ছুটে আসতে থাকে স্কুনারের দিকে।

অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ডেকে এসে দাঁড়িয়েছিল মাল্লারা। ব্যাপার দেখে তারাও ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। নৌবহরের ডুবোজাহাজের সামনে খুন জখম করে হাতকড়া পরার সাধ নেই কারোরই।

ভাগ্যবান জুরিটা ! তাই দূর থেকে ডুবোজাহাজটাকে মাল্লারা নেভীর সাবমিরন মনে করায় প্রাণে বেঁচে গেল সে।

জুরিটার উল্লাস কিন্তু বেশীক্ষণ রইল না। কনিং টাওয়ারের লোকগুলোকে এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বালতাসার আর ক্রিস্টোকে চিনতে ভুল হল না জুরিটার। পাশেই দাঁড়িয়ে একজন ঢ্যাঙা পুরুষ। খাঁড়ার মত উদ্ধত ধারালো নাক। ঈগল পাখীর মত তীক্ষ্ম চোখ।

তেজদীপ্ত এই মানুষটিই চীৎকার করে বললেন—'পেড্রো জুরিটা। ইক্‌থিয়ানডারকে এক্ষুনি ফিরিয়ে দাও। তাকে জাহাজে আটকে রাখার অধিকার তোমার নেই। পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি, তার পরেই এ স্কুনার আমি ডুবিয়ে দেব।'

বিশ্বাসঘাতক। রাগে ফুঁসতে থাকে জুরিটা। দুটো ভাই-ই সমান বজ্জাত। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। ইক্‌থিয়ানডার গোল্লায় যাক। আগে নিজের মাথা বাঁচানো যাক তো।

চীৎকার করে বলে জুরিটা—'আনছি। নিচে গিয়ে নিয়ে আসছি ইক্‌থিয়ানডারকে।' বলেই সর সর করে নামল নিচে।

অবস্থা সঙীন দেখে চাচা-আপন-প্রাণ-বাঁচা নীতি অনুসরণ করল মাল্লারা। কেউ কেউ নৌকো নামিয়ে সটকান দেওয়ার আয়োজন করতে লাগল। বাকী সকলে ঝপাঝপ জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে পালাতে লাগল তীরের দিকে।

দৌড়ে কেবিনে ঢুকে সিন্দুক খুলল জুরিটা। মুক্তোভর্তি থলিটা সার্টের ভেতর পকেট রেখে একটা বেল্ট আর বড় রুমাল নিয়ে ছুটে গেল গুটিয়েরের কেবিনে। তালা খুলেই গুটিয়েরেকে পাঁজা কোলা করে তুলে নিয়ে উঠে এল ডেকে।

'ইক্‌থিয়ানডার অসুস্থ। নৌকায় শুয়ে রয়েছে।' বলে নৌকার মধ্যে গুটিয়েরেকে নামিয়ে দেয় জুরিটা। দ্রুত হাতে নৌকো জলে নামিয়ে নিজে লাফিয়ে পড়ে পাটাতনের ওপর।

অগভীর জলে নৌকার পিছু নিতে পারে না সাবমেরিন। গুটিয়েরে কিন্তু বালতাসারকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে ওঠে—'বাবা, ইক্‌থিয়ানডারকে বাঁচাও। সে—'

কথা শেষ হয় না। চকিতে বড় রুমালটা মুখে গুঁজে চটপট বেল্ট দিয়ে গুটিয়েরের দুহাত বেঁধে ফেলে জুরিটা।

হুংকার দিয়ে ওঠেন স্যালভেটর—'হাত সরাও বীরপুরুষ!'

'আমার বউয়ের গায়ে আমি হাত দিচ্ছি তো তোমার কি হে?' পালটা হুংকার ছাড়ে জুরিটা। ঝপাঝপ দাঁড় টেনে এগিয়ে চলে তীরের দিকে।

'বউ হোক আর যাই হোক। স্ত্রীলোকের ওপর অত্যাচার আমি সহ্য করব না। দাঁড় তোলো, নইলে গুলি করব।'

জুরিটা কিন্তু সর্বশক্তি দিয়ে দাঁড় টানতে থাকে। লক্ষ্যস্থির করে ঘোড়া টেপেন স্যালভেটর। জলরেখার ঠিক ওপরেই নৌকার গায়ে বুলেট বেঁধে।

শয়তান জুরিটা এবার গুটিয়েরেকে ঢালের মত সামনে তুলে ধরে বলে—'চালাও গুলী। যতো পারো চালাও।'

দুহাতের মধ্যে ছটফট করতে থাকে গুটিয়েরে।

রিভলবার নামিয়ে দাঁতে দাঁতে পিষে স্যালভেটর বলেন—'হাড় বদমাস কোথাকার!'

কনিং টাওয়ার থেকে সুদীর্ঘ এক লাফে জলে গিয়ে পড়ে বালতাসার এবং মাছের মতই মসৃণ ভঙ্গিমায় সাঁতরে যায় নৌকোর দিকে।

কিন্তু জুরিটা ততক্ষণে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। একটা বড় ঢেউয়ের মাথায় নৌকো গিয়ে পড়ে তীরের ওপর। গুটিয়েরেকে তুলে নিয়ে পাথরের আড়ালে

অদৃশ্য হয়ে যায় জুরিটা।

নৌকোর নাগাল যখন পাওয়া গেল না, তখন আর খামোকা সাঁতার না কেটে স্কুনারের নোঙরের শেকল ধরে ডেকে উঠে যায় বালতাসার। পর মুহূর্তেই ইকথিয়ানডারের খোঁজে অদৃশ্য হয় নিচের খোলে। একটু পরেই আবার ডেকে ফিরে আসে বালতাসার। চীৎকার করে বলে ঃ

'ইক্থিয়ানডার জাহাজে নেই।'

ক্রিষ্টো বললে—'নেই তো যাবে কোথায়? মুখ বন্ধ হওয়ার আগে সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছিল গুটিয়েরে। না থাকে তো আমি বলছি সে কোথায়।'

সাগরের ওপর উদ্বিগ্ন চোখ বুলোয় ক্রিস্টো। দৃষ্টি আটকে যায় কিছু দূরে। জলের ওপর ঠেলে উঠেছে একটা জাহাজের মাস্তুলের ডগা। জলের ডোবা জাহাজ। নিশ্চয় সোনাদানা লুঠ করার জন্য পাঠানো হয়েছে ইক্থিয়ানডারকে।

চেঁচিয়ে বলে—'আমার মনে হয় জুরিটা ওকে পাঠিয়েছে ঐখানে—ডুব দিয়ে ডুবোজাহাজের সোনাদানা তুলে আনতে।'

ডেকের ওপর থেকে একটা শেকল তুলে ধরে বালতাসার। শেকলের এক প্রান্তে বেল্টের আকারে চ্যাটালো লোহার পাত।

'শেকলে বেঁধেই জলে নামানো হত ইক্থিয়ানডারকে যাতে না পালাতে পারে। কিন্তু শেকল যখন এখানে পড়ে, তখন ইক্থিয়ানডার ডোবা জাহাজে যায় নি।'

পাথরের মত কঠিন মুখে স্যালভেটর বললেন—'জুরিটাকে উচিত শিক্ষা দিয়েও হেরে গেলাম। এ জেতাকে জেতা বলে না।'

## ডোবা জাহাজ

সেইদিনই সকালে জেলীফিশে যা ঘটেছে, তা কারুর পক্ষেই জানা সম্ভব ছিল না।

সারারাত ধরে ষড়যন্ত্র করেছে মাল্লারা। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে, সকাল হলেই খুন করা হবে জুরিটাকে। তারপর দখল করা হবে জাহাজ আর আশ্চর্য ডুবুরীকে।

ভোরের আলো ফুটতেই ব্রীজে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল জুরিটা। ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে জেলীফিশ।

ঠিক এই সময়ে জেলের ওপর কি যেন একটা চোখে পড়ল। বাইনোকুলার দিয়ে জুরিটা যা দেখল তা একটা ডোবা জাহাজের রেডিও মাস্তুল। একটু পরে একটা লাইফ বয়াও চোখে পড়ল। মাস্তুলের কাছেই ভাসছে বয়াটা। নৌকো নামিয়ে বয়াটা তুলে আনল জুরিটা। আর তখনি জানা গেল জাহাজের নাম। 'মাফালদা' —বয়ার উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা 'মাফালদা'। অবাক হয়ে যায় পেড্রো জুরিটা।

আমেরিকান এক্সপ্রেস লাইনার 'মাফালদা'র নাম কে না জানে? বিখ্যাত

সেই জাহাজই কিনা তলিয়ে গেছে জলের তলায় ! সাজানো কত ধনরত্নই ডুবেছে সেই সঙ্গে। ইক্থিয়ানডারকে পাঠালে কেমন হয় ? কিন্তু অত লম্বা শেকল তো নেই। অথচ শেকল না বাঁধলে ইক্থিয়ানডার কি আর ফিরে আসবে ? উহুঁ, অত বোকা নয় পেড্রো জুরিটা।

ধীরে ধীরে ডোবা মাস্তুলের খুব কাছেই এসে পড়ে স্কুনার। রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে মাল্লারা। হাওয়া বন্ধ হয়ে যেতেই নিথর নিশ্চল হয়ে ভাসতে থাকে জেলীফিশ।

একজন বললে—'আমার জন্ম 'মাফালদা'তে। জাহাজ তো নয়, ছোটখাট একটা শহর। বড়লোক আমেরিকানরা এ জাহাজে জায়গা পেলে অন্য জাহাজে উঠবেই না।'

নিশ্চয় রেডিওতে খবর পাঠানোর আগেই ডুবে গেছে মাফালদা। তা না হলে এতক্ষণে আশেপাশের পোর্ট থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসত লঞ্চ, স্পীড বোট আর পালতোলা নৌকো। অফিসার, ক্যামেরাম্যান, রিপোর্টারের দল পিঁপড়ের মত ছেঁকে ধরত।

কেউ এসে পড়ার আগেই একবার ঘুরে এলে হয়। ইক্থিয়ানডার। ইক্থিয়ানডারই তুলে আনতে পারে ডোবা ধনরত্ন। কিন্তু শেকলে না বেঁধে ওকে ছাড়াও বিপদ।

অনেক ভেবে নতুন ফন্দী বার করে পেড্রো জুরিটা। নোঙর ফেলতে হুকুম দিয়ে নিজের কেবিনে যায়। খসখস করে একটা চিঠি লিখে নিয়ে ইক্থিয়ানডারের সামনে এসে দাঁড়ায়।

বলে—'ইক্থিয়ানডার পড়তে পার ? গুটিয়েরে তোমাকে চিঠি দিয়েছে।'

সাগ্রহে কাগজটা ছিনিয়ে নেয় ইক্থিয়ানডার। এর আগে কোনদিন গুটিয়েরের চিঠি পাওয়ার সৌভাগ্য তার হয়নি। তাই হস্তাক্ষরের সঙ্গেও তার পরিচয় নেই।

ছোট্ট চিঠি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়ে ফ্যালে ইক্থিয়ানডার।

'প্রিয় ইক্থিয়ানডার, আমার অনুরোধ তোমাকে রাখতেই হবে। কাছেই একটা জাহাজডুবি হয়েছে, এক্ষুনি গিয়ে ডোবা জাহাজের কেবিনে কেবিনে ঘুরে যেখানে যত দামী জিনিস পাবে সব এনে দাও আমাকে। জুরিটা তোমাকে শেকলে বাঁধবে না, কিন্তু তুমি ফিরে আসবে জেলীফিশে। আমার জন্যে এটুকু তোমাকে করতেই হবে ইক্থিয়ানডার। তোমার মুক্তি আসন্ন, তাও বলে রাখি সবশেষে। গুটিয়েরে।'

গুটিয়েরের হাতের লেখা চেনে না ইক্থিয়ানডার। তাই কিছুক্ষণ বিভোর হয়ে থাকে চিঠি পাওয়ার আনন্দে।

খটকা লাগে তারপরেই, জুরিটার নতুন চাল নয় তো ?

জিজ্ঞেস করে—'গুটিয়েরে নিজে এসে বলল না কেন ?'

'শরীর ভাল নেই ওর। তবে তুমি ফিরে এলেই দেখা করবে বলেছে।'

'এত দামী জিনিস নিয়ে ও করবে কি?'

'মাছ না হয়ে যদি মানুষ হতে তাহলে বুঝতে, মেয়েরা কি চায়? চায় দামী দামী জামা-কাপড়, সুন্দর সুন্দর গয়না। কিন্তু সেসব কিনতে টাকা লাগে। ডোবা জাহাজে ওরকম কত টাকা গড়াগড়ি যাচ্ছে। তোমার প্রথম কাজই হবে সোনা খোঁজা। চামড়ার মেল ব্যাগ পেলেও নেবে। তাছাড়া যাত্রীদের আঙুলে আংটি, গলায় নেকলেস থাকলেও—'

'অর্থাৎ মরা মানুষগুলোর দেহ তল্লাশ করব সোনার খোঁজে। ও সব আমার দ্বারা হবে না,' ঘেন্নায় গা রি-রি করে ওঠে ইক্‌থিয়ানডারের। 'তোমার একটা কথাও বিশ্বাস করি না আমি, গুটিয়েরে এত লোভী নয়। এরকম নোংরা কাজে আমাকে কখনো পাঠাতে পারে না সে।'

'ক্যারাম্‌বা!' মাতৃ ভাষায় বোমার মতই ফেটে পড়ে জুরিটা। গেল সব প্ল্যান বানচাল হয়ে। কিন্তু চকিতে সামলে নেয় নিজেকে। মাথা ঠাণ্ডা রাখলে এখনো কাজ হাসিল হতে পারে।

অত্যন্ত মিঠে হেসে বলে—'খুব উজবুক নও তুমি। বেশ, তাহলে খুলেই বলা যাক। 'মাফালদা'র সোনা আমার দরকার, গুটিয়েরের নয়। কি এবার বিশ্বাস হচ্ছে?'

না হেসে পারে না ইক্‌থিয়ানডার। বলে—'তা হচ্ছে।'

'চমৎকার! মুস্কিল তো সেইখানেই। তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে চাও না বলেই আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না। এখন থেকে যদি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পার, তবে আমার বিশ্বাস তুমি পাবে। ব্যাপার কি জানো? তুমি বলেছিলে না তোমার অনেক মুক্তো আছে?'

'আছেই তো।'

'সে মুক্তো আমি চাই না। তার বদলে 'মাফালদা'র সোনা এনে দিলেই তুমি ছাড়া পাবে।'

ইক্‌থিয়ানডার কোন জবাব দেয় না।

জুরিটা বলে—'কিন্তু তোমাকে ছাড়তে ভরসা পাচ্ছি না আর ফিরে আসবে না বলে।'

মুখ লাল করে ইক্‌থিয়ানডার বললে—'আমি যদি বলি ফিরে আসব তাহলে নিশ্চয় আসব।'

'সে তো ভাল কথা। কিন্তু আজ পর্যন্ত পরখ করবার সুযোগ আসেনি বলেই ভয় হচ্ছিল। কিন্তু গুটিয়েরের কথা তুমি ঠেলতে পারবে না। তাই ওকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে আনলাম, গুটিয়েরেকে কথা দিয়েছি, সোনা এনে দিলেই তুমি ছাড়া পাবে।'

মনে মনেই বলে জুরিটা, আগে সোনা তো আনো বাছাধন। এখুনি না

আনলে আর কেউ নিয়ে নেবে। তারপর আসবে মুক্তোর পালা, মুক্তোর ঠিকানা আর কেউ জানে না, কাজেই পরে হলেও চলবে। সবশেষে আবার বাঁধবো তোমায়, সোনা, মুক্তো, তুমি—সবকিছুরই মালিক হব আমি।

কিন্তু মুখখানাকে এমন সাধু-সজ্জনের মত করে তোলে জুরিটা যে, অনভিজ্ঞ ইক্‌থিয়ানডারের বিশ্বাস জন্মায়। সংসারের ছলচাতুরী সে কতটুকুই বা আর জানে? জুরিটার যুক্তি আর সততা তার অন্তর স্পর্শ করে। একটু ভেবেই রাজী হয়ে যায়।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পেড্রো জুরিটা।

বলে—'তবে চলো এক্ষুনি যাওয়া যাক!'

তিন লাফে ডেকে উঠে আসে দুজনে এবং পরিষ্কার এক লাফে রেলিং টপকে জলে গিয়ে পড়ে ইক্‌থিয়ানডার।

মাল্লারাও দেখে আশ্চর্য ডুবুরীকে ঝাঁপ দিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে জুরিটার নয়া মতলব। 'মাফালদা'র সোনার ভাঁড়ার লুঠ করে একাই আত্মসাৎ করার ফন্দী এঁটেছে পেড্রো জুরিটা।

বারুদে আগুন পড়ল, দপ করে জ্বলে উঠল বিদ্রোহের দাবানল। এবং মুহূর্তে পেছন থেকে আক্রান্ত হল পেড্রো জুরিটা, সেই মুহূর্তেই ডোবা জাহাজের ওপরের ডেকে পেঁছালো ইক্‌থিয়ানডার।

বিশাল হ্যাচ আর রাজপ্রাসাদের সোপানের মত সিঁড়ির ওপর দিয়ে মস্ত মাছের মতই পিছলে সুপ্রশস্ত গলিপথে ঢুকে পড়ল ইক্‌থিয়ানডার। চারিদিকে অন্ধকার, কয়েকটা খোলা দরজার নিষ্প্রভ আলো আলোকবিন্দুর মতই জেগে রয়েছে নিবিড় তমিস্রার মধ্যে।

একটা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে ইক্‌থিয়ানডার। সুখাসন আর পালঙ্ক সাজানো মস্ত লাউঞ্জ ঘর। বড় বড় পোর্টহোলের ম্লান আলোয় অস্পষ্ট চারিদিকে। একসঙ্গে কয়েকশ লোককে জায়গা দেওয়ার মত বিশাল হলঘর এখন জনশূন্য। ঘরের মাঝখানে এসে প্রকাণ্ড একটা ঝাড় লণ্ঠনের ওপর বসে চারিদিক দেখতে লাগল ইকথিয়ানডার।

দমে যাওয়ার মত দৃশ্য, লণ্ডভণ্ড চারদিক। যেন অকল্পনীয় প্রলয়ে বিপর্যস্ত। রাশি রাশি চেয়ার আর টেবিল ছত্রাকার চারদিকে, ঘরের কড়িকাঠেও গিয়ে ঠেকেছে চেয়ারের স্তূপ। এককোণে মঞ্চের ওপর বসানো গ্রাণ্ড পিয়ানো হেলে পড়েছে—ডালাটা ছিটকে পড়েছে নরম কার্পেটের ওপর। মেহগনী দেওয়ালের অসংখ্য তৈলচিত্র কিছু আছে—কিছু ছিঁড়ে পড়েছে।

ঝাড় লণ্ঠনটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে একদিকের পাম গাছগুলোর দিকে সাঁতার কেটে যায় ইক্‌থিয়ানডার এবং পরমুহূর্তেই চমকে ওঠে। ঠিক উল্টো দিকে আর একজন সাঁতারে আসছে ওর দিকে। ও থামলে থামছে, এগোলে এগোচ্ছে।

পরক্ষণেই হেসে ফেলে ইক্‌থিয়ানডার। আয়না। দেওয়াল জোড়া একখানি

মাত্র বিশাল দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে এতবড় হলঘরটা যেন অসংখ্য হলঘর হয়ে ছড়িয়ে গেছে দূর হতে দূরে।

সোনা দানার কোন চিহ্ন পেল না ইক্‌থিয়ানডার। আবার হলঘর। ওপরের ঘরের মতই সাজানো এবং আকারে বিশাল। তবে এটা রেস্তোরাঁ ঘর। কাউণ্টারে ছড়ানো রাশিকৃত মদের বোতল। অধিকাংশ বোতলের ছিপিই জলের চাপে ভেতরে ঢুকে গেছে। খাবারের টিনগুলোও চেপটে গেছে। ছুরি কাঁচি প্লেট পড়ে ঘরময়।

কেবিনের দিকে রওনা হয় ইক্‌থিয়ানডার।

এক-একটা কেবিনে ঢোকে আর বেরিয়ে আসে ইক্‌থিয়ানডার।

বিলাসোপকরণের ছড়াছড়ি চারিদিকে। যেখানেই চোখ পড়ে, সেখানেই মার্কিন স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাক্ষর। কিন্তু কোথাও জনপ্রাণী নেই। প্রাণের চিহ্ন নেই কোনো কেবিনে! তিন নম্বর ডেকের একটা কেবিনে শুধু একটা ফোলা দেহ চোখে পড়ে। সিলিংয়ের কাছে ঠেকে মৃদু মৃদু দুলছিল লাশটা।

ইক্‌থিয়ানডার ভাবে, ডোববার আগেই লাইফবোট নামিয়ে নিশ্চয় প্রাণে বেঁচে গেছে যাত্রীরা। কিন্তু থার্ড ক্লাসে গিয়ে দেখে এক বীভৎস দৃশ্য। অগুন্তি লাশে ঘরটা একদম ঠাসা। ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ, শ্বেতাঙ্গ, চীনে, নিগ্রো, ভারতীয়, রেড-ইণ্ডিয়ান—ছত্রিশজাতের শত শত মৃতদেহ ভাসছে থার্ড ক্লাশের মধ্যে।

শিউরে ওঠে ইক্‌থিয়ানডার। জাহাজ ডুবতে শুরু করলেই আগে ফার্ষ্ট ক্লাশের যাত্রীদের নামিয়ে দিয়েছে মাল্লারা। থার্ড ক্লাশের কথা ভাবেনি। ফলে একযোগে নিচ থেকে বেরোতে গেছে ঘরভর্তি লোক। দাপাদাপিতেই প্রাণ হারিয়েছে কতজন, আধমড়াদের পায়ে মাড়িয়েই দৌড়েছে—কিন্তু কেউ প্রাণে বাঁচেনি। রাস্তা বন্ধ হয়ে যেতে ইঁদুরের মত মারা গেছে এতগুলি প্রাণী। কেবিনের দরজার মুখে মড়ার গাদা, এমন উঁচু যে ভেতরে ঢোকার পথ পায় না ইক্‌থিয়ানডার।

খোলা পোর্টহোল দিয়ে জল ঢুকছে সুদীর্ঘ গলিপথে। ফুলে ওঠা মড়াগুলো অল্প অল্প দুলছে জলের ধাক্কায়। ভয় ভয় করে ইক্‌থিয়ানডারের। দ্রুত হাত পা চালিয়ে জলতলের কবরখানা থেকে উঠে আসে ওপরে।

গুটিয়েরে নিশ্চয় জানে না পাতালপুরীর কী বীভৎস যমালয়ে সে পাঠিয়েছে ইক্‌থিয়ানডারকে। তাছাড়া মড়া ঘেঁটে সোনা লুঠ করার প্রবৃত্তি গুটিয়েরের আছে বলে মনে হয় না ইক্‌থিয়ানডারের। না, কখ্‌খনো নয়। এত জঘন্য মনোবৃত্তি গুটিয়েরের থাকতে পারে না। এ সমস্তই জুরিটার কারসাজি। গুটিয়েরের নামে প্যাঁচ কষে ইক্‌থিয়ানডারকে পাঠিয়েছে মড়াদের বাক্স লুঠ করার জন্যে।

ভাবতেই রাগে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে ওঠে ইক্‌থিয়ানডারের। গুটিয়েরে যদি এমন ধারা অনুরোধ করে থাকে, তবে সে আসুক, ইক্‌থিয়ানডারের সামনেই

বলুক’।

পিচ্ছিল মাছের মতই দ্রুত বেগে একটার পরে একটা ডেক পেছনে ফেলে ওপরে উঠে আসে ইক্‌থিয়ানডার। জলের ওপর মাথা তুলেই সাঁতরায় জেলী-ফিশের দিকে।

‘জুরিটা। গুটিয়েরে।’ জলের ওপর থেকেই হাঁক দেয় ইক্‌থিয়ানডার। কারও সাড়া নেই। নিস্তব্ধ জেলীফিশ মৃদু মৃদু দুলতে থাকে ঢেউয়ের ওপর।

গেল কোথায় সব ? না কি নতুন ফন্দী আঁটছে জুরিটা ? খুব সাবধানে স্কুনারের ডেকে ওঠে ইক্‌থিয়ানডার।

‘গুটিয়েরে, কোথায় তুমি ?’

‘এই যে আমরা।’ জুরিটার ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে আসে অনেক দূরে তীর থেকে। ঘুরে দাঁড়ায় ইক্‌থিয়ানডার। জুরিটাই বটে। পাথরের আড়াল থেকে মুখ বার করে তাকেই ডাকছে।

‘গুটিয়েরের শরীর খারাপ। ইক্‌থিয়ানডার এখানে এসো।’

গুটিয়েরে অসুস্থ ! আর কিছু চিন্তা না করে জলে ঝাঁপ দেয় ইক্‌-থিয়ানডার। পুরোদমে সাঁতরে চলে তীরের দিকে।

জল থেকে প্রায় উঠে এসেছে ইক্‌থিয়ানডার, এমন সময়ে শোনা গেল গুটিয়েরের অবরুদ্ধ আর্ত চীৎকার—‘ইক্‌থিয়ানডার ! সমস্ত মিথ্যে। পালাও।’

পেছন ফিরেই ঝাঁপ দিল ইক্‌থিয়ানডার এবং ডুব সাঁতারে তলিয়ে গেল জলের নিচে। খানিকটা দূরে এসে জলের ওপর মাথা তুলতেই দেখা গেল তীরে দাঁড়িয়ে সাদা রুমাল ওড়াচ্ছে গুটিয়েরে।

বিদায় ! বিদায় গুটিয়েরে ! আর কি আমাদের দেখা হবে ?

খোলা সমুদ্রের দিকে জল কেটে এগিয়ে যায় ইক্‌থিয়ানডার। ধু-ধু সমুদ্র। বহু দূরে দিগন্তে দেখা যাচ্ছে শুধু একটি বিন্দু—দক্ষিণ দিকে চলেছে খুব নিচু একটা জলস্রোত।

তীক্ষ্ন গলুয়ের সামনে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে উত্তাল ঢেউ, পেছনে বিস্তৃত সুদীর্ঘ ফেনিল রেখা।

মানুষের সান্নিধ্য আর নয়। অন্তরের অসীম জ্বালা জুড়োবার জন্যেই খাড়া ডুব দিয়ে গভীর সমুদ্রে অদৃশ্য হয়ে যায় বিচিত্র উভচর প্রাণী ইক্‌থিয়ানডার।

# তৃতীয় খণ্ড

## হারানো বাবা

নিষ্ফল সাবমেরিন অভিযানের পর থেকেই মেজাজ খিঁচড়ে গেছিল বালতাসারের। দিন নেই রাত নেই গুম মেরে বসে থাকত আর ভাবত।

একদিন গালে হাত দিয়ে এমনি ভাবে দোকানে বসেছিল বালতাসার। একা। মাঝে মাঝে বিড়বিড় করছিল নিজের মনে—'মরে না কেন এই সাদা চামড়াগুলো। শেষ করে দিল আমাদের। জমি দখল করেছে। আবার আমাদেরই গোলাম বানিয়েছে। তাতেও পিশাচগুলোর আশ মেটেনি। ছেলেদের পঙ্গু করেছে, ঘরের মেয়েদের চুরি করেছে। দেশটাকে ছারখার করে দিলে গো·· জাতটাকে একদম শেষ না করে ছাড়বে না।'

ঠিক এমনি সময়ে ঘরে ঢুকল ক্রিস্টো—'ভায়া আছো কিরকম? জোর খবর এনেছি। গরম খবর। ইক্‌থিয়ানডারকে পাওয়া গেছে।'

'কী!' জ্যামুক্ত ধনুকের মত ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠল বালতাসার।

'ধীরে! ধীরে! অত উত্তেজিত হয়ো না। ইক্‌থিয়ানডার নিজেই ফিরে এসেছে। আমি ঠিকই বলেছিলাম। ডোবা জাহাজে গেছিল ও।'

'এখন আছে কোথায়? স্যালভেটরের আস্তানায়?'

'হ্যাঁ।'

'চললাম আমি। আমার ছেলে আমি ফেরৎ চাই।'

'কোন পাত্তাই পাবে না ওখানে। ইক্‌থিয়ানডার যে তোমারই ছেলে, তা মানতেই চাইবে না স্যালভেটর। তাছাড়া, ওকে এখন জলে বেরোতেই বারণ করে দিয়েছেন স্যালভেটর। আমি অবশ্য লুকিয়ে চুরিয়ে বেরোতে দিই।'

'আমার ছেলে আমাকে দেবে না মানে? খুন করে ফেলব আমি! কুত্তা দিয়ে খাওয়াব।'

'আঃ, কী ছেলেমানুষি করছ? কাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরো। আজ এখানে আসতে যে কি বেগ পেতে হয়েছে, তা যদি জানতে। নাতনিকে দেখব বলে বেরিয়েছি। কিন্তু মোটেই বিশ্বাস হয়নি স্যালভেটরের। তাই বলছি, আজ যাক।'

'বেশ, বলছ যখন আজ ওকে রেহাই দিলাম। কিন্তু কাল ছাড়ব না। আজকে তীরে দাঁড়িয়ে থাকব। ইক্‌থিয়ানডার যদি সাঁতরাতে আসে তো দেখা হয়ে যাবে।'

সেদিন সমস্ত বিকেল আর সমস্ত রাত সাগর পারে কাটাল বালতাসার। পাথরে

বসে ঠায় তাকিয়ে রইল উদ্বেল জলরাশির পানে। সমুদ্র সেদিন বড়ই অশান্ত। কনকনে ঝড়ো হাওয়ায় ভয়ংকর, অথচ চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় অপরূপ। ঢেউয়ের নাচন দেখেই রাত ভোর হয়ে গেল। ফর্সা হয়ে এল আঁধার আকাশ। তখনও হা-পিত্যেশ করে বসে রইল বালতাসার।

তারপরেই বিদ্যুৎ খেলে গেল নৈরাশ্য-স্তিমিত দুই চোখে। দূরে, বহু দূরে কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে না? কালো মত একটা বস্তু ভাসছে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকালে বালতাসার। মানুষ। দুহাত মাথার পেছনে রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে একজন মানুষ। ঢেউ দুলছে, সে দুলছে। ঢেউ উঠছে, সে-ও উঠছে। ঢেউ নামছে, সে-ও নামছে।

এই কি তাহলে ইক্‌থিয়ানডার? অবলীলাক্রমে এমন ভাবে জলে ভেসে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করার ক্ষমতা কি ডাঙার মানুষের আছে?

বালতাসারের ভুল হয়নি। ভাসমান মানুষটি ইক্‌থিয়ানডারই বটে। অবরুদ্ধ আবেগে বিকট গলায় চীৎকার করে উঠল বালতাসার—'ইক্‌থিয়ানডার! ইক্‌থিয়ানডার! আমি তোমার বাবা!'

সঙ্গে সঙ্গে দুহাত মাথার ওপর তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলের মধ্যে।

ওস্তাদ সাঁতারু বালতাসার এক ডাইভেই জলের মধ্যে অনেকটা তলিয়ে গেছিল। বেশ কিছুক্ষণ পরে ঢেউয়ের ওপর মাথা তুলে দেখল সাগর শূন্য।

ভাসমান মানুষটি কর্পূরের মতই উবে গেছে!

অথবা ডুব দিয়ে ফিরে গেছে পাতালপুরীতে—যেখানে পেঁছোয় না মানুষের ডাক।

পাঁজর খালি করা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তীরে ফিরে এল বৃদ্ধ। রোদ আর হাওয়ায় ভিজে জামা কাপড় শুকিয়ে যেতেই মনস্থির করে ফেললে। দৃঢ় পদক্ষেপে এসে দাঁড়াল স্যালভেটরের কেল্লার সুদৃঢ় গবেষণাগারের সামনে। দমাদম ঘুসি মারতে লাগল ইস্পাতের ফটকের ওপর।

খট করে খুলে গেল ছোট্ট ফোকর—'কে ওখানে?'

'ডাক্তারের সঙ্গে এক্ষুনি কথা বলতে চাই। ভীষণ জরুরী ব্যাপার।'

'ডাক্তার সাহেব এখন কারুর সঙ্গে দেখা করছেন না।' খটাস করে বন্ধ হয়ে গেল ফোকর।

আরো কয়েকবার লাথি ঘুসি মারল বালতাসার। ফোকর আর খুলল না, দরজাও ফাঁক হল না। শুধু ভেসে এল কুকুরের হিংস্র গর্জন—পাঁচিলের ওপাশে কোথাও খেপে উঠেছে একপাল খুনে কুকুর।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বিউনোআয়ার্সে রওনা হল বালতাসার। শয়তান স্প্যানিয়ার্ড। আজ তোমার একদিন কি আমারই একদিন!

আদালত থেকে কিছু দূরেই একটা চারচৌকো সেকেলে বাড়ী আছে, মোটা-মোটা দেওয়াল। সাদা চূণকাম করা। চার পাশে সংকীর্ণ বারান্দা। বারান্দায়

পাতা টেবিল চেয়ার, সন্ধ্যে হলেই মদের আড্ডা জমে এখানে। আইন সংক্রান্ত জল্পনা চলতে থাকে। উকিল, মোক্তার মুহুরী থেকে শুরু করে মিথ্যে সাক্ষী যারা দেয়, তারাও আসে দু পয়সা রোজগারের আশায়। দিনের বেলাতেও টেবিল খালি থাকে না। তখন আর বারান্দায় নয়, ঘরের ভেতরে ঠাণ্ডায় আড্ডা জমে। যেন একটা ছোট খাটো আদালত বসে যায়। সবারই হাতে মদের গেলাস। আলোচনার বিষয়, আদালত।

এ রেস্তোরাঁর নাম লা পালমেরা। ব্যবসার খাতিরে বহুবার লা পালমেরাতে আসতে হয়েছে বালতাসারকে। এখানকার নাড়ী নক্ষত্র তার জানা।

বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢোকে বালতাসার, বাইরের গরম এখানে নেই। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে একটা ছোকরাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে—'লারা কোথায় ?'

'ডন ফ্লোরেস ডি লারা যেখানে রোজ বসেন, আজও সেখানেই আছেন,' ঝটিতি জবাব দিয়ে মুচকি হাসে ছোকরা।

বাস্তবিকই রোজকার মত আজও কোণের টেবিল আলো করে বসেছিল ডন ফ্লোরেস ডি লারা। ইদানীং এই গালভরা নামেই পরিচিত। সে এতকালে ছিল কোর্টের মুহুরী। চাকরী যায় ঘুস নেওয়ার অপরাধে। কিন্তু রোজগার কমেনি। পরামর্শ নিতে বহু মক্কেল রোজই ঘিরে ধরে তাকে। এর আগেও বালতাসারের অনেক কাজ করে দিয়েছে লারা।

গথিক জানলার সামনের টেবিলে বসেছিল লারা। টেবিলের ওপর মদের গেলাস আর বাদামী রঙের পেটমোটা এ্যাটাচি কেস। বুক পকেট থেকে উঁকি মারছে ফাউণ্টেন পেন। পরনে জলপাই রঙের জীর্ণ সুট। থলথলে নাদুস-নুদুস মানুষ। মাথাজোড়া টাক। রক্তিম গাল আর নাক। দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার কামানো। মুখ চোখে হামবড়া ভাব। মাথার সামান্য কটা সাদা চুল হাওয়ায় উড়ছে। স্বয়ং বিচারপতি এরকম আমিরী কায়দায় বসে থাকতে পারেন কিনা সন্দেহ।

বালতাসারকে আসতে দেখে ইঙ্গিতে সামনের ভাঙা চেয়ারটা দেখিয়ে দিলে লারা।

বলল—'বস। কি ব্যাপারে আসা হয়েছে ? মদ খাবে ? কি মদ ?'

লারার আতিথেয়তার প্রথম নিয়মই হল অর্ডার দেবে সে এবং পয়সা দেবে মক্কেল।

কর্ণপাত করল না বালতাসার।

'লারা, খুব জরুরী ব্যাপার। দারুণ দরকার।'

'ডন ফ্লোরেস ডি লারা,' সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে দেয় প্রবীণ আইনজ্ঞ এবং সুরুৎ করে সুরায় চুমুক দিয়ে গলা ভিজিয়ে নেয়।

শুনেও শোনে না বালতাসার।

'দরকারী ব্যাপারটা কি শুনতে পারি ?'

'লারা, তুমি তো জানো—'

'ডন ফ্লোরেস ডি—'

'ধুত্তোর, ডন ফ্লোরেসের। ওসব তাপ্পি নতুন যারা তাদের কাছে মেরো,' খেঁকিয়ে ওঠে বালতাসার। 'বলছি ব্যাপারটা দরকারী। তা না খালি—'

'বেশ, বেশ, বলো,' এবার একদম অন্য সুরে বলে লারা।

'সমুদ্র-শয়তানের নাম শুনেছ ?'

'শুনেছি। কিন্তু আলাপ করার সৌভাগ্য এখনো হয়নি।'

'যাকে সবাই 'সমুদ্র-শয়তান' বলেই জানে, সে আমারই ছেলে।'

'অসম্ভব। ক'পেগ খেয়ে এসেছো ? নেশা জমেছে দেখছি।'

দমাস করে টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করে বললে বালতাসার—'কাল থেকে আমার পেটে কিছু পড়েনি। খাবার তো নয়ই—মদ দূরের কথা। কয়েক ঢোক লোনা জল অবশ্য গিলেছি—'

'তাহলে তো অবস্থা আরো খারাপ বলতে হবে।'

'আরে মোলো যা ! যা বলি কান খাড়া করে শোনো।' বলে সমস্ত কাহিনীটা বলল বালতাসার।

মন দিয়ে সমস্ত শুনল লারা। মধ্যে মধ্যে অপরিসীম বিস্ময়ে নেচে নেচে উঠল ধূসর ভুরুজোড়া। বালতাসার থামতেই ছদ্ম গাম্ভীর্য দিয়ে দড়াম করে ঘুসি বসিয়ে দিল টেবিলের ওপর।

'সাবাস !' লা পালমেরার মুকুটহীন বাদশা তো এ রকম বেয়াদবীতে অভ্যস্ত নয়, হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল একজন ছোকরা।

খোসমেজাজে তক্ষুনি বরফ মেশানো দু'গেলাস উৎকৃষ্ট সুরার অর্ডার দিয়ে দিলে ডন ফ্লোরেস ডি লারা।

তারপর বলল—'চমৎকার ! চমৎকার ! খাসা গল্প বানিয়েছ, বালতাসার। বলিহারি যাই বুদ্ধির। গলদ শুধু এক জায়গায়। তুমিই যে সমুদ্র-শয়তানের বাবা, তা প্রমাণ করাই মুস্কিল।'

সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে বালতাসার—'তুমি কি মনে করো এক ঝুড়ি মিথ্যে বলার জন্য এত দূরে এসেছি।'

'আরে ছ্যা, ছ্যা, তাও কি সম্ভব ? আমি আইনের চোখে যাচাই করছিলাম। দেখলাম, ফাঁক শুধু ঐ একটা জায়গায়। আরে ব্রাদার, কোর্টে কেসটাকে দাঁড় করাতে হবে তো ? তবেই না পয়সা পিটবে ?'

'আমি পয়সা চাই না, আমার ছেলেকে চাই।' ফ্যাঁস করে ওঠে বালতাসার।

'পয়সা কে না চায় ? পয়সা থাকলেই দুনিয়ার সব পাওয়া যায়। বুঝলে ভায়া, তোমার কেসে সব চাইতে জোরালো পয়েণ্ট হচ্ছে, কচি বাচ্ছার ওপর স্যাল-

ভেটরের ছুরি চালানো। আহা রে, এই জায়গাটাতে একটু মোচড় দিলেই পয়সা বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে যাবে। পকেট উপচে পড়বে।'

'আমার ছেলে আমি চাই। আমার হয়ে স্যালভেটরের বিরুদ্ধে একটা শমন লিখে দাও দিকি।'

'পাগল নাকি! সমস্ত কেসটাই কেঁচে যাবে। শমন পরে হলেও চলবে।'

'কি করতে বলো তুমি?'

মোটা আঙুল তুলে বলে লারা—'প্রথমেই একটা চিঠি দিতে হবে স্যাল-ভেটরকে। খুব বিনীত ভাষায় তাতে লেখা থাকবে, তোমার সব কীর্তিই আমরা জানি। এক্সপেরিমেণ্টের নামে নিরীহ শিশুদের ওপর যে পৈশাচিক অস্ত্রোপচার করছ, তা ফাঁস করে দিলে মহা বিপদে পড়বে। ভাল চাও তো এক লক্ষ 'পিসোস' দাও, মুখ বুজে থাকব।'

এই পর্যন্ত বলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় লারা। কিন্তু কোন কথা না বলে ভ্রূকুটি কুটিল চোখে শুনতে থাকে বালতাসার।

লারা বলে—'এই গেল প্রথম মোচড়। দ্বিতীয় মোচড়টা হবে এই রকম। এক লাখ 'পিসোস' পাওয়ার পরেই আমরা আরো বিনয় করে লিখব দু'নম্বর চিঠি। এ চিঠিতে স্যালভেটরকে লেখা হবে যে, ইক্‌থিয়ানডারের প্রকৃত বাবার সন্ধান পাওয়া গেছে এবং তা প্রমাণ করার মত অকাট্য প্রমাণও মজুদ রয়েছে। ছেলেকে ফিরে পাওয়ার জন্য বাবা কোর্টে যেতেও রাজী। সেক্ষেত্রে দুনিয়ার লোক জানতে পারবে স্যালভেটরের কুকীর্তি—মামলা চলার সময়েই ফাঁস হয়ে যাবে ইক্‌থিয়ান-ডারকে পঙ্গু করা হয়েছে ছুরি চালিয়ে। কিন্তু দশ লাখ 'পিসোস' দিলে কোর্টে যাতে কেস না ওঠে, সে ব্যবস্থা করা হবে।'

খপ করে একটা বোতল তুলে নিয়ে লারার টাক-মাথার ওপর বাঁই বাঁই ঘোরাতে থাকে বালতাসার। এই মারে কি সেই মারে! বালতাসারের এমন মার মুখো চেহারা কোনদিন দেখেনি লারা।

এক হাত দিয়ে চকচকে টাক ঢেকে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে ওঠে লারা—'আরে আমি ঠাট্টা করছিলাম। বোতলটা আগে নামাও দিকি ব্রাদার, তারপর কথা!'

রাগে ফুলতে ফুলতে বলে বালতাসার—'মরছি নিজের জ্বালায় আর তুমি এসেছো টাকা রোজগারের ফন্দী বাতলাতে। বলছি না ছেলে বিক্রী করার জন্যে আমি আসিনি? তুমি কি মানুষ, না, বিছে, না মাকড়শা—বাপের কষ্ট বোঝো না?'

'আমি বুঝি না তা বোঝে কে? জানো আমার পাঁচ ছেলে? ছোট বড় পাঁচ-পাঁচটা বাঁদর? পাঁচটা বাপের কষ্ট আমাকে একা পোয়াতে হয়। পাঁচটা পেটের রুটি রোজগার করতে হয়। বাপের কষ্ট আমার চাইতে তুমি কি বুঝবে

হে ?'  এবার লারা নিজেই চোখ মুখ লাল করে ফেলে। 'যা বলি আগে মন দিয়ে শোনো। না পোষায়, পথ দেখো।'

নিজেকে সামলে নেয় বালতাসার। বোতলটা নামিয়ে রেখে বলে—'বলো।'

'এই তো লক্ষ্মী ছেলের মত কাজ। তাহলে দশ লাখ 'পিসোস' এক মোচড়েই পাওয়া গেল। মেলাই টাকা। ইক্‌থিয়ানডারের অভাব মিটিয়েও কিছু বাড়তি থাকবে। সেটা আমার প্রাপ্য। মাথা ঘামানোর পারিশ্রমিক। বেশী না, লাখ খানেক 'পিসোস' হলেই চলে যাবে। টাকাটা পাওয়া গেলেই—'

'স্যালভেটরকে কোর্টে হাজির করা হবে।'

'উহুঁ, উহুঁ, আরও ধৈর্য দরকার। এবার স্যালভেটরের এই মহাপাপের কাহিনী আমরা খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেব। বিনিময়ে বিশ ত্রিশ হাজার 'পিসোস'ও তো পাওয়া যাবে—পকেট খরচ হিসেবে তাই বা মন্দ কি? পুলিশ মহলেও খবরটা সরবরাহ করতে পারলে কাজ হবে। প্রমোশন-লোভী অফিসাররা তোমার বাড়ী বয়ে টাকা দিয়ে যাবে। এইভাবে স্যালভেটর যখন ফতুর হবে, তখনি যাবে আদালতে। ছেলেকে ফেরৎ পাওয়ার মামলা করবে। সুড়-সুড় করে ছেলেকে ফিরিয়ে দেবে স্যালভেটর।'

এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করে দিয়ে ঠন্‌ করে নামিয়ে রাখল লারা। তারপর বিজয়োল্লাসে তাকাল বালতাসারের পানে।

'কি রকম মনে হয় প্ল্যানটা?'

'বোগাস। ছেলের জন্য আমার চোখে ঘুম নেই, খেতে রুচি নেই তুমি যে প্ল্যান বাতলালে তাতে ছেলেকে যে কবে পাব, তার কোন ঠিক নেই।'

'আরে উজবুক! বিশ বছর ছেলে ছাড়াই যখন কেটেছে, আরও কটা দিন সবুর করলে কি মরে যাবে? মাঝখান থেকে লাখ লাখ 'পিসোস' হাত ছাড়া হবে কেন? তোমার মাথা-টাথা ঠিক আছে তো?'

'না বেঠিক আছে। যা বলি শোনো। কাগজ বার করে শমনটা লিখে দাও।'

'গোঁয়ার্তুমি ছাড়ো, বালতাসার। আর কটা দিন সবুর কর। এক লাখ দু'লাখ নয়, লাখ-লাখ পিসোস···পাগলামো করো না। টাকা এলে সব হবে। দামী গাড়ী, দামী তামাক, দামী জাহাজ, এমন কি এই রেস্তোরাঁটাও—'

'শমনটা লেখো। না পারলে বলো, অন্য কারোর কাছে যাই—' শেষ কথা বলে বালতাসার।

আর উচ্চবাচ্য করে না লারা। এ্যাটাচি কেস থেকে এক তা কাগজ বার করে টান মেরে পকেট থেকে কলম নামিয়ে খস খস করে লিখে ফেলে শমন। আইনানুগ ভাষায় স্যালভেটরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় বেআইনীভাবে বালতাসারের ছেলেকে গুম করে পঙ্গু করার।

'শেষবারের মত বলছি, বালতাসার। পাগলামি ছাড়ো।' বলে লারা।

'দাও।' হাত বাড়ায় বালতাসার।

'চীফ প্রসিকিউটরকে দেবে,' বলে মক্কেলকে যথা বিহিত পরামর্শ দেয় লারা। বালতাসার পেছন ফিরতেই নিম্নকণ্ঠে বলে, 'সিঁড়িতেই পা পিছলে যেন ঘাড়টা ভেঙে যায়, ব্যাটা বোকা পাঁঠা কোথাকার!'

প্রসিকিউটরের আপিস থেকে বেরোতেই বালতাসার মুখোমুখি হয়ে যায় জুরিটার সঙ্গে।

'কি চাই এখানে?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে শুধোয় জুরিটা। 'আমার নামে মামলা করতে আসা হয়েছে বুঝি?'

'গুষ্টিশুদ্ধ তোমাদের সকলের নামে মামলা করা উচিত,' গুষ্টি বলতে স্প্যানিয়ার্ডদেরই বোঝায় বালতাসার। 'কিন্তু করবে কে? কোথায় লুকিয়ে রেখেছ আমার মেয়েকে?'

দপ করে জ্বলে উঠে জবাব দেয় জুরিটা, 'কি করে ভদ্রভাবে কথা বলতে হয়, তা শেখাতে হবে দেখছি। নেহাৎ আমার শ্বশুর, নইলে জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতাম।'

বলে, এক ধাক্কায় বালতাসারকে পথ থেকে সরিয়ে হন্ হন্ করে ওক কাঠের বিশাল দরজা পেরিয়ে চীফ প্রসিকিউটরের ঘরে ঢুকে যায় পেড্রো জুরিটা।

## নজীর ছাড়া মামলা

বিউনোআয়ার্সের চীফ প্রসিকিউটরের আপিস কক্ষে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির আগমন ঘটে, কিন্তু ডীন অফ দি ক্যাথেড্রাল, হিজ গ্রেস দি বিশপ জুয়ান ডি গারসিলাসকোর মত মহামান্য পুরুষ বড় একটা আসেন না।

চীফ প্রসিকিউটর মোটা মানুষ। চর্বির খাঁজে ছোট ছোট কুৎকুতে চোখ। কদম ছাঁট চুল এবং কলপ দেওয়া গোঁফ। মহামান্য বিশপের আবির্ভাব ঘটতেই শশব্যস্তে চেয়ার ছেড়ে টেবিল প্রদক্ষিণ করে এগিয়ে এলেন সাদর সম্ভাষণ জানাতে এবং পুরু চামড়ায় মোড়া ভারী আর্মচেয়ারে বিশপ মশায়কে বসালেন সসম্মানে।

প্রসিকিউটর আর বিশপের চেহারার অমিল লক্ষ্য করার মত। প্রসিকিউটরের মুখ সাদা আরক্ত, মাংসল, পুরু ঠোঁট এবং বড়ার মত মস্ত থ্যাবড়া নাক। হাত-পাগুলো যেন অতিকায় শসা, উদর প্রদেশের বোতাম মনে হয় যে কোনো মুহূর্তেই ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে আসবে বন্দী মেদের প্রচণ্ড চাপে।

পক্ষান্তরে শীর্ণতা এবং রক্তহীনতা মহামান্য বিশপের মুখমণ্ডলের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য দুটি বৈশিষ্ট্য। বাজপাখীর মত তীক্ষ্ন বক্র নাক ধারালো চিবুক আর পাতলা নিরক্ত অধরোষ্ঠ দেখলে তাঁকে যাজক ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। কুটনীতি বিশপ-মহাশয়ের অবসর বিনোদনের প্রিয় উপাদান এবং এজন্যে প্রয়োজন মত গির্জের কাজকর্মে ঢিলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না তিনি। বিশপের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ঃ তিনি কারো মুখের দিকে চেয়ে কথা বলেন না। অথচ তাঁর

ব্যক্তিত্বের প্রভাবও কেউ এড়াতে পারে না।

সম্ভাষণাদি শেষ হলে সোজা কাজের কথা পাড়লেন বিশপ। মৃদু কণ্ঠে বললেন—'আমি জানতে চাই, প্রফেসর স্যালভেটরের কেস এখন কোন পর্যায়ে রয়েছে।'

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তক্ষুনি জবাব দিলেন প্রসিকিউটর—'ইওর গ্রেস, আপনিও এ মামলার খবরাখবর জানতে উৎসুক? রীতিমত অসাধারণ কেস। পেড্রো জুরিটার নালিশ অনুযায়ী প্রফেসর স্যালভেটরের ল্যাবোরেটরী তল্লাস করে যা পাওয়া গেছে, তা অবিশ্বাস্য কল্পনাতীত। জুরিটা অভিযোগ করেছিলেন, ডক্টর-স্যালভেটর নাকি অদ্ভুত অস্বাভাবিক অস্ত্রোপচার করেন জন্তু-জানোয়ারের ওপর। অভিযোগ যে সত্য সে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ডক্টর স্যালভেটরের বাগানটা আসলে দানব-জানোয়ার সৃষ্টির সত্যিকারের কারখানা। ফ্যানট্যাসটিক ব্যাপার! উদাহরণ স্বরূপ, স্যালভেটর—'

মৃদুকণ্ঠে প্রসিকিউটরকে অর্ধ পথেই থামিয়ে দিয়ে বললেন বিশপ—'সার্চের ফলাফল কাগজে পড়েছি। আমি জানতে চাই, স্যালভেটর সম্পর্কে আপনি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তিনি কি এখন হাজতে?'

'হ্যাঁ। স্যালভেটর ছাড়াও আরো একজনকে গ্রেপ্তার করে শহরে নিয়ে এসেছি। স্যালভেটরের কীর্তি-কলাপের পয়লা নম্বর প্রমাণ সে। মামলা চলার সময়ে সে-ই হবে আমাদের প্রধান সাক্ষী। সাক্ষী নেহাৎ-ই ছোকরা, নাম ইক্‌থিয়ানডার ওরফে সমুদ্র-দানব। কেউই কি স্বপ্নেও ভেবেছিল যে, দীর্ঘদিন যে আমাদের জ্বালিয়ে মেরেছে, কুখ্যাত সেই সমুদ্র-দানব ডক্টর স্যালভেটরের চিড়িয়াখানার বাসিন্দা! আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য! অতবড় চিড়িয়াখানাকে শহরে আনা সম্ভব নয়। তাই বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ, বেশীর ভাগই ইউনি-ভার্সিটি প্রফেসর, অকুস্থলেই তদন্ত করছেন। ইক্‌থিয়ানডারকে কেবল শহরে আনা হয়েছে। কোর্টের নিচের কুঠরিতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তার। এখানে এসেও জ্বালিয়ে মারছে ছোকরা। ভাবুন দিকি, শুধু ওর জন্যে একটা পেল্লায় ট্যাঙ্কের অর্ডার দিতে হয়েছে। জল ছাড়া সে নাকি বাঁচতে পারে না। গ্রেপ্তার করার সময়ে দেখা গেছে, বাস্তবিকই শোচনীয় তার অবস্থা। কি-ভাবে জানি না, ইক্‌থিয়ানডারের মধ্যে দারুণ পরিবর্তন এনে দিয়েছেন ডক্টর স্যালভেটর। ফলে উভচর প্রাণী হয়ে গেছে ইক্‌থিয়ানডার। জলে ডাঙায় তার সমান গতি। বিশেষজ্ঞরা মহা সমস্যায় পড়েছেন তাকে নিয়ে।'

আগের মতই মৃদু কণ্ঠে বললেন বিশপ—'আমার আগ্রহ কেবল স্যালভেটরকে নিয়ে। আইনের কোন ধারায় তাঁর সাজা পাওয়া উচিত? শুধু তাই নয়, আদৌ তিনি শাস্তি পাবেন কিনা, তাও জানতে চাই।'

'স্যালেভেটরের কেসের কোনো নজীর অপরাধের ইতিহাসে নেই। সেই কারণে এ কেস অসাধারণ। সত্যি বলতে কি, আইনের কোন ধারায় তার অপরাধ

কাটা ছেঁড়া আর ছেলে ছোকরাদের নিয়ে কিম্ভূতকিমাকার প্রাণী বানানোর চার্জ আনা ...'

ভ্রূকুটিতে কুটিল হয়ে ওঠে বিশপের ললাট।

'তাহলে মোদ্দা কথা এই দাঁড়াচ্ছে যে স্যালভেটরকে অভিযুক্ত করার জন্যে, তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করার মত মাল মশলা নেই ?'

'একেবারেই যে নেই তা নয়। আছে নিশ্চয়। কিন্তু হদিশ পাচ্ছি না। এ ব্যাপারে আরো একটা বিবৃতি সেদিন হাতে এসেছে। বালতাসার নামে এক রেড-ইণ্ডিয়ান নালিশ করেছে, ইক্‌থিয়ানডার নাকি তার ছেলে। লোকটার প্রমাণ-টমাণ অবশ্য তেমন জোরালো নয়, তবুও মামলার সময়ে সাক্ষী হিসাবে তাকে কাজে লাগবে। অবশ্য তার আগে বিশেষজ্ঞদের বলতে হবে ইক্‌থিয়ানডার সত্যিই তার ছেলে।'

'আপনার কি মনে হয় তাহলে পেশাগত নীতিভঙ্গ আর বাপ-মা'র অনুমতি ব্যতিরেকে সন্তানের ওপর ছুরি চালানো—এছাড়া আর কোন চার্জ স্যালভেটরের বিরুদ্ধে নেই ?'

'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়। এক সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত করার অপরাধ। এটা অবশ্য কম অপরাধ নয়। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য অপর দিক থেকে ভাবছেন। তাঁদের মতে সুস্থ মস্তিষ্কে কোনো মানুষের পক্ষে এরকম পৈশাচিক অপারেশনের ধারণাও নাকি সম্ভব নয়। মানুষ তো দূরের কথা, জন্তু-জানোয়ারের ওপরেও এ ধরনের কাটা ছেঁড়ার আইডিয়া সুস্থ বৈজ্ঞানিকের মাথাতেও আসে না। সে ক্ষেত্রে হয়ত তাঁরা স্যালভেটরকে উন্মাদ ঘোষণা করতে পারেন।'

নীরবে বসে রইলেন বিশপ। তাঁর পাতলা অধরোষ্ঠ দৃঢ়সংবদ্ধ, দৃষ্টি টেবিলের কোণায় নিবদ্ধ।

অনেকক্ষণ পরে নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করলেন আগের মতই মৃদু কণ্ঠে—'আপনার কাছ থেকে একথা আমি আশা করিনি।'

থ হয়ে যান প্রসিকিউটর। আমতা আমতা করে বললেন—'কি বললেন, ইওর গ্রেস ?'

'আইনের প্রত্যঙ্গ আপনি। দুজনের ওপর আইন আপনিই প্রয়োগ করেন। আর আপনিই কিনা স্যালভেটরের কুকাজের নিন্দা না করে, প্রকারান্তরে তাঁর অপারেশনকে সমর্থন জানানোর যুক্তি খুঁজছেন।'

'কিন্তু অপারেশনগুলো তো তেমন খারাপ নয় !'

'স্যালভেটরের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করতেও আপনিই দ্বিধা বোধ করছেন। হোলি ক্যাথোলিক চার্চের আদালতে—ভগবানের আদালতে—স্যালভেটরের কুকীর্তি আমরা অন্যভাবে বিচার করতাম। এ সম্বন্ধে আমার পরামর্শ আর

সাহায্য আপনাকে দিতে চাই।’

‘বলুন,’ আরক্ত মুখে বললেন প্রসিকিউটর।

মৃদুকণ্ঠে শুরু করলেন বিশপ। কিন্তু ধাপে ধাপে গলা চড়তে লাগল, ধীরে ধীরে নাটকীয় ভাবে নিম্নগ্রাম থেকে উচ্চগ্রামে উঠে গেল কণ্ঠস্বর। যেন উঁচু বেদী থেকে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দিয়ে নাস্তিকের যুক্তিজাল ছিন্নভিন্ন করতে বদ্ধপরিকর তিনি।

‘আপনার কথা শুনে মনে হল, আপনার বিশ্বাস স্যালভেটর যা করেছেন, তা অকারণে করেন নি। পেছনে যুক্তি আছে। আপনার বিশ্বাস, স্যালভেটর যাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকৃত করেছেন, তারা এমন কয়েক দিক দিয়ে লাভবান হয়েছে যা প্রকৃতি তাদের দেননি। এর মানে কি? এর মানে কি এই নয় যে, সৃষ্টিকর্তার হাতে গড়া মানুষ নিখুঁত নয়? তার মানে কি এই নয় যে স্যালভেটর পরমপিতার ইচ্ছা নাকচ করে মানুষকে নিজের খুশী মত গড়ছেন?’

নীরব বিস্ময়ে হতভম্বের মত বসে রইলেন চীফ প্রসিকিউটর। বিশপ মহাশয় যে শেষ পর্যন্ত বাদীকে প্রতিবাদী বানিয়ে ছাড়বেন, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি।

‘ভুলে গেছেন বুক অফ জেনেসিসের প্রথম পরিচ্ছেদে ছাব্বিশ নম্বর শ্লোকে হোলি বাইবেল কি বলছেন? ‘ভগবান বললেন, এসো মানুষকে আমাদেরই প্রতিকৃতি রূপে সৃষ্টি করি।’ পরে সাতাশ নম্বর শ্লোকে বলছেন, ‘ভগবানের নিজের প্রতিকৃতি স্বরূপ মানুষ সৃষ্টি করলেন।’ স্যালভেটর ভগবানের সেই প্রতিকৃতিই বিকৃত করতে চাইছেন, ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যে সাদৃশ্য, তা নষ্ট করে দিতে উদ্যত হয়েছেন। আর আপনি কিনা সেই প্রচেষ্টাকেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন!’

‘আমাকে ক্ষমা করুন, পাদ্রী’, এর বেশী আর কিছু বেরোয় না প্রসিকিউটরের মুখ দিয়ে।

‘মানুষকে নিখুঁত করেই গড়েছিলেন সৃষ্টিকর্তা। তাই নয় কি? কোনো খুঁতই নেই তার। মানুষের আইনের সব ধারাই আপনার মুখস্থ, কিন্তু ভগবানের আইনের কোনো ধারাই আপনার মনে নেই, বুক অফ জেনেসিসের সেই একই পরিচ্ছেদের একত্রিশ নম্বর শ্লোকটা মনে করে দেখুন, ‘যা কিছু সৃষ্টি করেছিলেন ভগবান তা দেখলেন এবং দেখা গেল সত্যিই সমস্ত ভাল।’ তা সত্ত্বেও কিনা আপনার এই স্যালভেটর মনে করেন, মানুষকে আরো উন্নত করা যায়। মানুষকে উভচর প্রাণী করা যায়। শয়তানি অহংকারে ঈশ্বরের ওপরও মাতব্বরী করতে চান তিনি। আর আপনি কিনা তা সমর্থন করেন, তাঁর কুকাজের পেছনে যুক্তি খোঁজেন! এ কি শয়তান পুজো নয়? অধর্মের আর বাকী রইল কি? ভগবানের বিধান পালটে দেওয়া মহাপাপ এবং এই গুরু অপরাধের সাজা কি আপনাদের আইনে নেই? সবাই যদি আজ এসে বলে, ভগবান মানুষকে হেলা

ফেলা করে সৃষ্টি করেছিলেন এবং সকলেই ত্রুটি সংশোধনের জন্য, নতুন মানুষ হওয়ার জন্য স্যালভেটরের কাছে ধর্ণা দেয়, আপনার আইন কি চুপ করে দাঁড়িয়ে মজা দেখবে? খোদার ওপর খোদকারীর পরিণাম কি জানেন? ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করার পর দেখেছেন সবই নিখুঁত, ত্রুটি কোথাও নেই। কিন্তু স্যালভেটর এসেছেন সাক্ষাৎ অবতার হয়ে। তিনি জন্তু-জানোয়ারের মাথা চামড়া এখানে সেখানে বসিয়ে অপবিত্র দানব সৃষ্টি করে চলেছেন। আর আপনি আইনের মালিক হয়ে কিনা বলছেন, তাঁকে দোষী প্রতিপন্ন করার উপযুক্ত উপাদান পাওয়া যাচ্ছে না!'

ক্ষণিক বিরতি দিলেন বিশপ। জ্বালাময়ী বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন। তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার শুরু করলেন মৃদু কণ্ঠে···আবার ধাপে ধাপে চড়তে লাগল স্বর।

মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে রইলেন চীফ প্রসিকিউটর।

'আগেই বলেছি, আমার আগ্রহ কেবল স্যালভেটরকে নিয়ে। কিন্তু ইক্‌থিয়ানডারের সম্বন্ধে উদাসীন থাকাও আমার পক্ষে শোভা পায় না। লক্ষ্য করেছেন কি, ছোকরার নামের মধ্যেও অধর্ম? এ নাম খৃষ্টান নাম নয়। মাছ আর মানুষের গ্রীক প্রতিশব্দ এক সাথে সন্ধির ফল এই নাম। ইক্‌থিয়ানডারকে অবশ্য পুরোপুরি দোষ দেওয়া যায় না। কারণ সে তো শয়তান-পুজোর উপচার মাত্র। কিন্তু তাহলেও সে ধর্মহীনতায় দুষ্ট, অপবিত্র, অশুভ। ওর অস্তিত্বও অনেককে প্রলুব্ধ করবে। ঈশ্বরের নিখুঁত সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেককেই সন্দিহান করবে। কল্যাণময় ঈশ্বর সম্বন্ধে বহু বিরূপ ধারণা অনেকের মনে বদ্ধমূল হয়ে যাবে। না, ইক্‌থিয়ানডারকেও যেতে হবে! সব চাইতে ভাল হয়, তার স্বর্গলোকে ফিরে যাওয়া—কারণ বিকৃত অঙ্গ নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার তার নেই—' এখানে প্রসিকিউটরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন বিশপ। 'সুতরাং তাকেও শাস্তি পেতে হবে। সমস্ত সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে হবে। আইনের দিক দিয়ে দেখলে, ইক্‌থিয়ানডারও কম অন্যায় করেনি। মাছ চুরি করেছে, জেলেদের জাল ছিঁড়েছে, বেচারীদের এমন ভয় পাইয়েছে যে মাছ ধরাই বন্ধ হয়ে গেছে—শহরেও মাছ চালান আসেনি। অধার্মিক স্যালভেটর আর তাঁর কুকাজের যন্ত্র এই ইক্‌থিয়ানডার—দুজনেই রুখে দাঁড়িয়েছে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, হোলি চার্চের বিরুদ্ধে! তাই এই দুজনের ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই চার্চের।'

আবেগে উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগল বিশপের তীব্র কণ্ঠ। লজ্জায় আত্মধিক্কারে অধোবদনে বসে রইলেন চীফ প্রসিকিউটর। চোখ তুলে তাকানোর মত সাহস রইল না—এক একটি শাণিত শব্দ তীক্ষ্ম তীরের মতই গিয়ে বিঁধতে লাগল অন্তরের অন্তঃস্থলে।

অবশেষে স্তব্ধ হলেন বিশপ। ধীরে ধীরে আনত মুখে উঠে দাঁড়ালেন চীফ

প্রসিকিউটর। শূন্যগর্ভ স্বরে বললেন থেমে থেমে—'খৃষ্টান হিসেবে, ফাদারের কাছে পাপ স্বীকার করে প্রায়শ্চিত্ত করছি। আইন অফিসার হিসাবে, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনার সাহায্যের জন্য। স্যালভেটরের অপরাধ সম্বন্ধে আমার চোখ খুলে গেছে। বিচার ওঁর হবে, শাস্তিও পাবেন। ইক্‌থিয়ানডারের শিরেও নেমে আসবে নেমেসিসের তরবারি।'

## উন্মাদ প্রতিভা

হাজতবাসও টলাতে পারেনি ডক্টর স্যালভেটরকে। আগের মতই তিনি প্রশান্ত, দৃঢ়, কর্তৃত্বব্যঞ্জক। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে প্রাপ্তবয়স্ক যে সুরে কথা বলে, তেমনি ভাবে তদন্তকারী অফিসার আর বিশেষজ্ঞদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। কাজের মানুষ তিনি। তাই হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারেন নি। বেশ কয়েকটা প্রবন্ধ লিখেছেন। কয়েকটা অত্যন্ত কঠিন অপারেশন করেছেন জেল হাসপাতালে। অস্ত্রোপচারে তাঁর আশ্চর্য দক্ষতা দেখে তাক লেগে গেছে ডাক্তারদের। রুগীদের মধ্যে ছিলেন কারাগার গভর্ণরের স্ত্রী। সাংঘাতিক টিউমারে মরতে বসেছিলেন ভদ্রমহিলা। হাল ছেড়ে দিয়ে গেছিলেন অন্যান্য স্পেশালিষ্টরা। ছুরী চালিয়ে স্যালভেটর তাঁকে প্রাণে বাঁচিয়ে দিলেন।

দেখতে দেখতে মোকদ্দমার দিন এসে গেল।

তিল ধারণের স্থান ছিল না অত বড় কোর্টে। ভেতরে জায়গা নেই। তাই কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে গেল বারান্দায়, বাইরের প্রাঙ্গণে। কেউ কেউ গাছের ওপর, আবার কেউ জানালায় উঠে বসল বিচার দৃশ্য দেখার জন্যে।

কাঠগড়ায় বসে ছিলেন ডক্টর স্যালভেটর। ধর্মাবতারসুলভ শান্ত কিন্তু মর্যাদাগম্ভীর মুখচ্ছবি। চালচলনে প্রখর ব্যক্তিত্ব। ঘরশুদ্ধ লোকের দৃষ্টি তাঁর ওপর। দাবানলের মতই খবর ছড়িয়ে গেছে, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আইনজ্ঞের শরণ নেননি স্যালভেটর। সে কাজ নাকি উনি নিজেই করবেন।

ইক্‌থিয়ানডারও এসেছে। কিন্তু আদালতে হাজির নেই। বিচারের দিন যতই এগিয়ে এসেছে, ততই শরীর খারাপ হয়েছে তার। অধিকাংশ সময় জলের ট্যাঙ্কে বাস করা শুরু করেছে দুটো কারণে। প্রথম, ভগ্ন স্বাস্থ্য। দ্বিতীয়, অগণিত দর্শকের কৌতূহলী চাহনি এড়ানো।

স্যালভেটরের মামলায় ইকথিয়ানডারের প্রয়োজন নিছক সাক্ষী হিসেবে। স্যালভেটরের পাপাচারের জীবন্ত প্রমাণ সে। চীফ প্রসিকিউটরের পরিকল্পনা অনুযায়ী ইক্‌থিয়ানডারের মামলার তারিখ পড়বে পরে, পৃথকভাবে। বিশপের ইচ্ছা, আগে স্যালভেটরের শাস্তি হোক। ইতিমধ্যে প্রসিকিউটরের স্যাঙাতরা নিয়মিত লা প্যালমেরাতে গিয়ে সাক্ষী নিয়োগ করছে ইক্‌থিয়ানডারের বিরুদ্ধে। আদালতে মামলা যখন উঠবে তখন অভিযোগের মধ্যে ফাঁকি যেন কোথাও না থাকে। বিশপ অবশ্য প্রসিকিউটরকে বলেই দিয়েছেন, ইক্‌থিয়ানডারের একমাত্র

সাজা হল পৃথিবী থেকে বিদায় দেওয়া।

বিশেষজ্ঞ পরিষদের তরফ থেকে রিপোর্ট দিতে উঠলেন আরটুরো স্টাইন। ইউনিভার্সিটিতে অ্যানাটমির প্রফেসর তিনি। এ ছাড়াও বৈজ্ঞানিক হিসেবে বিলক্ষণ নাম ডাক আছে। থমথমে নৈঃশব্দ্য নেমে এল কোর্টরুমে।

'প্রফেসর স্যালভেটর যাদের ওপর অস্ত্রোপচার করেছেন আদালতের নির্দেশে আমরা তাদের পরীক্ষা করেছি। এদের মধ্যে একজনই শুধু মানুষ। অল্প বয়স। নাম ইক্‌থিয়ানডার। বাকী জন্তুজানোয়ার। প্রফেসরের সার্জারী আর ল্যাবরেটরিও দেখেছি। ছোট হলেও আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানো তাঁর পরীক্ষাগার। আধুনিক প্রযুক্তি আশ্রয় করেই গবেষণা চালিয়েছেন উনি। শুধু তাই নয়, এমন সব অ্যাপারেটাসের ব্যাপক ব্যবহার করেছেন, যা অনেক বড় ল্যাবরেটরীতেও দেখা যায় না। প্রযুক্তি বিদ্যার মধ্যে নাম করা যেতে পারে বৈদ্যুতিক শবব্যবচ্ছেদ আর আলট্রা-ভায়োলেট জীবাণুশোধন। অ্যাপারেটাসের মধ্যে এমন যন্ত্রপাতিও দেখা গেছে যা আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারীতে এখনো অজ্ঞাত। অ্যাপারেটাসগুলো নাকি দরকার মত তাঁরই পরিকল্পনা মাফিক বসানো হয়েছে। জন্তু জানোয়ারদের নিয়ে প্রফেসর স্যালভেটর যে সমস্ত এক্সপেরিমেণ্ট করেছেন তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব না। সংক্ষেপে বলি, প্রতিটি কেসে তিনি দুঃসাহসিক অস্ত্রোপচারের নজীর সৃষ্টি করেছেন। শুধু তাই নয়, অপরিসীম ধীশক্তি আর বৈজ্ঞানিক কল্পনাপ্রবণতা না থাকলে এ ধরনের আশ্চর্য অপারেশনের আইডিয়াও কারো মাথায় আসে না। উনি এক জন্তুর টিশু তুলে নিয়ে অন্য জন্তুর শরীরে বসিয়েছেন। এমন কি আস্ত দেহযন্ত্র তুলে নিয়েছেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নিয়ে অন্য প্রাণীর দেহে জুড়ে দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে দুটো পশুকে একসঙ্গে সেলাই করে দিয়েছেন। বিভিন্ন প্রাণীর নিঃশ্বাসের ব্যবস্থায় বিচিত্র পরিবর্তন এনেছেন। মনো-রেসপাইরেটারী জীবকে করেছেন ডুয়ো-রেসপাইরেটারী এবং ঠিক তার বিপরীত। পুরুষকে নারী বানিয়েছেন, নারীকে পুরুষ। বৃদ্ধকে যুবক করা সম্পর্কেও পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। স্যালভেটরের বাগানে বিভিন্ন বয়সের রেড-ইণ্ডিয়ানদের ছেলেমেয়েদেরও দেখেছি। কয়েক মাস থেকে শুরু করে চোদ্দ বছর পর্যন্ত তাদের বয়স।'

প্রসিকিউটর জিজ্ঞেস করলেন—'কি অবস্থায় দেখেছেন তাদের?'

'বহাল তবিয়তে রয়েছে তারা। প্রত্যেকেই বেজায় সুখী। অনেকেই জীবন ফিরে পেয়েছেন স্যালভেটরের অপারেশন টেবিলে। প্রফেসরের ওপর রেড-ইণ্ডিয়ানদের অসীম আস্থা। দূর দূর অঞ্চল থেকে ছেলেমেয়েদের সঁপে দিয়ে যায় কঠিন রোগ সারিয়ে তোলার জন্যে।'

নিস্তব্ধ হলঘর মথিত করে শোনা গেল দীর্ঘশ্বাসের শব্দ।

আঙুল মটকাতে লাগলেন প্রসিকিউটর। এক্সপার্টের কথাগুলো মোটেই তাঁর অনুকূল নয়।

ঝটিতি শুধোলেন—'আপনার কি মনে হয় এসব অপারেশনের পেছনে যুক্তির সমর্থন আছে ?'

এতক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলেন জজসাহেব। রাশভারী মানুষ, মাথার চুল ধবধবে সাদা। পাছে প্রসিকিউটরের প্রশ্নের হঁ্যা-বাচক উত্তর দিয়ে ফেলেন বিশেষজ্ঞ, তাই তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন—'বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের ব্যক্তিগত অভিমত শুনতে চায় না আদালত। প্রফেসর, ইক্‌থিয়ানডার সম্বন্ধে আপনার রিপোর্ট কি ?'

'ইক্‌থিয়ানডারের সারা গা আঁশে ঢাকা। মানুষের তৈরী আঁশ। নরম, নমনীয়, অথচ এত কঠিন, এত দুর্ভেদ্য, যে ছোরা মারলেও ফুটো হয় না। যে ধাতু দিয়ে এ আঁশ তৈরী হয়েছে, তার নাম আধুনিক বিজ্ঞান এখনো জানে না। তবে বিশ্লেষণ চলছে—ফলাফল এখনো হাতে আসেনি। সাঁতার কাটবার সময়ে একজোড়া গগল্‌স্ চোখে লাগাত ইক্‌থিয়ানডার। সাধারণ গগল্‌স্ নয়। কাঁচের জায়গায় লাগানো বিশেষ ধরনের ফ্লিণ্ট গ্লাস—প্রতিসরাঙ্ক অর্থাৎ ইনডেক্স অফ রিফ্র্যাকশন দুইয়ের কাছাকাছি। ফলে জলের নিচে স্পষ্ট দেখা যেত সব কিছু। গায়ের আঁশ তুলে ফেলার পর ইক্‌থিয়ানডারের পিঠে কাঁধের চ্যাটালো হাড়ের ঠিক নিচেই ডাইনে আর বাঁয়ে দুটো গর্ত দেখেছি। গোলাকার ফুটো, ব্যাস প্রায় চার ইঞ্চি। পাঁচটা সরু সরু ঝিল্লী-আবরণ দিয়ে ঢাকা প্রতিটি ফুটো। সব মিলিয়ে দেখতে হাঙরের কানকোর মত।'

বিস্ময়-গুঞ্জনে ভরে ওঠে হলঘর।

'আশ্চর্য হওয়ারই কথা। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। ইক্‌থিয়ানডারের যেমন মানুষের ফুসফুস আছে, তেমনি হাঙরের কানকোও আছে। তাই সে ডাঙায় বাস করতে পারে, জলেও থাকতে পারে।'

'উভচর ?' শ্লেষতীক্ষ্ম কণ্ঠ প্রসিকিউটরের।

'হঁ্যা, উভচর মানুষ।'

কিন্তু ইক্‌থিয়ানডার হাঙরের কানকো পেল কোত্থেকে ?' জানতে চাইলেন ধর্মাবতার।

দুহাত সামনে বিস্তার করে বললেন প্রফেসর স্টাইন, 'প্রফেসর স্যালভেটর ছাড়া এ হেঁয়ালীর উত্তর আর কেউ জানেন না। তা সত্ত্বেও আমাদের সকলের অভিমত সংক্ষেপে বলতে চেষ্টা করব। হেকেলের বায়োজেনেটিক ল অনুসারে হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের পূর্বপুরুষরা যে-যে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছেন, তার সংক্ষিপ্তসার মানুষের একজন্মেই দেখা যায়। ধাপে ধাপে মানুষ হয়েছে। কিন্তু দেহযন্ত্রের বিভিন্ন অবস্থার আর পরিবর্তনের মধ্যে হাজার হাজার বছরের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ছায়া স্পষ্ট দেখা যায়। তাই বিনা-দ্বিধায় বলা যায়, মানুষের অতিদূর পূর্বপুরুষ এক সময়ে কানকোর সাহায্যে নিঃশ্বেস নিত।'

প্রতিবাদ জানানোর জন্য চেয়ার ছেড়ে অর্ধেক উঠেই জজসাহেবের অঙ্গুলি হেলনে আবার ধপ করে বসে পড়লেন প্রসিকিউটর।

'কিছু কিছু ভ্রূণতত্ত্ব হাজির করছি যা বললাম তার সমর্থন হিসেবে। কুড়ি-দিনের মধ্যেই ভ্রৌণিক করোটিতে পর-পর চারটে সমান্তরাল আল দেখা যায়। আল চারটের বৈজ্ঞানিক নাম ভিসসিরাল আর্চ। কিন্তু এরপর থেকেই মানুষের ভ্রূণ যতই বড় হতে থাকে ততই তার এই ভাবী কানকোয় রূপান্তর ঘটে। প্রথম ভিসসিরাল আর্চটা অসিক্‌ল্‌স আর ইউসট্যাচিয়ান টিউবের সঙ্গে শ্রবণ নালিকা অর্থাৎ অ্যাকসটিক্ ডাক্টয়ে পর্যবসিত হয়; তলার অংশটা আমাদের নিচের চোয়ালের রূপ নেয়। দ্বিতীয় আর্চটা থায়রয়েড-বোন-য়ে রূপান্তরিত হয়। তৃতীয়টা শরীরের মধ্যে এবং থাইরয়েড কার্টিলেজের দুটো প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিশে যায়। এই হল স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ। ইক্‌থিয়ানডারের ক্ষেত্রে ডক্টর স্যাল-ভেটর যে এই ক্রমোন্নয়ন আটকে দিয়েছেন, আমাদের তা মনে হয় না—কেন না তা সম্ভব নয়। কিছু কিছু রেকর্ড কেসে অবশ্য দেখা গেছে, প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রেও কানকোর এই খাঁজ ক্রমবিকাশ সত্ত্বেও বন্ধ হয়নি। নিচের চোয়ালের ঠিক তলাতেই গলায় দেখা গেছে এই খাঁজ, বৈজ্ঞানিক ভাষায় আমরা তার নাম দিয়েই ব্রনকিয়াল ফিসটুলা। অবশ্য এ দিয়ে নিঃশ্বেস নেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। স্বাভাবিক ক্রমবিকাশে কোন বিঘ্ন দেখা গেলে অবশ্য মাছের মতই কানকো পূর্ণ রূপ নিত। সেক্ষেত্রে কানকোর বিনিময়ে হারাতে হত শ্রবণ যন্ত্র এবং অন্যান্য কয়েকটি দৈহিক বৈশিষ্ট্য। পরিণাম, ইক্‌থিয়ানডার মানুষ না হয়ে রাক্ষুসে আধা মাছ হয়ে যেত। কিন্তু তা তো হয়নি। ইক্‌থিয়ানডার আর পাঁচজন জোয়ানের মতই সুস্থ, সবল। দেহযন্ত্রও অটুট। শ্রবণ যন্ত্রের বিলোপ ঘটেনি, তলার চোয়াল এত সুন্দর বেড়েছে যে মুখশ্রী বৃদ্ধি পেয়েছে। ফুসফুসও কাজ করছে আমাদের মতই। এসব সত্ত্বেও পিঠে রয়েছে দুটো বাড়তি দেহযন্ত্র—যা মানুষের নেই—একজোড়া শক্তিশালী পরিণত কানকো। কানকো আর ফুসফুস কিভাবে কাজ করে দুইয়ের মধ্যে আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, তা আমরা জানি না। সম্পর্ক যদিও বা থাকে তাহলে কানকোর মধ্যে জলটা পৌঁছোয় কিভাবে? মুখ আর ফুসফুসের মধ্যে দিয়ে, না কানকোর ঠিক ওপরেই পিঠেতে যে ফুটো জোড়া আমরা দেখছি, তার মধ্যে দিয়ে? শবব্যবচ্ছেদ না করে এ রহস্যের উত্তর দিতে আমরা অপারগ। আবার বলছি, এ হেঁয়ালীর সমাধান জানতে হলে ডক্টর স্যালভেটরকে অনুরোধ না জানিয়ে উপায় নেই। একমাত্র প্রফেসর স্যালভেটরই বলতে পারেন, কুকুর-জাগুয়ার, অন্যান্য বিদঘুটে জানোয়ার আর ইক্‌থিয়ানডারের পশু-সংস্করণ উভচর বানরের সৃষ্টি রহস্যের আদিকাণ্ড।'

জজসাহেব জিজ্ঞেস করলেন 'আপনার মোটামুটি সিদ্ধান্ত তাহলে কি?'

প্রফেসর স্টাইন নিজেই খ্যাতনামা সার্জন। জজসাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিলেন

অপারাও সরলভাবে :

'সত্যি কথা বলতে কি এসবের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিনি। শুধু এইটুকুই বলতে পারি, প্রফেসর স্যালভেটর যা সৃষ্টি করেছেন, তা একমাত্র অসামান্য প্রতিভাধরের পক্ষেই সম্ভব। তবে একটা জিনিস খুবই স্পষ্ট। প্রফেসর তাঁর অপরিসীম দক্ষতা অর্জন করার পর ঠিক করেছিলেন, খুশীমত মানুষ আর জানোয়ারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পালটা-পালটি করে নতুন নতুন প্রাণী সৃষ্টি করবেন। অসম্ভব এই কল্পনাকেই সার্থক অপরেশনের মধ্যে দিয়ে রূপ দিয়েছেন। সাহসিকতায়, নৈপুণ্যে উনি অপ্রতিদ্বন্দী। তা সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হচ্ছি, ওঁর সমগ্র প্রচেষ্টাটাই আমার কাছে বিকৃত মস্তিষ্কের অসুস্থ ক্রিয়াকলাপ বলে মনে হয়েছে।'

এই পর্যন্ত শোনার পরেই অবজ্ঞার হাসি দুলে উঠল স্যালভেটরের অধর-প্রান্তে। উনি অবশ্য জানতেনও না যে বিশেষজ্ঞরা তাঁকে পাগল প্রতিপন্ন করে মামলা বানচাল করে দেওয়ার মতলব করেছেন।

স্যালভেটরের অবজ্ঞাসূচক হাসি লক্ষ্য করে ঝটিতি বললেন বক্তা—'আমরা সকলেই যে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তা আমি বলব না। এ রকম কোনো ধারণা সৃষ্টি করতে চাই না আমি। আমরা শুধু বলব, আসামীকে বিষেজ্ঞদের হাতে সঁপে দেওয়া হোক মেডিক্যাল এগজামিনেশনের জন্যে।'

জজসাহেব বললেন—'আদালত যথা সময়ে আপনার আবেদন বিবেচনা করবে। প্রফেসর স্যালভেটর, এক্সপার্ট আর প্রসিকিউটর যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করলেন, আপনি তার জবাব দিতে ইচ্ছুক?'

'হ্যাঁ, আমি ইচ্ছুক,' বললেন স্যালভেটর। 'এবং সেই জবাবই হবে আমার শেষ জবাব।'

## স্যালভেটরের জবাব

সিধে হয়ে দাঁড়ালেন স্যালভেটর।

হলশুদ্ধ প্রতিটি লোকের ওপর চোখ বুলোতে শুরু করলেন, কাকে যেন খুঁজছেন।

প্রথম সারিতেই বসে ছিলেন বিশপ। স্যালভেটরের সঞ্চরমাম দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হল তাঁর ওপর; বিচিত্র হাসি ছুঁয়ে গেল ঠোঁটের দুই প্রান্ত। এবার দৃষ্টি সরতে সরতে গিয়ে পড়ল পেছনের সারিতে। সেখানে বসে ক্রিষ্টো, বালতাসার আর জুরিটা। এরপর আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দর্শকমণ্ডলীর প্রত্যেককে দেখতে লাগলেন স্যালভেটর। কাউকে বাদ দিলেন না। তীব্র প্রত্যাশী দৃষ্টি মস্ত হলঘরের এ প্রান্ত থেকে সে প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে এল।

সবশেষে বললেন মন্থর ভারী কণ্ঠে—'যার ওপর আমি এত অত্যাচার করেছি, তাকে তো কই দেখছি না।'

'এই তো আমি!' তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বাজের মত হুংকার ছাড়ল বালতাসার। চোখ রক্তবর্ণ। মুখ আরক্ত। আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু তার আগেই পাশ থেকে এক হ্যাঁচকা টানে বসিয়ে দিলে ক্রিষ্টো।

জজসাহেব জিজ্ঞেস করলেন—'কার কথা বলছেন আপনি? বিদঘুটে জানোয়ারগুলোর কথা যদি বলেন তো শুনে রাখুন, কোর্ট তাদের এখানে আনতে অনিচ্ছুক। আর যদি মানুষ উভচরের কথা বলেন তো জেনে রাখুন, সে এই বাড়ীতেই আছে।'

'আমি ভগবানের কথা বলছি,' অত্যন্ত শান্ত, আন্তরিক কণ্ঠে বললেন স্যালভেটর।

শুনেই বেজায় চমকে উঠলেন জজসাহেব। ঈষৎ ঝুঁকে বসেছিলেন, কিন্তু কথা শুনেই এলিয়ে পড়লেন চেয়ারে। স্যালভেটর বলেন কি? নাকি, কারাবাস রদ করার মতলবে পাগলামির ভান করছেন?

'কি···কি বললেন?'

স্যালভেটর বললেন—'এই ব্যাপারটাই আগে আদালতে পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। মামলায় প্রধানত একজন মাত্র ব্যক্তির ওপরেই অকথ্য অত্যাচার করেছি আমি। কে সে? নিশ্চয় ভগবান। প্রসিকিউটরের সুকল্পিত বক্তৃতা অনুযায়ী আমি খোদার ওপর খোদকারী করেছি। তাঁর ঈশ্বরত্বকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি। খুশীমত ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন, তা দেখে খুশী হল না একজন ডাক্তার। সে বললে—'এ সৃষ্টি বাজে সৃষ্টি। একে নিখুঁত করা দরকার।' বলেই সে হাত দিলে সৃষ্টিকর্তার খেয়ালী সৃষ্টিকে খুঁতহীন করার কাজে।'

'ঘোর নাস্তিক! জঘন্য ঈশ্বরনিন্দা! মিঃ লর্ড, আসামীর প্রতিটি কথা হুবহু লিখে রাখা হোক,' এমন আর্তকণ্ঠে ককিয়ে উঠলেন প্রসিকিউটর যেন তাঁর মহান ধর্মবিশ্বাসে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছেন স্যালভেটর।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দু কাঁধ ঝাঁকালেন স্যালভেটর।

'কথাগুলো আমার নিজের নয়। এতক্ষণ যা শুনলাম, সংক্ষেপে তাই বলবার চেষ্টা করছি মাত্র। আমার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ ছিল বেআইনী কাটাছেঁড়া আর অঙ্গ বিকৃত করার অপরাধ। এখন দেখছি আরো একটা চার্জ খাড়া করার চেষ্টা চলছে আমার বিরুদ্ধে। এ চার্জ ধর্ম নষ্ট করার চার্জ। আমি শুধু অধার্মিক নয়, শয়তানের পূজারী। হাওয়াটা কোনদিক থেকে বইছে বলে মনে হয়? গির্জের দিক থেকে নয় তো?' বলে, সোজা বিশপের চোখে চোখ রাখলেন স্যালভেটর।

'বর্তমান মামলায় ভগবানকে ফরিয়াদি বানানোর জন্যে দায়ী আপনারাই। সেই সঙ্গে আসামী হিসাবে কাঠগড়ায় শুধু আমাকেই দাঁড় করাননি, করিয়েছেন

চার্লস ডারউইনকেও। হয়ত আমার কথায় অনেকেই আহত হয়েছেন এবং হবেন। তা সত্ত্বেও আমি আবার বলব, মানুষ আর জন্তুর দেহযন্ত্র নিখুঁত নয় এবং প্রচুর উন্নতি সাধন সম্ভব। প্রমাণ, মহামান্য বিশপ জুয়ান ডি গারসিলাসকো। আশা করি, এদিক দিয়ে আমাকে উনি সমর্থন জানাবেন।'

রীতিমত সাড়া পড়ে গেল কোর্টরুমে।

'১৯৫১ সালের কথা। ফ্রন্টে যাওয়ার ঠিক আগেই মান্যবর বিশপমশাই আমার কাছে এলেন সামান্য একটা অপারেশনের জন্য। অ্যাপেনডিক্স অপারেশন। অন্ত্রের এই ছোট্ট বাড়তি অংশটুকুর কোন কাজ নেই, কেবল বিস্তর ঝামেলা সৃষ্টি করা ছাড়া। বিশপের দেহযন্ত্রও ভগবানের প্রতিকৃতি অনুযায়ী সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর সৃষ্ট দেহযন্ত্রের আপেনডিক্সটুকু কেটে বাদ দেওয়ার সময়ে আমি যে চরম অধর্ম করেছিলাম, অপারেশন টেবিলে শুয়ে মান্যবর বিশপ তাঁর প্রতিবাদ জানাননি। এ কথা অস্বীকার করতে পারেন আপনি?' আবার বিশপের চোখে চোখ রেখে তীব্র কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন স্যালভেটর।

লাল হয়ে যায় জুয়ান ডি গারসিলাসকের সদা-পাণ্ডুর মুখ। কোলের ওপর রাখা মুষ্টিবদ্ধ আঙুলের নখ থেকে রক্ত উধাও হয়। পাথরের মত অনড় আড়ষ্ট-দেহ কয়েকবার সামান্য কেঁপে ওঠে।

'এ ছাড়াও আরো একটা দৃষ্টান্ত আছে। তখনও আমি প্র্যাকটিস ছাড়িনি। শ্রদ্ধেয় প্রসিকিউটর মশায়ের কি মনে আছে পুনর্যৌবন ফিরে পাওয়ার জন্যে আমার চেম্বারে তিনি মোট কবার ধর্ণা দিয়েছিলেন?'

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠেন প্রসিকিউটর। চোখ মুখ লাল করে প্রতিবাদ জানান। কিন্তু অট্টরোলে কিছুই শোনা যায় না।

গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বললেন ধর্মাবতার—'প্রফেসার স্যালভেটর, বিষয়ের বাইরে কোনো কথা না বলতে আপনাকে অনুরোধ করব।'

'এ অনুরোধটা যাঁরা মোকদ্দমা খাড়া করার চেষ্টা করছেন তাঁদেরকেই করা উচিত ছিল। এই নোংরা প্যাঁচের জন্য দায়ী তাঁরাই। মুস্কিল হচ্ছে কি, আমরা মানুষেরা, যে আসলে মাছ আর বাঁদর—এই সহজ কথাটাই অনেকে মেনে নিতে চান না। কানকোর আর্চগুলো চোয়াল আর শ্রবণযন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে বলেই তো মানুষ বলে নিজেদের পরিচয় দিই। আসলে আমরা মাছ আর বাঁদর—অথবা তাদের বংশধর।' চেয়ারে উসখুস করছিলেন প্রসিকিউটর। তর্জনী হেলনে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন স্যালভেটর—'ছটফট করবেন না। বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে লেকচার দেওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।' একটু থেমে আবার শুরু করেন—'মানুষের মধ্যে গলদটা কোথায় জানেন? জন্তু থেকেই মানুষের উৎপত্তি। কিন্তু এখনো আমরা জন্তুই রয়ে গেছি। সেই রকমই ক্রূর, নির্মম, নিরেট। ভ্রূণ সম্পর্কে প্রফেসর স্টাইন মূল্যবান বক্তৃতা শুনিয়ে আপনাদের বিলক্ষণ ঘাবড়ে দিয়েছেন। না দিলেও পারতেন। কেন না, ভ্রূণ নিয়ে আমি

কোনো দিন মাথাঘামাইনি। ভ্রূণের ওপর খবরদারিও করিনি। আমি সার্জন, সার্জনের ছুরীই আমার একমাত্র যন্ত্র। বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ এখানে ওখানে জুড়ে দেওয়াও সার্জারীর অঙ্গ। তবে সেই পদ্ধতিরই উন্নতি সাধন করার জন্যে জন্তু-জানোয়ার নিয়ে আমি এক্সপেরিমেণ্ট শুরু করি। আমার চরম লক্ষ্য ছিল মানুষের রোগগ্রস্ত দেহযন্ত্র আর হাত-পা ফেলে দিয়ে তার জায়গায় নতুন যন্ত্র, নতুন হাত-পা বসানো।

'অপারেশনের পর জন্তুগুলোকে ল্যাবোরেটরীর মধ্যে রাখতাম পর্যবেক্ষণের জন্য। নতুন পরিবেশে ওদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতাম। তারপর ছেড়ে দিতাম বাগানে। চিড়িয়াখানা তৈরী হয়েছে এমনি ভাবেই। দূরতম দুই প্রজাতির মধ্যে সমন্বয় সাধনের দিকেই বেশী ঝোঁক ছিল আমার। যেমন, মাছ আর স্তন্যপায়ী। এই দুইয়ের মধ্যেই টিশু আর দেহযন্ত্র পালটাপালটি করতাম। এদিক দিয়ে আমার সাফল্য সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদের কল্পনারও অতীত। আমি যা করতে পেরেছি, এঁদের মতে তা অসম্ভব। কিন্তু সত্যিই কি তাই? আমার বিশ্বাস, আমার একার হাতে আজ যা সম্ভব হয়েছে, আগামীকাল বহু সার্জনের পক্ষেই তা ছেলেখেলা হয়ে দাঁড়াবে। জার্মান সার্জন Sauerbruch-এর সর্বশেষ অপারেশনের বৃত্তান্ত প্রফেসর স্টাইন নিশ্চয় জানেন। ইনি ঊরুর খারাপ হাড় সরিয়ে সেখানে জঙ্ঘার হাড় বসিয়ে রুগীকে নতুন জীবন দিয়েছেন।'

প্রফেসর স্টাইন জিজ্ঞেস করলেন—'খবরটা আমি জানি। কিন্তু ইক্‌থিয়ানডারের ব্যাপারটা কি, তা বলুন।'

'ইক্‌থিয়ানডার! ইক্‌থিয়ানডার আমার গর্ব! ইক্‌থিয়ানডার আমার শ্রেষ্ঠ কীর্তি! ওকে নিয়ে অবশ্য খুব খাটতে হয়নি। শরীরের দরকারী যন্ত্রগুলোও পালটানোর প্রয়োজন হয়নি। গোটা ছয়েক বাঁদর মারা যাবার পর মানুষের ওপর এক্সপেরিমেণ্ট করার মত আত্মবিশ্বাস পাই আমি। শিশু ইক্‌থিয়ানডারের ওপর ছুরী ধরি তখন।'

'কি অপারেশন করেছিলেন?' জানতে চাইলেন জজসাহেব।

'একটা খোকা-হাঙরের কানকো কেটে এনে শিশু ইক্‌থিয়ানডারের শরীরে বসিয়ে দিয়েছিলাম। ফলে, হাঙরেরর মত সে জলে রাজত্ব করেছে। মানুষের মত ডাঙায় থেকেছে।'

বিস্ময়ের ঝড় বয়ে গেল ঘরময়। কয়েকজন সাংবাদিক ঊর্ধ্বশ্বাসে বাইরে দৌড়োলো সম্পাদকদের টেলিফোন করে খবরটা জানিয়ে দেওয়ার জন্যে।

'এর পরের অপারেশনগুলোয় অবশ্য আমার পদ্ধতির আরো উন্নতি সাধন ঘটেছে। যেমন উভচর বাঁদর। যতক্ষণ খুশী সে জলের মধ্যে থাকতে পারে, ডাঙাতেও থাকতে পারে। এ ক্ষমতা কিন্তু ইক্‌থিয়ানডারের নেই। একটানা তিন চার দিনের বেশী সে ডাঙায় থাকতে পারে না। ফুসফুসের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। কানকো শুকিয়ে যায়। প্রথম লক্ষণ দেখা যায়, পাঁজরের অসহ্য

যন্ত্রণায়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ইক্‌থিয়ানডার নিজের ওপর যথেষ্ট অত্যাচার করেছে। দিনের পর দিন ডাঙায় থেকেছে। ফলে, ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। উভচর ইক্‌থিয়ানডার আস্তে আস্তে মাছ-মানুষ হয়ে যাচ্ছে। শরীরের এখন যা অবস্থা, দিনের অধিকাংশ সময় জলের মধ্যে না কাটিয়ে ও পারে না।'

জজসাহেবের অনুমতি নিয়ে প্রসিকিউটর জিজ্ঞেস করলেন—'উভচর মানুষ সৃষ্টির আইডিয়া আপনার মাথায় কেন এল, আর কি উদ্দেশ্য একাজে হাত দিলেন, তা কি বলবেন?'

'নিশ্চয় বলব। যে আইডিয়ায় চিরটা কাল আমি উত্যক্ত হয়েছি, যে আইডিয়া সম্পর্কে আপনারা বিচার নামক বিরাট প্রহসনের আয়োজন করেছেন—সেই আইডিয়াই আমাকে নামিয়েছে এই উদ্ভট কাজে। আইডিয়া সেই একই—মানুষ নিখুঁত নয়। বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানুষ যত না পেয়েছে তার চেয়ে বেশী হারিয়েছে। এদিক দিয়ে বেশী লাভবান জন্তুরা। জলে থাকলে মানুষের কত লাভ, তা কি ভেবেছেন কখনো? লাভ ছেড়ে ক্ষতি যখন নেই, তখন মানুষ কেন জলে থাকবে না বলতে পারেন? বিবর্তনবাদ পড়ে আমরা জেনেছি, ডাঙার প্রাণীরা জল থেকেই এসেছে। তাদের মধ্যে কিছু ডাঙ্গাতেই থেকে গেছে; যেমন মানুষ। কিছু জলে ফিরে গেছে; যেমন, ডলফিন। ডলফিন আদিতে ছিল মাছ। ডাঙায় এসে হল স্তন্যপায়ী। আবার ফিরে গেল জলে—কিন্তু স্তন্যপায়ীই রয়ে গেল। তিমিও এই শ্রেণীর জলচর প্রাণী। দুজনেই নিঃশ্বেস নেয় ফুসফুস দিয়ে। ইচ্ছে করলে ডলফিনকেও উভচর প্রাণী করা যায়। ঠিক এই কথাই ইক্‌থিয়ানডার আমাকে বারবার বলেছে। তার এক ডলফিন বন্ধু নাকি জলের মধ্যে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না—আমি যেন তাকে সে ক্ষমতা দিই। এ অপারেশনেরও তোড়জোড় করেছিলাম আমি। ইক্‌থিয়ানডার—মানুষের মধ্যে প্রথম মাছ। ডলফিন—মাছের মধ্যে প্রথম মানুষ। ইক্‌থিয়ানডারের একাকীত্ব ঘোচাবার জন্যেই এ আয়োজন করেছিলাম।

'অন্যান্য মানুষরাও যদি ইক্‌থিয়ানডারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, সমাজের অনেক সমস্যাই তাহলে মিটে যায়। রত্নগর্ভা প্রবল পরাক্রান্ত সমুদ্র তখন হার মানবে মানুষের প্রতাপের কাছে। সাগরের শক্তি, সাগরের সম্পদ যে কি বিপুল, তার সামান্য দৃষ্টান্ত আমি দিচ্ছি। পৃথিবীর চারভাগের তিন ভাগ জল। বাকী একভাগে থাকে মানুষ—তাও শুধু ডাঙার ওপর। কিন্তু জলের মধ্যে স্তরে স্তরে মানুষ থাকতে পারবে। কোটি কোটি মানুষের মাথা গোঁজবার সমস্যা মিটবে; খাবার আর কাঁচা মাল মজুদ থাকবে হাতের কাছেই।

'তারপরেই আসুন সমুদ্রের সঞ্চিত শক্তির প্রশ্নে। সবাই জানেন, ৭৯০০ কোটি হর্সপাওয়ারের সমান সৌরশক্তি সাগরের জলই শুষে নেয়! কিন্তু বাতাস গরম হওয়ার ফলে আর অন্যান্য অপচয়ের ফলে টগবগ করে ফুটে বাষ্পাকারে

উধাও হতে পারে না সাগরের জল। সীমাহীন শক্তির এই ভাঁড়ারকে কি কাজে লাগিয়েছি আমরা? বলতে গেল কিছুতে না।

'সমুদ্র স্রোতের শক্তি নিয়েই বা কি করেছি? গালফ্‌স্ট্রীম আর ফ্লোরিডা কারেন্টে ঘণ্টায় ৯১০০ কোটি টন জল বইছে। যে কোনো বড়সড় নদীর ৩০০০ গুণ। এর সঙ্গে অন্যান্য সমুদ্র স্রোতের শক্তি জুড়ুন। কি কাজে লাগিয়েছি বিপুল এই শক্তিকে? উত্তর সেই একই—কিস্‌সু না।

'সমুদ্রের ঢেউ আর জোয়ার ভাঁটা নিয়েও কি কখনো মাথা ঘামিয়েছি? জানেন কি এক একটা ঢেউয়ে প্রতি বর্গফুটে আঘাত হানবার ক্ষমতা সাড়ে তিন টন ওজনের সমান, উঁচুতে ওঠার ক্ষমতা ১২৪ ফুট পর্যন্ত, ওঠবার সময়ে হাজার টন পর্যন্ত ওজনের পাথরও অক্লেশে তুলে নিতে পারে প্রতিটি ঢেউ? জানেন কি সবচেয়ে উঁচু জোয়ারের জল পঞ্চান্ন ফুট পর্যন্ত পেঁৗছোতে পারে? নিখরচায় এই অফুরন্ত শক্তিকে মানুষ কোনো কাজে লাগাতে পেরেছি কি? আবার সেই একই উত্তর—কিছু না।

'ডাঙার ওপরে মানুষ বেশী উঁচুতে উঠতে পারে না, বেশী নিচে নামতে পারে না। কিন্তু জলের মধ্যে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, ঢেউয়ের মাথা থেকে সমুদ্রের তলা পর্যন্ত অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারবে মানুষ।

'অনন্ত অপরিমিত এই সম্পদকে কোনো কাজেই লাগাতে পারিনি আমরা। আমরা মাছ ধরি—তাও অল্প জল থেকে। গভীর জলে যেতে ভয় পাই। স্পঞ্জ তুলি, প্রবাল সংগ্রহ করি, মুক্তো লুঠ করি—এছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারি না।

'জলের মধ্যে আমাদের তৎপরতা যৎসামান্য। বাঁধ আর ব্রীজ তৈরীর সময় থাম গাঁথা, ডুবে যাওয়া জাহাজকে আবার ভাসিয়ে তোলা ছাড়া আর কি করতে পেরেছি আমরা? এই সামান্য কাজেও ঝুঁকি নিতে হয়। অনেক মেহনৎ করতে হয়, এমন কি প্রাণহানিও ঘটে। দু'মিনিটের বেশী জলের নিচে থাকলে যে প্রাণীর প্রাণবিয়োগ ঘটে, এর চাইতে বেশি কিছু তার কাছ থেকে আশাও করা যায় না।

'কিন্তু মানুষ যদি জলের মধ্যে শহর গড়ে তোলে, তখন পৃথিবীর চেহারাই পালটে যাবে। ডুবুরী পোশাক না পরে, অক্সিজেনের সিলিণ্ডার সংগে না নিয়েই অনির্দিষ্টকাল জলে বাস করে ভোগে লাগাতে পারবে সাগরের অপরিমেয় সম্পদকে। কি নেই সাগরে? মূল্যবান খনিজ সম্পদে বোঝাই সমুদ্রতল। একটা ঘটনা বলি। জানি তা শুনে এখানকার অনেকেই লোভে পাগল হয়ে যাবেন, তবুও বলি। ইক্‌থিয়ানডার প্রায়ই সমুদ্রতল থেকে কুড়িয়ে পাওয়া দুষ্প্রাপ্য ধাতুর নমুনা দেখাত আমায়। সাগরের তলায় খনির মালিক হওয়ার কথা কি কেউ স্বপ্নেও ভেবেছেন?

'এছাড়াও আছে জাহাজডুবির ধনরত্ন। ১৯১৫ সালে আইরিশ উপকূলে তলিয়ে যাওয়া 'লুসিটানিয়া'র উদাহরণই যথেষ্ট। জার্মান সাবমেরিন শোচনীয়-ভাবে ডুবিয়ে দিয়েছিল 'লুসিটানিয়া'কে। সেই সঙ্গে প্রাণ হারিয়েছিল দেড়

হাজার যাত্রী। তলিয়ে গেছিল ১৫ কোটি ডলার মূল্যের স্বর্ণমুদ্রা আর ৫ কোটি ডলার মূল্যের সোনার বাট। ( বিস্ময় ধ্বনি )। এছাড়াও আমস্টারডামে নামিয়ে দেওয়ার জন্যে দুটো পেটিকা ভর্তি হীরেও ছিল জাহাজের স্ট্রংরুমে। অবশ্য ইক্থিয়ানডারের পক্ষেও এত নিচে নামা সম্ভব নয়। এজন্যে সৃষ্টি করতে হবে নতুন উভচর—গভীর জলের মাছের মতই যে প্রচণ্ড চাপ সহ্য করতে পারবে ( প্রসিকিউটরের ঘৃণাসূচক নাসিকাধ্বনি )। কাজটা মোটেই কঠিন নয়, অসম্ভব নয়। শুধু যা একটু সময় দরকার।'

'কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে পরমপিতার ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছেন,' মন্তব্য করলেন প্রসিকিউটর।

কর্ণপাত না করে বলে চললেন স্যালভেটর ঃ

'মানুষ সমুদ্রের মধ্যে বাস করা আরম্ভ করলে, সমুদ্র লুটিয়ে পড়বে মানুষের পায়ের তলায়। এত জীবনহানি, এত ধনরত্ন নিখোঁজ হওয়াও বন্ধ হয়ে যাবে। সমুদ্র আর বিভীষিকা থাকবে না, সমুদ্র হবে লোভনীয় নয়া দুনিয়া—ধনরত্ন, খাদ্য, বাসস্থান যেখানে অফুরন্ত।'

প্রফেসরের দরাজ কণ্ঠের বাগ্মিতায় নতুন সেই দুনিয়ার ছবি ভেসে ওঠে সবার মানসপটে। সমুদ্র বিজয়ের রঙীন কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় উপস্থিত সকলের অন্তর। বিরোধীপক্ষও মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যান কিছুক্ষণের জন্যে। মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন জজসাহেবও।

জিজ্ঞেস করেন অভিভূত কণ্ঠে—'তাই যদি হয়, এক্সপেরিমেণ্টের ফলাফল ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেননি কেন ?'

'এত তাড়াতাড়ি কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর ইচ্ছে ছিল না বলেই ও পথ মাড়াইনি,' মৃদু হেসে বললেন স্যালভেটর। 'তাছাড়া আরও একটা ভয় ছিল। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আমার এই আবিষ্কার ভালর চাইতে মন্দই করত বেশী। ইক্থিয়ানডারকে নিয়েই তো টানা হ্যাঁচড়া শুরু হয়ে গেছে। আমার বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছে কে ? জুরিটা—যে ইক্থিয়ানডারকে দিয়ে সাগর লুঠ করে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হতে চেয়েছিল, যার এত সাধের স্বপ্ন বাদ সেধে আঙুলের ফাঁক দিয়ে পালিয়েছে ইক্থিয়ানডার—শুধু প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্য সে আমার গোপন গবেষণার খবর ফাঁস করে আমাকে কাঠগড়ায় তুলেছে। শুধু জুরিটা কেন, সৈন্যবাহিনীর খপ্পরে পড়লেও রেহাই পাবে না ইক্থিয়ানডার। ট্রেনিং নিতে হবে কি করে ডোবাতে হয় যুদ্ধজাহাজ। না, যে সমাজে লোভ আর দ্বন্দ্ব মানুষকে পশুর পর্যায়ে নিয়ে গেছে, যে সমাজে বৃহত্তম আবিষ্কারও মানুষে মানুষে হানাহানি বৃদ্ধি করেছে, ভালর চাইতে মন্দই বেশী করেছে, স্বার্থান্ধ সেই সমাজে জনগণের হাতে ছেড়ে দিতে চাই না আমার আজকের ইক্থিয়ানডারকে, আমার ভবিষ্যৎ ইক্থিয়ানডারদের। ভেবেছিলাম—'

অকস্মাৎ থেমে গেলেন স্যালভেটর। আবার যখন মুখ খুললেন, তখন

কণ্ঠে নেই আর সেই উত্তাপ, সেই জ্বালা। একেবার যেন অন্য মানুষ। মৃদু হেসে এক্সপার্টদের দিকে তাকিয়ে বললেন সংযত কণ্ঠে—'না, এর বেশী আর কিছু বলব না। যা বলতে যাচ্ছিলাম তা বললে হয়ত আবার আমাকে পাগল অ্যাখ্যা পেতে হবে। প্রতিভার রাংতা দিয়ে মুড়ে দিলেও এ খেতাবে আমার প্রবল আপত্তি। আমি উন্মাদ নই, বাতুল নেই, ছিটগ্রস্ত নই। আমি যা করব বলে মনে করেছি, তা করেছি। আমার কাজ আপনারা দেখেছেন। দেখেশুনে যদি এই সিদ্ধাতে আসেন যে আমি যা করেছি তা গুরুতর অপরাধ, আমি ক্রিমিন্যাল, তাহলে আইনানুগ পথেই আমার বিচার করুন, শাস্তি দিন। শাস্তি লাঘব করার জন্যে দরবার আমি করব না।'

## বন্দীশালায়

আদালতের নির্দেশে ইক্‌থিয়ানডারের মানসিক সামর্থ্য পরীক্ষা করতে গিয়ে মহা ফাঁপরে পড়লেন বিশেষজ্ঞরা। ছোট ছোট প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হিমসিম খেয়ে গেল ইক্‌থিয়ানডার। এমন কি সাল, মাস, দিন সম্পর্কেও তার অজ্ঞতা দেখে তাজ্জব হয়ে গেলেন জাঁদরেল এক্সপার্টরা। কি সাল? জানি না। কোন মাস? জানি না। কি বার? জানি না।

তা সত্ত্বেও, ইক্‌থিয়ানডার যে মনের দিক দিয়ে পিছিয়ে আছে, একথা বলতে ভরসা পেলেন না এক্সপার্টরা। এটুকু তাঁরা বুঝেছিলেন যে মাছ-মানুষের এই আশ্চর্য অজ্ঞতার মূল কারণই হল অস্বাভাবিক পরিবেশে মানুষ হওয়া। লোকালয় থেকে বহু দূরে বিশাল সমুদ্রে বড় হয়েছে মাছেদের সঙ্গে—এক্ষেত্রে জ্ঞানের পরিধি সীমিত হতে বাধ্য। কাজেই অনেক ভেবেচিন্তে এক্সপার্টরা একবাক্যে রায় দিলেন, 'কৃতকর্মের জন্য দায়ী নয়।' ফলে, আইনের ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেল ইক্‌থিয়ানডার। মামলা ফেঁসে যেতেই উপযুক্ত অভিভাবকের হাতে তাকে সঁপে দেওয়ার প্রস্তাব উঠল। তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এল দুজন। জুরিটা আর বালতাসার।

স্যালভেটরের অনুমানই ঠিক। যত নষ্টের মূল জুরিটাই। স্রেফ প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্যেই পুলিশকে খবর দিয়েছে সে। এই গেল ষড়যন্ত্রের প্রথম পর্ব। তার মূল অভিসন্ধি ইক্‌থিয়ানডারকে আবার হাতের মুঠোয় আনা। অভিভাবকত্ব লাভ করলেই সে উদ্দেশ্য সফল হয়। তাই অফিসারদের ডজন খানেক মুক্তো ঘুস দিয়ে হাত করে ফেলেছে। এখন শুধু ফলাফলের অপেক্ষা।

বালতাসার পিতৃত্বের দাবী করেছে। কিন্তু হালে পানি পাচ্ছে না। কারণ, দাবীদারের একমাত্র সাক্ষী তার নিজের ভাই। তার ওপর ঐ সামান্য জরুল চিহ্নের ভিত্তিতে এমন গুরুত্বপূর্ণ দাবী ধোপে টেকে না।

তলে তলে যে কি খেলা চলছে, লারা তার বিন্দুবিসর্গ জানত না। ছেলে চুরী গেছে, সুতরাং ফরিয়াদি হিসেবে স্যালভেটরের বিচারে বালতাসারের

প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ইক্‌থিয়ানডারের অভিভাবক হিসেবে সে দাঁড়ালে আইন আর চার্চের স্বার্থহানি ঘটে।

ক্রিস্টো এখন বালতাসারের কাছেই থাকে। ভাইকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছে বেচারী। দিনরাত শূন্য দৃষ্টি মেলে চুপটি করে বসে থাকে বালতাসার। খাওয়া দাওয়ার হুঁশ থাকে না। তার পরেই হঠাৎ হয়ত তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, 'খোকা! খোকা!' বলে দৌড়োতে থাকে ঘরময়। সেই সঙ্গে শুরু হয় স্প্যানিশ গালাগাল।

একদিন ঠিকই এই ধরনের খেঁচুনির পর বালতাসার বললে ক্রিস্টোকে— 'আমি জেলখানায় যাচ্ছি। আমার সব চাইতে ভাল মুক্তো দিয়ে বশ করব জেলারদের। তাহলেই দেখা হবে খোকার সঙ্গে। ওকে বুঝিয়ে দেব আমিই ওর বাবা। ছেলে বাপকে চিনবে না মানে? চিনতেই হবে। চিনিয়ে ছাড়বো আমি!'

বৃথাই নিবৃত্ত করার চেষ্টা করল ক্রিস্টো। বালতাসার অটল।

জেলখানায় গিয়ে কাউকে মুক্তো ঘুস দিয়ে, কারোর পায়ে কেঁদে পড়ে অবশেষে ইক্‌থিয়ানডারের সেলে পেঁছোলো বালতাসার।

লোহার গরাদ ঢাকা ছোট্ট একটা ফোকরের সামান্য আলোয় চোখ চলে না ঘরে। যেমনি গুমোট, তেমনি দুর্গন্ধ। ইক্‌থিয়ানডারের ভুক্তাবশিষ্ট মাছের নাড়িভুঁড়িগুলোও সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন মনে করত না জেলাররা। ট্যাংকের জলও পালটাতো না।

ট্যাংকের পাশে গিয়ে দাঁড়াল বালতাসার। কালো আয়নার মত চকচক করছে জলের উপরিভাগ।

'ইক্‌থিয়ানডার।' কোমলস্বরে ডাকে বালতাসার। আবার—'ইক্‌থিয়ানডার।' কিন্তু জলের ওপরে সামান্য কম্পন ছাড়া আর কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। আস্তে আস্তে জলের মধ্যে হাত ডোবায় বালতাসার। কাঁধে আঙুল ঠেকে। সঙ্গে সঙ্গে ট্যাংকের ওপর উঠে আসে ইক্‌থিয়ানডারের মাথা আর দুই কাঁধ।

'কে তুমি? কি চাও?'

নতজানু হয়ে বসে পড়ে দুহাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে দ্রুতকণ্ঠে বলে বালতাসার ঃ

'ইক্‌থিয়ানডার! আমি তোর বাবা! তোর সত্যিকারের বাবা! স্যাল-ভেটর তোর দুশমন। সে-ই তোর এই হাল করেছে। ইক্‌থিয়ানডার, বাবা ইক্‌থিয়ানডার ভাল করে তাকা, দ্যাখ তোর বাবাকে দ্যাখ।'

'তোমাকে চিনি না আমি,' কঠিন কণ্ঠ ইক্‌থিয়ানডারের।

'ইক্‌থিয়াডার, আবার দ্যাখ,' বলেই আচমকা ইক্‌থিয়ানডারের মাথা নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয় সারা মুখ; আর সে কি কান্না!

অপ্রত্যাশিত এই আদরের ধাক্কা সহ্য হয় না ইক্‌থিয়ানডারের। জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে গিয়ে খানিকটা জল ছলকে পড়ে মেঝের ওপর। হঠাৎ পেছন থেকে একটা লৌহ মুষ্টি বালতাসারের কলার খামচে ধরে এবং একটানে শূন্যে তুলে নিয়ে আছড়ে ফেলে দেয় ঘরের কোণে। মাথা ঘুরে যায় বালতাসারের।

সম্বিৎ ফিরে পেয়েই চোখে পড়ে জুরিটাকে। নাকের ওপর ডানহাতের মুঠো নাড়তে নাড়তে বাঁ হাতে এক তা কাগজ তুলে ধরে বলে যুদ্ধ জেতার উল্লাসে—'দেখেছো? অভিভাবকত্বের আদেশ। ছেলে খুঁজতে হয় অন্য জায়গায় যাও। কাল থেকে ইক্‌থিয়ানডার আমার হেপাজতেই থাকবে। মাথায় ঢুকেছে?'

কাৎ হয়ে মেঝের ওপর পড়েছিল বালতাসার। সেই অবস্থাতেই ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে ওঠে মুখ; তারপরেই আচম্বিতে বুনো বেড়ালের মত ফ্যাঁস করে লাফিয়ে ওঠে, একটানে কাগজটা মুখে পুরে দিয়ে দমাদম কিল চড় ঘুসি মারতে থাকে স্প্যানিয়ার্ড জুরিটাকে।

পাল্টা মার শুরু করে জুরিটা।

দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁত খুঁটতে লাগল দুই জেলার। এ সময়ে নিরপেক্ষ থাকাই ভাল। কারণ, দুপক্ষ থেকে ঘুস নিতে হয়েছে। কাজেই পক্ষপাতিত্ব করা চলে না।

মারতে মারতে এবার বালতাসারের গলা টিপে ধরে জুরিটা। বুড়ো মরে যায় দেখে টনক নড়ে জেলারদের।

'হেই, হচ্ছে কি, মরে যাবে যে!'

জুরিটা তখন রাগে অন্ধ। সমানে টুঁটি পিষতে থাকে দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসে বালতাসারের।

ঠিক এই সময়ে শোনা যায় একটা অতি পরিচিত কণ্ঠ।

'গার্জেন মশাইয়ের ওপর কি নতুন ডিউটি দেয়া হল? চমৎকার।'

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছো কি? এই কি ডিউটি দেওয়া হচ্ছে?' কড়া-গলায় জেলার দুজনকে এমনভাবে ধমকে ওঠেন স্যালভেটর যেন তিনিই জেলের গভর্ণর।

কিন্তু কাজ হয়। বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে দুজনকে ছাড়িয়ে দেয় জেলাররা। চেঁচামেচি শুনে ছুটে আসে আরো জেলার।

হাজতবাস করেও ব্যক্তিত্ব হারাননি স্যালভেটর। জজসাহেবের রায় তাঁর বিপক্ষে যাবে জেনেও এতটুকু টলেননি, হুকুম দেওয়ার মত কণ্ঠের তীব্রতা আর মনের ক্ষমতাও লোপ পায় নি।

ইস্পাত কঠিন কণ্ঠে বলেন—'নিয়ে যাও এদের। আমাকে একা থাকতে দাও। ইক্‌থিয়ানডারের সঙ্গে আমার কথা আছে।'

তৎক্ষণাৎ সুবোধ বালকের মত হুকুম তামিল করে জেলাররা। সোচ্চার

আপত্তি সত্ত্বেও জুরিটা আর বালতাসারকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় দরজা।

বুটের শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর ট্যাংকের পাশে এসে দাঁড়ান স্যালভেটর।

জল থেকে সবে মুখ বাড়িয়েছিল ইক্‌থিয়ানডার।

স্যালভেটর বললেন—'ইক্‌থিয়ানডার, বাইরে এস। শরীরের অবস্থাটা দেখি।'

তৎক্ষণাৎ ট্যাংকের বাইরে এসে দাঁড়ায় ইক্‌থিয়ানডার।

'আলোর কাছে এস। ঠিক কাছে। জোরে নিঃশ্বাস নাও···ছাড়ো··· নাও···ছাড়ো। আরও জোরে···বুক ভরে। আর একবার। থামো। ঠিক আছে,' বুকের ওপর টোকা মারেন স্যালভেটর। কান পেতে শোনেন শ্বাস-প্রশ্বাসের অনিয়মিত ছন্দ।

'নিঃশ্বেস নিতে কষ্ট হচ্ছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, বাবা,' বলে ইকথিয়ানডার।

এ অবস্থার জন্যে দায়ী তুমি নিজে। একটানা এতদিন ডাঙায় থাকা উচিত হয়নি তোমার?'

নত মস্তকে শোনে ইক্‌থিয়ানডার। কি যেন ভাবে। পরক্ষণেই হঠাৎ মাথা তুলে স্যালভেটরের চোখে চোখে তাকিয়ে বলে:

'কেন, বাবা কেন? সবাই ডাঙায় থাকে, কিন্তু আমি থাকতে পারি না কেন?'

প্রকাশ্য আদালতে চোখা চোখা প্রশ্নের উত্তর দিতে বিচলিত হননি স্যালভেটর—কিন্তু ইক্‌থিয়ানডারের সেই অপলক সবল চাহনির প্রচ্ছন্ন ভর্ৎসনা তাঁকে বিচলিত করে তুলল। কিন্তু চোখ থেকে চোখ সরালেন না স্যালভেটর।

বললেন মৃদু কণ্ঠে—'কারণ, তোমার যা আছে, তা আর কারো নেই, জলের মধ্যে বাস করার ক্ষমতা পৃথিবীতে শুধু তোমারই আছে, ইক্‌থিয়ানডার। জল আর ডাঙা—এই দুইয়ের মধ্যে যদি তোমাকে বাছতে বলা হয়, বলো দিকি তুমি কোন দিকে যাবে? জলে, না, ডাঙায়—কোথায় থাকতে চাইবে?'

'কি করে বলি?' বিড়বিড় করে ইক্‌থিয়ানডার। সমুদ্রে সে মানুষ। সমুদ্র তার কাছে নিঃসন্দেহে প্রিয়। কিন্তু ডাঙায় থাকে গুটিয়েরে—তাই ডাঙাও তার কাছে সমান প্রিয়। তবে গুটিয়েরেকে আর পাওয়া যাবে না। বৃথা তার আশা।

মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চিন্তা করে ইকথিয়ানডার। তারপর মুখ তুলে বলে—'সমুদ্র।'

'সমুদ্র ছাড়া আর তোমার গতিও নেই, ইক্‌থিয়ানডার। আমার অবাধ্য হয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই সারা জীবনের জন্যে সমুদ্রকে বেছে নিয়েছ তুমি। এত অত্যাচার করেছ নিজের শরীরের ওপর যে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। এখন সমুদ্রেই তুমি বাঁচবে, ডাঙায় নয়।'

'আমি সমুদ্রেই ফিরে যেতে চাই, বাবা। এ ট্যাংকের মধ্যে থাকলে আমি

নির্ঘাৎ মরে যাবে। উঃ, কি কষ্ট! কবে সমুদ্রে যাবো, বাবা?'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেন স্যালভেটর—'আমার যথাসাধ্য আমি করব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমুদ্রে যাতে তুমি ফিরে যাও, সে ব্যবস্থা নিশ্চয় করব। যদ্দিন তা না হচ্ছে, মুখে চাবী এঁটে রেখো। কেমন?'

বলে, ইক্‌থিয়ানডারের কাঁধ চাপড়ে আশ্বাস দেন স্যালভেটর। ধীর পদে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যান সেলের বাইরে।

নিজের সেলে ফিরে এসে গুম হয়ে টুলে বসে থাকেন ডক্টর স্যালভেটর। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতই ধ্যানস্থ হয়ে। বৃশ্চিক দংশনের মত একটা মাত্র চিন্তা অস্থির করে তোলে তাঁর মনকে।

ব্যর্থতার জ্বালা যে কি, তা আর পাঁচজন সার্জনের মত স্যালভেটরও অন্তরে অন্তরে বোঝেন। আজ তাঁর দেশ জোড়া খ্যাতি। কিন্তু তার আগে কত মানুষ প্রাণ দিয়েছে তাঁর অপারেশন টেবিলে তবেই না আজ এত নামডাক। জনাবারো মরেছে, কিন্তু তারই ফলে বেঁচে গেছে হাজার হাজার জীবন। তাই এই জনা-বারোর স্মৃতি কোন দিনই তিক্ত করতে পারেনি স্যালভেটরের অন্তরকে। নগণ্য সংখ্যক মানুষ মরেছে, সেই অনুপাতে অগণিত মানুষ বেঁচে গেছে। তাই এ নিয়ে কোনোদিনই মাথা ঘামাননি স্যালভেটর।

কিন্তু ইক্‌থিয়ানডারের কেস তো তা নয়। ইক্‌থিয়ানডার তাঁর বিশেষ গর্ব। সারা জীবনে যত সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে ইক্‌থিয়ানডারকে ভালবেসেছেন সব চাইতে বেশী, বেসেছেন নিজের ছেলের মতই। এতগুলি বছর আপন পুত্রের মতই লালন-পালন করেছেন তাকে। তাই তো বিছের কামড়ের মতই এক চিন্তা কুরে কুরে খেতে থাকে তাঁর মনকে। ইক্‌থিয়ানডারের বর্তমান অবস্থা আর তার ভবিষ্যৎ দুই-ই সমান শোচনীয়। ডাঙার আনন্দ থেকে তাকে বঞ্চিত হতে হবে চিরকালের মত।

কে যেন টোকা মারে দরজায়।

'ভেতরে আসুন।'

'অসুবিধে করলাম না তো?' ভেতর ঢুকতে ঢুকতে ফিসফিস করে বললেন জেল-গভর্ণর।

'মোটেই না,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন স্যালভেটর। 'আপনার স্ত্রী আর বাচ্চা কি রকম আছে?'

'খুব ভাল। অজস্র ধন্যবাদ প্রফেসর। ওদের অ্যান্ডিজে পাঠিয়ে দিলাম শ্বশুরবাড়ীতে।'

'বেশ করেছেন। পাহাড়ী হাওয়াই ওদের এখন দরকার।'

দরজার দিকে চকিত চাহনি নিক্ষেপ করে স্যালভেটরের গা ঘেঁসে দাঁড়ালেন গভর্ণর।

'প্রফেসর,' গাঢ় কণ্ঠে, স্বর আরো খাদে নামিয়ে বললেন—'ওদের প্রাণে

বাঁচিয়েছেন আপনি। আপনার ঋণ আমি—'

'ধন্যবাদের কোন দরকার নেই। আমার কর্তব্য আমি করেছি।'

'তা ঠিক। তবুও আপনার উপকার আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না। চিরকালই জানব, আপনার কাছে আমি ঋণী। আমি বেশী লেখাপড়া শিখিনি। কিন্তু কাগজ পড়ে জেনেছি ডক্টর স্যালভেটর সাধারণ মানুষ নন। চোর-ডাকাতের সঙ্গে জেলে থাকবার জন্যে তিনি জগতে আসেননি।'

মৃদু হেসে বললেন স্যালভেটর—'যদ্দুর শুনেছি আমি, আপনার বিজ্ঞ সহকর্মীরা আমাকে পাগলা-গারদে সরিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করছে।'

'পাগলা-গারদ জেলেরই নামান্তর। তফাতের মধ্যে সেখানে চোর ছ্যাঁচোড়ের বদলে গাদাখানেক পাগলের সঙ্গে আপনাকে থাকতে হবে। না। তা হবে না। হতে পারে না।' কণ্ঠস্বর আরো নামিয়ে বললেন গভর্ণর—'প্রফেসর, শুধু স্বাস্থ্যের জন্যেই বউকে পাহাড়ে পাঠাই নি। আমার মতলব শুনুন। জেল থেকে আপনাকে পালাতে সাহায্য করব আমি। তারপর নিজেও সরে পড়ব। এ চাকরি আমি ঘেন্না করি। যথেষ্ট হয়েছে, আর না। আপনাকে দম ছেড়ে পালাতে হবে। এছাড়াও আরো একটা কথা বলতে চাই আপনাকে,' একটু ইতস্তত করে—'একটা সরকারী গোপন খবর, স্টেট সিক্রেট আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি—'

'তার দরকার নেই। যা গোপন, তা গোপনেই থাকুক,' বাধা দিয়ে বললেন স্যালভেটর।

'না, না, তা হতে পারে না। সর্বনাশ হয়ে যাবে। আপনাকে শুনতেই হবে। ভয়ংকর অর্ডার এসেছে আমার ওপর। না মরা পর্যন্ত বিবেকের দংশন আমাকে সহ্য করতে হবে। আপনার কাছে আমি ঋণী। সরকারের কাছে নয়। তা সত্ত্বেও ওরা আমাকে দিয়ে একটা জঘন্য অপরাধ করিয়ে নিতে চায়।'

'তাই নাকি?'

'যতই ঘুস খাক, ইক্‌থিয়ানডারকে বালতাসার বা জুরিটা কারোর হাতেই দেবে না ওপরওলা। ইক্‌থিয়ানডারকে···ইক্‌থিয়ানডারকে খুন করা হবে।'

ঈষৎ চমকে উঠলেন স্যালভেটর।

'বটে? তারপর!'

'খুন করা হবে ইক্‌থিয়ানডারকে। বিশপ আগাগোড়া তাই ঠিক করে রেখেছিলেন। মুখে বলেননি। বিষ পাঠিয়ে দিয়েছে আমাকে। পটাসিয়াম সায়ানাইড। আজ রাত্রে ইক্‌থিয়ানডারের ট্যাঙ্কে মিশিয়ে দেব আমি। জেলের ডাক্তারও আছে ষড়যন্ত্রের মধ্যে। সে ডেথ সার্টিফিকেট দেবে এই বলে যে, ইক্‌থিয়ানডারকে উভচর মানুষ বানাতে গিয়ে আপনি যে অপারেশন করেছিলেন, তার ফলেই মারা গেল বেচারী। বিষ যদি আমি না মেশাই, কপালে আমার দুর্গতি আছে। চাকরীর খাতিরে ওরা আমাকে দিয়ে যা খুশি করিয়ে নিতে

পারে। কিন্তু চাকরী ছেড়ে দিলে কারোর ধার ধারি না আমি। তাই মনস্থির করে ফেলেছি। আমি পালাবো—ইক্‌থিয়ানডারকে আমি খুন করব না। এত অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের দুজনকেই রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শুধু আপনাকে জেলের বাইরে নিয়ে যেতে পারি। আপনার জীবন অমূল্য। আপনি বেঁচে থাকলে অনেক ইক্‌থিয়ানডার হবে। কিন্তু আপনি মারা গেলে দুনিয়ার কারো সাধ্য নেই, আর একজন স্যালভেটর সৃষ্টি করে।'

এগিয়ে এলেন ডক্টর স্যালভেটর। দুহাতে গভর্ণরের হাত তুলে নিয়ে বললেন—'ধন্যবাদ। শুধু আমার জন্যে আপনাকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চাই না আমি—'

'বিপদ কিছু নেই। সমস্ত ভেবে রেখেছি আমি।'

'এক মিনিট। আমার নিজের জন্যে আপনার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে রাজী নই—। ইক্‌থিয়ানডারকে যদি আপনি বাঁচাতে পারেন, জানবেন প্রাণ-রক্ষার চাতেও বড় কাজ আপনি করলেন। আমার স্বাস্থ্য ভালই। দু-চার জন বন্ধু-বান্ধব জোগাড় করে শীগগিরই জেল থেকে আমি বেরিয়ে পড়তে পারব। কিন্তু ইক্‌থিয়ানডারকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে এক্ষুনি। আপনার বিবেক আছে। আর সেই কারণেই ইক্‌থিয়ানডারকে আপনাকে বাঁচাতে হবেই।'

'বেশ, আপনি যা ইচ্ছা করেন, তাই হবে।'

গভর্ণর চলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ সেলের মধ্যে পায়চারী করলেন স্যালভেটর। তারপর টেবিলের সামনে গিয়ে এক তা কাগজে খসখস করে কি লিখলেন।

লেখা শেষ হলে উঠে গিয়ে কয়েকবার টোকা মারলেন দরজায়। হেঁকে বললেন—'কে আছো, গভর্ণরকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বল। জরুরী।'

গভর্ণর আসতেই বললেন স্যালভেটর—'আপনার কাছে আর কিছুই চাই না আমি। আজ রাত্রে, শেষবারের মত, ইক্‌থিয়ানডারের সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দিতে পারেন?'

'নিশ্চয়। জেলের যেখানে খুশী আপনি যেতে পারেন।'

'চমৎকার। আর একটা জিনিস।'

'বলুন। যা বলবেন তাই করব।'

'ইক্‌থিয়ানডারকে জেলের বাইরে নিয়ে গিয়ে আমার অশেষ উপকার আপনি করবেন—'

'কিন্তু, প্রফেসর, আপনিও আমার জন্যে কম করেন নি।'

'বেশ, তাহলে দুজনেরই ঋণ শোধ হয়ে গেল,' বাধা দিয়ে বললেন স্যালভেটর। 'এখন আপনার ফ্যামিলিকে আমি সাহায্য করতে চাই। এই চিরকুটটা রাখুন। শুধু একটা ঠিকানা লেখা আছে—তলায় স্যালভেটরের বদলে শুধু 'S' লিখে সই করেছি। যদি কোনদিন আশ্রয় বা অর্থের প্রয়োজন হয়, এই ঠিকানায় যাবেন। এঁকে আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।'

'কিন্তু—'

'কোনো কিন্তু নয়। এবার ইক্‌থিয়ানডারের কাছে নিয়ে চলুন।'

একই রাতে দ্বিতীয়বার স্যালভেটরকে ফিরে আসতে দেখে অবাক হয়ে গেল ইক্‌থিয়ানডার। আরও অবাক হল প্রফেসরের বিষাদ চাহনি দেখে। বাবার চোখে এরকম চাহনি কোনো দিন দেখেনি ইক্‌থিয়ানডার।

স্যালভেটর বললেন—'বাবা ইক্‌থিয়ানডার, মন দিয়ে আমার কথা শোন। খুবই তাড়াতাড়ি ছাড়াছাড়ি হচ্ছে আমাদের—যা ভেবেছিলাম, তার চাইতেও তাড়াতাড়ি। হয়ত বহুদিন আর দেখা হবে না। আজ রাতেই ছাড়া পাচ্ছ তুমি। তবুও তোমাকে নিয়েই আমার যত উদ্বেগ। এখানে থাকলে জুরিটা, আর না হয় ঐরকমই কোনো মানুষ-পশুর গোলাম হয়ে থাকতে হবে তোমাকে—'

'কিন্তু আপনার কি হবে, বাবা?'

'আমার সাজা হবে। খুব জোর বছর খানেক, কি বছর দুয়েক জেলে পচতে হবে। কিন্তু তার মধ্যেই তোমাকে পেঁছে যেতে হবে অনেক দূরের একটা অত্যন্ত নিরাপদ জায়গায়। জায়গাটা দক্ষিণ আমেরিকা পেরিয়ে, প্রশান্ত মহাসাগরে লো আর্চিপিলাগো দ্বীপপুঞ্জের একটা দ্বীপে। এ দ্বীপপুঞ্জের আর এক নাম টুয়ামোটু। টুয়ামোটুতে পেঁছোতে তোমাকে অনেক বেগ পেতে হবে। দ্বীপটা খুঁজে বার করতে কালঘাম ছুটে যাবে। কিন্তু এখানে, এই রাও ডি লা প্লাটাতে শত্রুদের ফাঁদে এত কষ্ট পাওয়ার চাইতে তা ভাল।

'এবার রাস্তার কথা বলি। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর বা দক্ষিণ দিক দিয়ে যেতে পারো। দুটো পথেরই সুবিধে যেমন আছে, অসুবিধেও আছে। উত্তরে পথটা একটু লম্বা। তাছাড়া, বিপজ্জনক পানামা খালের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। হয় লক গেটে-ধরা পড়বে, আর না হয় জাহাজের তলায় থেঁতলে মারা যাবে। খালটা সরু, গভীরতাও তেমন বেশী নয়। চওড়ায় খুব জোর ৫০০ ফুট। গভীরতা ৪৫ ফুট। কাজেই সমুদ্রে চলা বড় জাহাজের তলা ঠেকে যাওয়ার উপক্রম হয় খালের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে।

'সুবিধের মধ্যে, উষ্ণ জল পাবে। তা ছাড়াও, পানামা খাল থেকে তিনটে বড় বড় জাহাজ চলার পথ আছে। দুটো যায় নিউজিল্যান্ডে। তৃতীয়টা ফিজি দ্বীপপুঞ্জে এবং তারও ওদিকে। নিউজিল্যাণ্ডগামী যে কোনো জাহাজ ধরে বা সেই পথে সাঁতার কেটে গন্তব্য স্থানে সহজেই পেঁছে যাবে। শুধু একটু উত্তর দিকে উঠলেই হল।

'দক্ষিণের পথটা ছোট বটে, কিন্তু জল বড় ঠাণ্ডা। কেপহর্ণের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে তো বরফ স্রোতের মধ্যে সাঁতার কাটতে হবে। ম্যাজেলান প্রণালীর মধ্যে দিয়ে যাবার চেষ্টা কর না, মারা পড়বে। ভয়ানক ঝড় সেখানে। অনেক জাহাজডুবি হয়েছে, এখনও হয়, বিশেষ করে পশ্চিমদিকের ডুবো পাহাড় ভর্তি অঞ্চলটা তো দারুণ বিপজ্জনক। ঝড়ো হাওয়ায় তুমি হয় পাহাড়ে আছড়ে

মরবে আর না হয় ঘূর্ণিপাকে পড়বে।

'কাজেই বাকী থাকে কেপহর্ণ। রাস্তা লম্বা হলেও অনেক নিরাপদ, জল এখানে ঠাণ্ডা। কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমার সয়ে যাবে, স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে। এ অঞ্চলে খাবারেরও অভাব হবে না।

'পানামা খাল থেকে টুয়ামোটু আর্চিপিলাগো বার করতে তোমার কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু কেপহর্ণ থেকে বেশ বেগ পেতে হবে। জাহাজ চলবার তেমন কোন রুটও নেই—থাকলেও ন'মাসে ছ'মাসে এক-আধটা চলে। কাজেই নিজের পথ নিজে চিনতে হবে। কেবলমাত্র তোমার ব্যবহারের জন্যেই যে যন্ত্রপাতিগুলো তৈরী করেছিলাম, তার সাহায্যেই সূর্যকে ঠিক রেখে পেঁছে যাবে। যন্ত্রপাতিগুলো অবশ্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে—'

'লীডিংকে সঙ্গে নেবো, বাবা। সব বোঝাই ও বয়ে নিয়ে যাবে। ওকে ছেড়ে যেতে পারব না। আমাকে ছাড়া ও থাকতে পারবে না।'

মৃদু হেসে স্যালভেটর বললেন—'কে যে কাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না, তা বোঝাই যাচ্ছে। যাক, একটা ঝামেলা মিটল। টুয়ামোটু-দ্বীপপুঞ্জে পেঁছোনোর পর খোঁজ করবে—একটা নির্জন দ্বীপের চারধারে প্রবাল পাহাড়ের মালা। দূরে থেকেই দেখতে পাবে একটা লম্বা মাস্তুলের মাথায় মস্ত কাঠের মাছ হাওয়ার গতির দিকে মুখ করে রয়েছে। চিনতে ভুল হবে না তোমার। পেঁছোতে দু তিন মাস লাগবে বটে, কিন্তু ঘাবড়িও না। জল সেখানে উষ্ণ, শুক্তিও প্রচুর।'

ইক্‌থিয়ানডারকে স্যালভেটর শিখিয়েছিলেন কথার মাঝে কথা না বলে কিভাবে প্রতিটি শব্দ শুনতে হয় এবং মনে রাখতে হয়। কিন্তু সেদিন বাধা না দিয়ে পারল না ইক্‌থিয়ানডার। জিজ্ঞেস করল—'কিন্তু দ্বীপে কি আছে ?'

'বন্ধু। সত্যিকারের বন্ধু। যারা তোমাকে ভালবাসে অন্তরের সঙ্গে, সমস্ত বিপদ আপদ থেকে আড়াল করে রাখবে আপনজনের মতই। আর্মাণ্ড ভিলিবয় থাকে সে দ্বীপে। আর্মাণ্ড আমার পুরোনো বন্ধু। নামকরা সমুদ্রবিদ সে। জাতে ফরাসী। অনেক বছর আগে ইউরোপে থাকার সময় বন্ধুত্ব হয় আমাদের। আর্মাণ্ডের মত মানুষ হাজারে মেলে না। দু দিনেই তোমাকে আপন করে নেবে। তারপর তার মুখেই শুনো কেন লোকালয় ছেড়ে প্রশান্ত মহাসাগরের এই নির্জন দ্বীপে আস্তানা নিয়েছে সে। রোমাঞ্চকর সেই কাহিনী বলবার সময় এখন নেই। দ্বীপটা সমুদ্রের মধ্যে একলা হলেও, আর্মাণ্ড একলা থাকে না। সঙ্গে আছে তার স্ত্রী আর দুই ছেলে মেয়ে। আর্মাণ্ডের মতই দরাজ। যন্দূর মনে হয়, ছেলের বয়স এখন ২৫, মেয়ে জন্মেছে ঐ দ্বীপেই, বয়স আন্দাজ ১৭।

'তারা তোমার সব কথাই জানে। আমার চিঠিপত্র থেকেই জেনেছে। তাই বলছিলাম আর্মাণ্ড তোমাকে নিজের ফ্যামিলিতেই টেনে নেবে। অবশ্য বেশীর ভাগ সময় জলে থাকতে হবে তোমাকে। দিনের মধ্যে কয়েক ঘণ্টার

জন্যে থাকবে ডাঙায়। কিন্তু আস্তে আস্তে স্বাস্থ্য ভাল হয়ে উঠলেই আমার বিশ্বাস জলে আর ডাঙায় সমান সময় কাটাতে পারবে।'

'আর্মাণ্ড ভিলিবয়কে বাবার মতই মান্য করবে। তার মূল্যবান বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অনেক কাজে লাগবে তুমি। সমুদ্র সম্বন্ধে তুমি একা যা জানো, এক ডজন হোমরাচোমরা প্রফেসরও তা জানে না।' কথার ধারে প্রচ্ছন্ন শ্লেষ ছড়িয়ে বলে চলেন স্যালভেটর। 'মাথামোটা এক্সপার্টরা রুটিন মাফিক তোমাকে যা জিজ্ঞেস করেছে, তা তোমার এখতিয়ারের বাইরে, ওদের ঘটে যদি কিছু বুদ্ধি থাকত, তাহলে জিজ্ঞেস করত রায়ো ডি প্লাটার জলস্রোত, জলের তাপমাত্রা, আর লবণ মাত্রা কি? এই ধরনের কিছু প্রশ্নের উত্তরেই ইয়া মোটা একখানা খাঁটি বিজ্ঞানের বই লেখা হয়ে যেত। আর্মাণ্ড ভিলিবয়ের মত তীক্ষ্ণধী বৈজ্ঞানিকের তত্ত্বাবধানে তোমার সমুদ্র অভিযান, অভিজ্ঞতা আর সমুদ্র তথ্য নিয়ে বই লেখা হলে বৈজ্ঞানিক মহলে যে কি সাড়া পড়ে যাবে, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি আর আর্মাণ্ড ভিলিবয় দুজনে মিলে সমুদ্র বিজ্ঞানকে যতখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, দুনিয়ার সেরা বিজ্ঞানীরাও গতানুগতিক পন্থায় অনেক বছরেও তা পারবে না। অমূল্য তথ্যপূর্ণ সেই কেতাবের প্রচ্ছদে আর্মাণ্ড ভিলিবয়ের নামের পাশেই থাকবে তোমার নাম। আর্মাণ্ড নিজেই তোমার নাম দেওয়ার জন্যে জিদ ধরে—ও যে কি ধাতু দিয়ে তৈরী তা তো আমি জানি। এখানে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তোমাকে। কয়েকজন মূর্খ নীচ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে ক্রীতদাস বানিয়ে রাখবে তোমাকে। আর সেখানে তুমি বিজ্ঞানের সেবা করবে। বিজ্ঞানের সেবা মানেই সমগ্র মানবজাতির সেবা। পাবে স্বাধীনতা। স্বাস্থ্য। প্রবাল ঘেরা টলটলে জলে পাবে সব কিছু, যা তোমার কাম্য। পাবে আর্মাণ্ড ভিলিবয়ের মত অকৃত্রিম বন্ধু। পাবে সুখ, স্বর্গ।

'আর একটা কথা। সমুদ্রে নেমেই সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে আজ রাতেই তুমি বাড়ীতে যাবে, একটুও দেরী করবে না। জিম ছাড়া ওখানে আর কেউ নেই। সমুদ্রে দিকনির্ণয়ের যন্ত্রপাতি, ছুরী আর বাকী যা কিছু নেবার নিয়েই আবার সমুদ্রে বেরিয়ে পড়বে, যত রাতই হোক না কেন, ভোরের জন্য অপেক্ষা না করে যাত্রা শুরু করবে।

'বিদায়, ইক্‌থিয়ানডার, বিদায়।'

ইক্‌থিয়ানডারকে বুকে জড়িয়ে চুমু খেলেন স্যালভেটর—যা তিনি এর আগে কখনো করেন নি। তারপর মৃদু হেসে ইক্‌থিয়ানডারের কাঁধ চাপড়ে বললেন—'ভেব না, তুমি পেঁছোবেই।'

সেল থেকে বেরিয়ে গেলেন ডক্টর স্যালভেটর।

## পলায়ন

কারখানায় সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর সবে খেতে বসেছে ওলসেন, এমন সময়ে টোকা পড়ল দরজায়।

মেজাজ খিঁচড়ে যায় ওলসেনের। টেবিল থেকে না উঠেই হেঁকে ওঠে—'কে ?'

নিঃশব্দে খুলে যায় পাল্লা। ভেতরে ঢোকে গুটিয়েরে। আনন্দে বিস্ময়ে জ্যামুক্ত ধনুকের মত চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে ওলসেন—'গুটিয়েরে! তুমি।'

'ভাল আছ তো ? খাওয়াটা সেরে নাও, আমার জন্যে ভেব না,' বলে, দরজা ভেজিয়ে পাল্লার ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়ায় গুটিয়েরে। 'স্বামী আর শ্বাশুড়ির সঙ্গে আর থাকতে পারলাম না। এত বড় স্পর্ধা জুরিটার, আমার গায়ে হাত তোলে, তাই আমি চলে এসেছি, জন্মের মত চলে এসেছি, জুরিটার ঘরে আর নয়।

খবরটা এমনি আকস্মিক যে শূন্য পথেই হাত স্তব্ধ হয়ে যায় ওলসেনের।

'বলো কি ? আশাতীত সংবাদ। আরে বসো, বসো। ঠেস দিয়েও দেখছি টলছ। কিন্তু সেই যে সেই কি বলছিলে, ভগবান যখন মিলিয়ে দিয়েছেন, তখন আর ছাড়াছাড়ি হবে না—সে সবের কি হল ? গোল্লায় গেছে ? আপদ গেছে ! বাবার কাছেই ফিরে এলে তাহলে ?'

'বাবা কিছুই জানে না, জুরিটা তো আগে বাবার কাছে খুঁজতে আসবে, তাই আমি এলাম বন্ধুর কাছে থাকতে।'

'প্ল্যান কি ?'

'চাকরী, তোমার কারখানায় লাগিয়ে দিতে পারবে ?'

মাথা নাড়তে নাড়তে ওলসেন বললে—'মুস্কিল, বেজায় মুস্কিল। তাহলেও চেষ্টা করব।' একটু থেমে—'কিন্তু তোমার স্বামী কিভাবে নেবে ?'

'ওর ধার ধারি না।'

'কিন্তু সে ধারে,' মৃদু হেসে বললে ওলসেন। 'ও তোমার পিছু নেবেই। ঠিক খুঁজে বার করবে। ভুলে যেও না এখনও আর্জেন্টাইনে রয়েছ। পুলিশ আর পাবলিক সমর্থন করবে জুরিটাকে।'

ক্ষণেক চিন্তা করে দৃঢ় কণ্ঠে বললে গুটিয়েরে—'করুক না। আমি কানাডায় চলে যাবো। না হয় আলাস্কায়।'

'গ্রীণল্যাণ্ডে, উত্তর মেরুতে !' সুরে সুর মিলিয়ে তড়বড় করে বলে গেল ওলসেন। 'কোথায় যাওয়া যাবে, সে না হয় পরে ভাবা যাবে। এখানে তুমি নিরাপদ নও। আমি নিজেই চলে যাবো ভাবছি। সেবার যদি এক সঙ্গে পালান যেত ! কিন্তু জুরিটা তোমাকে গায়েব করে নিয়ে গেল। জমানো টাকাও খরচ হয়েছে, এখন গাড়ী ভাড়াও নেই, তাহলেও নিরাপদ জায়গায় না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ছাড়ছি না তোমাকে। জলযাত্রা নিরাপদ হবে না। অত টাকাও নেই। সীমান্ত

পেরিয়ে যদি প্যারাগুয়ে, কি ব্রেজিলে ঢুকে পড়তে পারি, জুরিটা আমাদের টিকিও ধরতে পারবে না। তারপর সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্র কি ইউরোপের পাথেয় জোগাড় করা খুব কঠিন হবে না। শুনেছ, ডক্টর স্যালভেটর এখন জেলে? ইক্‌থিয়ানডারও রয়েছে সেখানে?'

'ইক্‌থিয়ানডার জেলে? আবার ধরা পড়ল বেচারী? কিন্তু জেলে কেন? আমার সঙ্গে দেখা হবে না?' একরাশ প্রশ্ন বৃষ্টি করে গুটিয়েরে।

'ইক্‌থিয়ানডার এখন জেলে। জুরিটাকে তার অভিভাবক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। কল্পনাও করতে পারবে না কি রকম জটিল দাঁড়িয়েছে স্যালভেটর কেস।'

'কী ভয়ানক! কোন রকমেই বাঁচানো যাবে না ওকে?'

'অনেক চেষ্টা করেছি আমি, কিন্তু পারিনি। তারপরেই হঠাৎ একজন শক্তিমান দোসর বেরিয়ে পড়েছে। স্বয়ং জেল-গভর্ণর হাত মিলিয়েছে। আজ রাতেই ইক্‌থিয়ানডারকে জেলের বাইরে পাচার করে দিচ্ছি দুজনে! এই মাত্র দুটো চিরকুট পেলাম। একটা স্যালভেটরের কাছ থেকে। আর একটা জেল-গভর্ণরের কাছ থেকে।'

'ইক্‌থিয়ানডারকে দেখতে চাই আমি! তোমার সঙ্গে যাবো?'

তক্ষুনি কোন জবাব দেয় না ওলসেন। ভাবে।

একটু পরে বলে—'আমার মনে হয়, না। শুধু তাই নয়, ইক্‌থিয়ানডারের সঙ্গে তোমার ইহজন্মের মত দেখা হওয়া উচিত নয়।'

'কেন?'

'ইক্‌থিয়ানডার অসুস্থ। মানুষের মতও বলতে পার, মাছের মতও বলতে পার—শরীরের অবস্থা ভীষণ খরাপ।'

'বুঝলাম না।'

'মানুষের মত ডাঙার বাতাসে আর নিঃশ্বেস নিতে পারে না ইক্‌থিয়ানডার। তোমাকে দেখলেই তার পরিণামটা কল্পনা করবার চেষ্টা কর। একবার দেখলেই বারবার দেখতে চাইবে তোমাকে। কিন্তু ডাঙায় বারবার তাকে নিয়ে আসা মানেই জেনে শুনে বেচারাকে হত্যা করা।'

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে গুটিয়েরে। অনেকক্ষণ পরে বলে—'তুমি ঠিকই বলেছ, আমার মনে হয়—'

'ইক্‌থিয়ানডার আর লোকালয়ের মধ্যে এখন মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সমুদ্র। সমুদ্র ছাড়া বাঁচবার আর কোন পথ খোলা নেই ইক্‌থিয়ানডারের সামনে। এই তার ললাট লিখন।'

'কিন্তু সমুদ্রে সে থাকবে কি করে? মানে, সমুদ্রের অত জন্তু জানোয়ারের মধ্যে একা মানুষ—'

'তোমার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত ওদের সঙ্গেই সুখে দিন কাটাচ্ছিল ইক্‌-

থিয়ানডার।'

মুখ আরক্ত হয়ে উঠে গ্যুটিয়েরের।

ওলসেন বলে—'অবশ্য আগের মত সুখী হতে পারবে না ইক্‌থিয়ানডার।'

'দোহাই তোমার, আর না!' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে গ্যুটিয়েরে।

'সময় সব ক্ষতই সারিয়ে তোলে। একদিন হয়ত আবার হারানো মনের শান্তি ফিরে পাবে ইক্‌থিয়ানডার। সমুদ্রের জন্তু জানোয়ারের মধ্যেই বুড়ো বয়স পর্যন্ত হেসেখেলে বেড়াবে। তারপর কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে হাঙরের কামড়ে প্রাণ যাবে……কিন্তু মরণ তো ডাঙাতেও আছে, তাই না?'

বাইরে তখন গোধূলির ম্লান আভা। ঘরের মধ্যে আঁধার।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে ওলসেন বললে—'এবার আমি চলি।' গ্যুটিয়েরে ব্যাকুল কণ্ঠে বললে—'দূর থেকে কি একবার তাকে দেখতে পারি না?'

'তা পারো। কিন্তু কাছে আসতে পারবে না।'

'কথা দিচ্ছি।'

চারদিক যখন বেশ অন্ধকার, জেলখানার ফটক পেরলো ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ী। গাড়ীর ওপর বিরাট পিপে, চালকের ছদ্মবেশে ওলসেন রাশ টেনে ধরল প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রহরীর সামনে।

জেল-গভর্ণর শিখিয়ে দিয়েছিল কি বলতে হবে। তোতাপাখীর মত মুখস্থ বলে গেল ওলসেন—'শয়তানের জন্য সমুদ্রের জল।'

জেলখানার আজব কয়েদী 'সমুদ্র-শয়তান' যে সমুদ্রের জল ছাড়া থাকতে পারে না, প্রহরী তা জানত। কলের জলে নাকি সে খাবি খায়। সমুদ্রের জল বওয়া গাড়ী এর আগেও বিস্তর দেখেছে প্রহরী। কাজেই বিনাবাক্যব্যয়ে পথ ছেড়ে দিলো।

সোজা জেলখানা ঘুরে রান্নাঘরের সামনে দিয়ে যে দরজা দিয়ে জেলের কর্মচারীরা যাতায়াত করে, তার সামনে এসে দাঁড়াল ওলসেন। পাহারাদারদের নানা অছিলায় এদিকে ওদিকে সরিয়ে দিয়েছিল গভর্ণর। পথ পরিষ্কার। গাড়ী এসে দাঁড়াতেই ইক্‌থিয়ানডারকে প্রাঙ্গণে নিয়ে এল গভর্ণর।

'চটপট, পিপের মধ্যে ঢুকে বসো।'

সময় নষ্ট করল না ইক্‌থিয়ানডার।

'চালাও।'

লাগামের ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা প্রাঙ্গণ পেরিয়ে ফটকের বাইরে চলে এল ওলসেন। তারপর ঢিমেতালে এগিয়ে চলল সমুদ্রের দিকে।

দেখা গেল, বেশ খানিকটা দূরে থেকে গাড়ীর পিছু পিছু আসছে একজন তরুণী—।

শহর পেরিয়ে সমুদ্রের কিনারায় এসে গাড়ী দাঁড় করাল ওলসেন, কালির মত অন্ধকারে জোনাকির মত জ্বলছে সমুদ্রের ফেণা। ঝড়ো হাওয়ার যেন অশরীরীর

ফিসফিসানি ।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ইঙ্গিত করতেই একটা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল গুটিয়েরে ।

পিপের ওপর টোকা মেরে অনুচ্চকণ্ঠে ডাকল ওলসেন, 'ইক্‌থিয়ানডার ! ইক্‌থিয়ানডার ! বেরিয়ে এস ।'

জলের ওপর জেগে উঠল ইক্‌থিয়ানডারের সিক্ত মাথা । পরক্ষণেই হাতের ভরে পিপে টপকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল পথের ওপর । নিঃশ্বাস তার দ্রুত এবং কষ্টকর ।

ভিজে হাতে ওলসেনের হাত চেপে ধরে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললে—'ধন্যবাদ, ওলসেন, অনেক ধন্যবাদ ।'

'বিদায়, ইক্‌থিয়ানডার ! সাবধানে থেকো । তীরের খুব কাছে সাঁতার দিও না । লোকজন দেখলেই দূরে সরে যেও । নইলে আবার জেলে ঢুকতে হবে, খুব হুঁশিয়ার ।'

স্যালভেটর ইক্‌থিয়ানডারকে কি নির্দেশ দিয়েছেন, ওলসেনও তা জানত না ।

হাপরের মত হাঁপাতে হাঁপাতে বললে ইক্‌থিয়ানডার—'নিশ্চয়, নিশ্চয়, অনেক ···অনেক দূরে সাঁতার কেটে যাবো আমি । যাবো সে-ই প্রবাল দ্বীপে···যেখানে শুধু শান্তি···যেখানে নেই জাহাজের আনাগোনা । অনেক ধ্যনবাদ, ওলসেন ।' বলে দৌড়ে জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ায় ইক্‌থিয়ানডার ।

ঢেউয়ের মধ্যে পা ডুবিয়েই পেছন ফেরে ।

'ওলসেন ! গুটিয়েরের সঙ্গে যদি কখনও দেখা হয়, তাকে আমার ভালবাসা দিও ! বলো, সারা জীবন তাকে আমি মনে রাখব ।'

পরক্ষণেই—'বিদায়, গুটিয়েরে ।' বলেই ঝাঁপ দিলে জলে ।

'বিদায়, ইক্‌থিয়াডার···' ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ভেসে গেল গুটিয়েরের অশ্রু-অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর ।

হু-হু করে দমকা বাতাসে ঈষৎ নুয়ে পড়ে বালুকাবেলায় দুটি মূর্তি । ওলসেন পাথরের মত নিশ্চল । গুটিয়েরের চক্ষু সজল । মাতাল হাওয়া গুঙিয়ে ওঠে । গুমরে উঠে দুরন্ত ঢেউ আছড়ে পড়ে পায়ের ওপর ।

সস্নেহে গুটিয়েরের একটা হাত মুঠির মধ্যে তুলে নিয়ে মৃদু কোমল কণ্ঠে বলে ওলসেন—'গুটিয়েরে, চলো, ফেরা যাক ।'

পায়ে পায়ে দুজনে উঠে আসে রাস্তার ওপর । শেষবারের মত কালো সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে নিয়ে ওলসেনের হাতে হাত রেখে গাড়ীতে এসে ওঠে গুটিয়েরে ।

কারাবাসের মেয়াদ ফুরোলে বাড়ী ফিরে এলেন ডক্টর স্যালভেটর । কিছুদিন গবেষণা নিয়ে মেতে রইলেন । বর্তমানে তিনি বহু দূর পথে যাত্রার জন্যে তৈরী

হচ্ছেন।

ক্রিষ্টো এখনো কাজে বহাল রয়েছে।

জুরিটা একটা নতুন পালতোলা জাহাজ কিনেছে। ক্যালিফোর্ণিয়ার উপসাগরে গেছে মুক্তোর খোঁজে। আমেরিকার সেরা ধনী হতে পারেনি সে। সেজন্য খুব একটা খেদও নেই। গোঁফের ডগা তার ব্যারোমিটারের কাঁটার মত এখনও সুদিনের প্রতীক্ষা করছে।

গুটিয়েরে স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছে। বিয়ে করেছে ওলসেনকে। নিউইয়র্কের একটা ক্যানারীতে কাজ করে দুজনে।

রায়ো ডি লা প্লাটার জাহাজের ডেকে সমুদ্র-দানব এখন বিস্মৃতপ্রায়। মাঝে মাঝে গুমোট রাতে সমুদ্র থেকে যখনি কোন অপার্থিব শব্দ ভেসে আসে, বুড়ো জেলেরা ডেকে বলে—'শোন্ রে, ঠিক এমনি ভাবে শাঁখ বাজাতো সমুদ্র-দানব।' তারপর শুরু হত বানানো গল্প।

কিন্তু বিউনোআয়ার্সের একজন এখনো ভুলতে পারেনি ইক্‌থিয়ানডারকে।

বিউনোআয়ার্সের সমস্ত চ্যাংড়া ছোকরাই চেনে তাকে, সবাই জানে মাথার ঠিক নেই বুড়োর। ভিক্ষে করে কোনোরকমে পেট চলে তার। জাতে, রেড-ইণ্ডিয়ান। রাস্তায় দেখলেই ছেলেরা— 'ঐ রে। ঐ আসছে সমুদ্র-দানবের বুড়ো বাপ।'

কিন্তু কর্ণপাত করে না বুড়ো, কিছু শুনতে পায় বলেও মনে হয় না।

তবে স্প্যানিয়ার্ড দেখলে ও তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে, কটমট করে তাকায়। তারপর বিড়বিড় করে গালাগাল দিতে দিতে থুথু ছিটোয়।

বুড়ো বালতাসারকে নিয়ে পুলিশ আর মাথা ঘামায় না। বদ্ধ উম্মাদ সে। তবে নিরীহ। কারো ক্ষতি করে না।

কিন্তু সমুদ্রে যখন ঝড় ওঠে, তখন এক অদ্ভুত উত্তেজনায় অস্থির হয়ে ওঠে বৃদ্ধ। ছুটতে ছুটতে শহর ছেড়ে সে এসে দাঁড়ায় জলের একদম কিনারায়। প্রচণ্ড গর্জনে আছড়ে পড়ে ঢেউয়ের পর ঢেউ, মনে হয় এই বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে গেল বৃদ্ধের শীর্ণ দেহকে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করে না বালতাসার। ঝড় যতক্ষণ আকাশ বাতাস সমুদ্র তোলপাড় করে, ততক্ষণ বুকফাটা কণ্ঠে বারবার ডাকতে থাকে—'ইক্‌থিয়ানডার! ইক্‌থিয়ানডার! ইক্‌থিয়ানডার!'

কিন্তু কেউ সাড়া দেয় না। □

''ক্রিণ্টোকে দেখেই ল্যাজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এলো বিচিত্র সেই বাঁদর কুকুর।'' পৃষ্ঠা ৩২

“শিউরে ওঠে ওলসেন···তবুও এত কাছে পেয়ে সিধে তাকায়।” পৃষ্ঠা ৮৪

“থর থর করে ……ডুব দিলো ডুবোজাহাজ।” পৃষ্ঠা ১০৩

‘‘তিন নম্বর ডেকের একটা কেবিনে····· সিলিং এর কাছে ঠেকে
মৃদু মৃদু দুলছিল লাশটা।’’ পৃষ্ঠা ১১৭

"আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—ধন্যবাদ, ওলসেন, অনেক ধন্যবাদ।" পৃষ্ঠা ১৫৪

অদ্রীশ বর্ধন

# সমুদ্র শয়তান